শিক্ষার কথা

শিক্ষার কথা

শিক্ষার কথা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী এম. এসসি., ডব্লু. বি. জে. ই. এস.,
বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত (কলিঃ), বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত
(হিঃ তাঃ সঙ্ঘ), লেকচারার, বাণীপুর নিম্ন বুনিয়াদী
শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

স্থামুইন পাবলিশিং হাউস
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
বি. কে. সরখেল
হাবড়া, ২৪-পরগণা

মূল্য ৬·৫০ নঃ পঃ

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় অনেক ভাল পুস্তক ইতিমধ্যেই বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। "বুনিয়াদী শিক্ষারূপ" বিশেষ শিক্ষা সম্বন্ধেও অনেক পুস্তক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছেন খুব কম গ্রন্থকার। অথচ ইহাদের সংযোগের প্রয়োজন রহিয়াছে।

শিক্ষাকে একটি গতিশীল নদীর সহিত তুলনা করা চলে। বিভিন্ন শিক্ষামত ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ঐ নদীর বিভিন্ন উপনদীর সহিত তুলনীয়। তাহারা তাহাদের বৈশিষ্ট্য দ্বারা শিক্ষার মূল ধারাটিকে পুষ্ট করে।

কোনও শিক্ষামত ও শিক্ষাপদ্ধতি একেবারে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। তাই বুনিয়াদী শিক্ষাতেও স্বাভাবিকভাবে অন্য শিক্ষাদর্শ সংযুক্ত হইতেছে। ইহা বৃদ্ধিরই বিধি—যদি বুনিয়াদী শিক্ষা ইহার ফলে আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানটি হারাইয়া না ফেলে তবে এই সংযোগ দ্বারা উহা লাভবানই হইবে।

বর্তমান পুস্তকে বিভিন্ন শিক্ষামতের পশ্চাতে যে দর্শনসমূহ কাজ করিতেছে তাহা প্রণিধান করিয়া উহাদের পরস্পর সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করা হইয়াছে ও তাহার আলোকে বুনিয়াদী শিক্ষার গ্রহণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করা হইয়াছে। তাহা ব্যতিত শিক্ষকগণের শিক্ষাদান কার্যের সহায়ক বিধি ও ব্যবস্থাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাণীপুর স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়ের গবেষণাগারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীরণজিৎ দে কর্তৃক প্রণীত প্রগতি পঞ্জীটি পুস্তকটিতে যোজনা করা হইয়াছে।

ইহা একটি "টেক্সট বুক" হিসাবে লিখিত নহে। তথাপি ইহার সাহায্যে নিম্ন ও উচ্চবুনিয়াদী শেষ পরীক্ষার শিক্ষানীতি, বিদ্যালয়-সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রশ্নসমূহের উত্তরদান যে অনেকখানি সম্ভব তাহা গ্রন্থ শেষের প্রশ্নাবলী ও সমাধানের ইঙ্গিতটি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

পুস্তকটির ইহাই প্রথম সংস্করণ। সহৃদয় পাঠকগণের নিকট হইতে সংশোধনের নির্দেশাদি পাইলে তাহা সানন্দে গৃহীত হইবে ও দ্বিতীয় সংস্করণের উৎকর্ষ-সাধন সহায়ক হইবে।

বাণীপুর
জুলাই, ১৯৬২

বিনীত
লেখক

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠা

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষানীতি

শিক্ষা কি ?

প্রশ্নটি প্রথম শুনিলে যত সহজ মনে হইবে উত্তর দিতে গিয়া তত সহজ মনে হইবে না। যে কোন পরিচিত বস্তু বা ভাবের সংজ্ঞা প্রকরণে এইরূপ অসুবিধা দেখা যায়। জল আমাদের সবারই পরিচিত। কিন্তু আমরা সবাই কি জলের স্বরূপ জানি ? ভাব-বাচক বিশেষ্যগুলির সংজ্ঞা প্রকরণ আরও কঠিন। স্নেহ সম্বন্ধে সবারই একটা ধারণা আছে। কিন্তু তাহার সংজ্ঞা দিতে গেলে খুব অসুবিধায় পড়িতে হয় এবং বেশী গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে ইহাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে গেলে সংক্ষেপিত বাক্যদ্বারা সংজ্ঞা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

আমরা জন্মকালে খুবই কম ক্ষমতার অধিকারী থাকি। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অনেক বিষয়ে অনেক ক্ষমতা লাভ করি। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন রকমের ক্ষমতা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে দেহের আকার আয়তন বৃদ্ধি পায় জড়বস্তুর সাহায্যে জৈবধর্ম অনুযায়ী। অন্যান্য যা কিছু বিকাশ ঘটে তাহার মধ্যে প্রচেষ্টাময় নানা প্রক্রিয়া আছে। ঐ প্রক্রিয়াগুলিই সম্মিলিতভাবে "শিক্ষা" আখ্যা পাইবার যোগ্য। কিন্তু কতকগুলি প্রক্রিয়া দেহের স্বাভাবিক বিকাশের সহিত

শিক্ষাবিকাশের প্রক্রিয়া

এমনভাবে যুক্ত যে তাহার জন্য সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। আমরা ঐগুলিকে অনেক সময় শিক্ষার সংজ্ঞা বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু যখন ঐ স্বাভাবিক বিকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তখন অন্য সচেতন প্রচেষ্টাজনিত বিকাশও বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং সামগ্রিক বিকাশধারায় ঐগুলি তুচ্ছ নহে। ঐগুলিকেও অশিক্ষিত পটুত্ব (Unlearned skills) বলিয়া শিক্ষা বহির্ভূত করিয়া রাখা ঠিক নহে। কেবল ঐ শিক্ষা প্রক্রিয়াগুলির ব্যবস্থা সহজভাবেই সংযুক্ত হয়, অন্যগুলির জন্য বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন হয়—ইহাই পার্থক্য মাত্র। খাদ্য তালিকায় জল উল্লেখ করা হয় না বটে কিন্তু জল ব্যতীত অন্য খাদ্য গ্রহণ করাই অসম্ভব। সুতরাং জল প্রধান খাদ্য হিসাবেই গণ্য হইবার যোগ্য। শরীর সুগঠিত না হইলে বুদ্ধি প্রভৃতির বিকাশ অসম্ভব হয়। শরীর গঠনের জন্য খাদ্যগ্রহণ ও অঙ্গসমূহের সঞ্চালন প্রয়োজন। ক্ষুধার তাগিদেই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি এবং দেহের স্বাভাবিক স্ফূর্তিই আমাদের অঙ্গাদি সঞ্চালনের প্রেরণা যোগায়। অর্থাৎ প্রকৃতিই দেহের বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইহাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে পারি না। তাহা হইলে আমরা ঐ স্বাভাবিক বিকাশের আয়োজনকে উপেক্ষা করিতে সুরু করিব এবং দেহের বিকাশ ব্যাহত হইবে। বস্তুতঃ আমরা এইরূপ অসুবিধা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখিয়াছি। শিশুদিগের বিদ্যালাভ ব্যাপারের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়া তাহাদের স্বাভাবিক খেলাধূলার বাধা সৃষ্টি করা হয়। ফলে তাহারা ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকর্মণ্য হইয়া পরে। কিছুকাল আগেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত সহজলভ্য ছিল। আজও এদেশে ইহার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। তেমনি সাধারণ

একদিকের বিকাশ ব্যাহত হইলে তাহার প্রভাব অন্য দিকেও পড়ে

জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায় তাহা শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে সমাজ হইতেই লাভ করে বলিয়া ইহা শিক্ষার বিশেষ আয়োজন না থাকিতে পারে কিন্তু এইরূপ জ্ঞানকে কম প্রয়োজনীয় মনে করিলে ভুল হইবে। সেইরূপ ভুল ধারণার বশে আমরা কিছুদিন আগেও শিক্ষার্থীকে পুঁথির গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পুঁথি-সর্বস্ব হইত। বর্তমানে এই ভুল সংশোধনের প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে।

সুতরাং **শিক্ষা** বলিতে শুধু বিশেষ বিশেষ দিকের বিকাশের আয়োজন বুঝায় না; সকলদিকের **সুসামঞ্জস্য বিকাশ ব্যবস্থাই** বুঝায়। এই বিভিন্নমুখী বিকাশের আয়োজন রাখাই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতেই যে এই আয়োজন সীমিত থাকিবে তাহা নাও হইতে পারে। শিশুর দৈহিক বিকাশ, তাহার নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রুচির বিকাশ সহজেই নিজ নিজ গৃহ ও সমাজ পরিবেশেই ব্যবস্থিত হইতে পারে এবং অন্যান্য বিকাশগুলির জন্যই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যদি গৃহ পরিবেশ ও সমাজ শিক্ষার্থীর ঐসব বিকাশের ঠিকমত আয়োজন না রাখিতে পারে তবে শিক্ষার্থীর সুসামঞ্জস্য বিকাশ ব্যাহত হইবে। এইজন্য বিদ্যালয়কে ঐসকল বিকাশের প্রতি অবহিত হইতে হইবে এবং পরিপূরক ব্যবস্থাদি রাখিতে হইবে। সুতরাং আমরা জানিলাম যে শিশুর পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণতির জন্য যে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, কর্মনৈপুণ্যগত, সমাজগত ও বুদ্ধিগত বিকাশ প্রয়োজন তাহার জন্য আয়োজন ও প্রক্রিয়া সমূহই "শিক্ষা" নামে অভিহিত। ইহার সকল আয়োজন বিদ্যালয়ে না থাকিতে পারে কিন্তু বিদ্যালয়ই ঐ সব বিকাশের প্রতি অবহিত থাকিবে ও যে

সকল দিকের বিকাশের সামঞ্জস্য বিধান তাই জরুরী

যে দিকের বিকাশের জন্য তাহার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিবে তাহার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজে আজ শিক্ষা সম্বন্ধে এই সামগ্রিক দৃষ্টি দেখা যায় না। অনেকে বিদ্যালাভকেই শিক্ষা মনে করিয়া ভুল করেন।

শিক্ষার সংজ্ঞায় এই আংশিক দৃষ্টি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ও প্রকারান্তরে জাতীয় বিকাশকেই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। তাই কিভাবে এই ভ্রান্তি সমাজে আসিল তাহা জানা প্রয়োজন।

শিক্ষা সম্বন্ধে আংশিক দৃষ্টির হেতু

সুদূর অতীতে শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ আংশিক দৃষ্টির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় মেলে। "আশ্রম শিক্ষায়" তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু কেন এই দৃষ্টি-বিভ্রম হইল তাহা জানিতে হইলে শিক্ষায় ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা প্রণিধান করিতে হইবে।

মানুষের সমাজ যত প্রাচীন ঠিক ততো প্রাচীন মানুষের শিক্ষার ইতিহাস। কারণ শিক্ষালাভের ক্ষমতাই মানুষকে জীবনযুদ্ধে বিজয়ী করিয়াছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া বর্তমান পরিণতি প্রদান করিয়াছে। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষ সাক্ষাতভাবে প্রকৃতির আনুকূল্য অনেক কম লাভ করিয়াছিল। তৎপরিবর্তে স্মৃতি, কল্পনা, পরীক্ষা করার ইচ্ছা ও সমষ্টিজীবন—এইগুলিই তাহাকে অভিজ্ঞতা ধরিয়া রাখা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহার সদ্ব্যবহার করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছে। সমষ্টিজীবন একের অভিজ্ঞতাকে বহুজনের অভিজ্ঞতায়

শিক্ষার প্রাচীনতম রূপ

পরিণত করার সুযোগ দিয়াছে। অভিজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রেরণা তাহাকে ভাষা সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। ইহাদের সমষ্টিগত ফল হিসাবে তাহারা অধিকার করিয়াছে শিক্ষা এবং শিক্ষাই তাহার ক্রমোন্নতির সোপান যোগাইয়াছে। কিন্তু মানুষ শিক্ষার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার পরে শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে নাই। শিক্ষা ব্যবস্থা তাহার জীবন হইতে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইয়াছে। শিশু হরিণের শিং যেমন তাহার কপালের হাড় হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় তেমনি মানুষের স্বাভাবিক জীবন হইতেই শিক্ষা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে। আরম্ভের সময় তাই জীবন ও শিক্ষার পৃথক সত্বা ছিল না। জীবন যাপন করিতে করিতেই সে শিখিত। পৃথক ব্যবস্থাও ছিল না; বিদ্যালয়ও ছিল না। যাঁহারা জীবনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেই অনভিজ্ঞগণ অভিজ্ঞতা সমূহ লাভ করিতেন —ইহাই ছিল শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা ছিল কাজের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতির অভিজ্ঞতা, চিন্তার অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ জীবনের নানা ধরণের অভিজ্ঞতা একত্রিতভাবেই তাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হইতে লাভ করিতেন। একজন শিকারী আবিষ্কার করিলেন যে প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রটি অপর প্রস্তরখণ্ডে ঘর্ষণ করিয়া সূচাগ্র করিয়া লইলে শিকারসন্ধান সহজতর হয়। তাঁহার এই অভিজ্ঞতা তিনি সমাজে আরও সকলকে দিলেন কারণ তখন গোষ্ঠীবদ্ধভাবেই কর্ম সম্পাদন হইত। তাহার পর হইতেই শিকারের ক্ষেত্রে উহা সম্পাদ্য প্রথায় পরিণত হইল। পুরুষানুক্রমে ঐ অভিজ্ঞতা হস্তান্তরিত হইয়া চলিল ও তাহা আরও সাথক প্রথার সৃষ্টি করিল। এইভাবে শিক্ষা কি তাহা বুঝিবার আগেই

শিক্ষার উৎপত্তি

মানুষের সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপলাভ করিয়াছে। সেই প্রাচীন মানুষটী যিনি প্রস্তরের অস্ত্রটিকে সূচাগ্র করিলেন ও শিকারের সার্থকতা লাভ করিলেন তিনি কিন্তু তখনও তাহার সার্থকতার সঠিক হেতুটি বাহির করার মত মননশীলতা লাভ করেন নাই। তিনি তখনও ভালভাবে জড়প্রকৃতি ও চৈতন্যময় জীব প্রকৃতির পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম নহেন। তিনি বহিঃপ্রকৃতিতে তাঁহারই মত ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রভৃতি মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেন। তাই তাঁহার মনে হইল যে ঐরূপ বিশেষ পদ্ধতিতে অস্ত্র শানাইলে তাহা অস্ত্রটিকে শিকার হননে অধিকতর উৎসাহিত করিয়া তোলে। হয়তো দৈবাৎ তিনি উত্তর দিকে মুখ করিয়া অস্ত্রটি শান দিয়াছেন ও শান দিবার সময় একটি বিশেষ সুর সাধিয়াছেন। তিনি তাই উত্তরদিকে বসিয়া অস্ত্রটি শান দেওয়া ও তৎসহ কোনও বিশেষ সুরসাধনাকেও শিকার প্রাপ্তিরূপ সার্থকতার অন্যান্য কারণ হিসাবেই গণ্য করিলেন এবং তাঁহার পরবর্তীগণকে সমগ্র ভাবেই শান দেওয়া অনুষ্ঠানটি শিখাইলেন। এইভাবে কর্মসম্পাদনা ও সঙ্গীতাদি অন্যান্য অনুষ্ঠান সমভিব্যাহারেই শিক্ষা দেওয়া হইত প্রাচীনযুগে। তাহার সহিত মনগড়া বিশ্বাসের শিক্ষাও প্রদত্ত হইত। আমাদের ঋকবেদ ঐরূপ শিক্ষার সাক্ষ্যই বহন করে। ঐ শিক্ষায় কর্মের শিক্ষা ও জ্ঞানের শিক্ষা একত্র সংযুক্ত এবং সমগ্র শিক্ষাটিই তাই আচরণধর্মী। এই যুগে মানুষের জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই বৃত্তিভেদ ছিল না, সকলে সব কাজ করিত। মিলিতভাবে কাজ করা ও কাজের ফল ভোগ করা ছিল এই যুগের সমাজ বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন শিক্ষার সামগ্রীকতা

কিন্তু মানুষ ক্রমেই প্রকৃতির উপর নূতন নূতন বিজয় সাধন

করিল ও তাহার জীবন অনেক বেশী ব্যাপ্তিলাভ করিল। ইহার ফলে সকলে সব কাজ করার পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার এক এক দলের উপর প্রদত্ত হইতে থাকিল। তখন প্রতিদল তাহার নিজের কাজটি সম্পন্ন করে ও তাহার শিক্ষাই সে গ্রহণ করে কিন্তু কাজটি সম্পাদনায় যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি কাজটির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত নহে সেই অনুষ্ঠান সমূহ সম্পন্ন করেন বিশেষ এক সম্প্রদায় এবং এই সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ধরণের কাজগুলির মধ্যে সামগ্রিক সম্পর্ক রক্ষা করেন। এই অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ বিশ্বাসভিত্তিক ও ভাষাপ্রধান —বিশেষ করিয়া সঙ্গীতপ্রধান। যে সম্প্রদায় এই কাজ করেন তাঁহারা পুরোহিত সম্প্রদায়। ইহারাই কার্যকারণ সম্বন্ধাদি, বুদ্ধি ও বিশ্বাসমূলক বিষয়ে মাথা ঘামান—তাঁহাদের নিকট হইতে সহজবোধ্য ধারণা লাভ করিয়াই কর্মসম্পাদনায় নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ তুষ্ট থাকেন। এই পুরোহিত সম্প্রদায় তাই ভাষা, জ্ঞান ও বিশ্বাস ভিত্তিক বৌদ্ধিক শিক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন ও অন্যান্য সম্প্রদায় তাঁহাদের উপর যে কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহা সম্পাদনের শিক্ষা ও মোটামুটিভাবে অতীত বিশ্বাসাদির প্রতি নিষ্ঠা সঞ্চারক বৌদ্ধিক শিক্ষালাভেই তুষ্ট থাকেন। পুরোহিত সম্প্রদায় যে শিক্ষা লাভ করেন তাহার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদত্ত হইতে থাকিল ও তাহার জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হইল। কর্ম সম্পাদনের শিক্ষা বৃত্তিমূলক —বয়স্কদের নিকট হইতে তাহা সম্পাদনের মাধ্যমেই শিখিয়া লওয়া চলে। কিন্তু ভাষার শিক্ষা অধিকতর দুরূহ। তাই ইহার জন্য বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন হইল ও ইহাই শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এইভাবে শিক্ষা তাহার সামগ্রিক সংজ্ঞা হারাইল।

বৃত্তিভেদ শিক্ষার সামগ্রীকতা নষ্ট করিল

কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষা. ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা পৃথক হইলেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা নিছক বুদ্ধিমূলক শিক্ষায় পরিণত হয় নাই। কারণ তখনও তাঁহারা সমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আছেন সুতরাং তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিতে হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞান আহরণ পর্যাপ্ত নহে; স্বাস্থ্য, কর্মনৈপুণ্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ লাভও ইহার জন্য প্রয়োজন। তাই তৎকালীন পুরোহিত সম্প্রদায়ের জন্য রচিত আশ্রম শিক্ষাবিধি আচরণধর্মী ছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র পুস্তকাদি হইতে পাই তাহা নানা দিক হইতে একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থারূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

প্রাচীন আশ্রম শিক্ষা—ইহার আচরণ ধর্মতা

কিন্তু ক্রমেই পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজের কর্তৃত্বপদ হইতে বিচ্যুত হইলেন ও তাহার পরিবর্তে যোদ্ধা সম্প্রদায়—রাজন্যবর্গ সমাজ প্রাধান্য লাভ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ মাত্র অতীত ঐতিহ্য বহন করিয়া ধর্মের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে মূলধন করিয়া টিকিয়া থাকিতে চাহিলেন। তাঁহারা তখন শিক্ষায় ঐ আচরণধর্মিতা ভুলিয়া শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান ও ভাষা চর্চাকেই প্রাধান্য দিলেন এবং বাস্তবজীবনের পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণায় অপেক্ষাকৃত প্রতিভাশালীগণ শাস্ত্রের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও নূতন নূতন দর্শন সৃষ্টিতে মনোযোগী হইলেন। তাঁহারা এই শিক্ষাকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যোদ্ধা সম্প্রদায় সমাজকে নিজ আয়ত্বে রাখিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণও তাহার অনুকূলে স্বীয় প্রাধান্য ছাড়িয়া দিয়া নিজ সম্প্রদায়ের সম্মানটুকু বজায় রাখিতে চাহেন মাত্র। এইজন্য যোদ্ধা-সম্প্রদায় তাঁহাদের ঐ সম্মানটুকু স্বীকার

পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় পুঁথি সর্বস্বতা

করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন ও সমগ্র সমাজে শাস্ত্রজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠশিক্ষা বলিয়া মানিয়া লওয়া হইল। বৃত্তিমূলকজ্ঞান ও নানা কলা বিষয়ক জ্ঞানকে তাই বলা যাইতে লাগিল অপরাবিদ্যা। শাস্ত্র ও দর্শনাদি বিষয়ের জ্ঞান মনকে ঐহিক আশা আকাঙ্ক্ষা মুক্ত করে এইরূপ ঘোষণা করিয়া তাহাকেই পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হইল।

আমরা এইভাবে শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শচ্যুত হইয়া শুধু শাস্ত্রজ্ঞানকেই শিক্ষা বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

উপরে ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের যে চিত্র অঙ্কিত হইল তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবুও সংক্ষেপে তাহার বিষয় কয়েকটি কথা বলা চলে। প্রাচীন গ্রীকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সহিত ভারতের আশ্রম শিক্ষার যুগের তুলনা করা চলে, যদিও প্রয়োগ-বিদ্যার ক্ষেত্রে ইঁহারা আরও অগ্রসরশীল ছিলেন। রোমকগণ ভোগের দ্রব্য সামগ্রী নির্মাণ ও যুদ্ধবিদ্যায় কুশলতা প্রদর্শন করিলেও শিক্ষার জ্ঞানানুশীলনের ও চিন্তনের দিকে গ্রীক সভ্যতা অপেক্ষা আগাইয়া যাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু রোমকগণের ভোগলিপ্সাই তাঁহাদের পতন ঘটাইয়াছিল। রোমকগণের সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা সাধারণ মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট করে ও খ্রীষ্টীয় আদর্শ অসীম লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া জয়যুক্ত হয়। "খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় মানবীয়তা থাকিলেও উহার ভিত্তি ছিল ধর্ম ও বিশ্বাস প্রবণতা এবং সাংসারিক ব্যাপারে উদাসীনতা। সাধারণ স্তরের ব্যক্তির মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার উহাকে ক্রমে অন্ধ আনুগত্য ও বিশ্বাসের পথে লইয়া" যায়। এদিকে শাসক সম্প্রদায় রোমক ঐতিহ্যের ধারক হইয়া

পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

জনসাধারণকে শোষণ করিয়া ভোগ করার পথই অনুসরণ করিতে থাকেন এবং পুরোহিত সম্প্রদায় ইহাদের সহিত হাত মিলাইয়া জনসাধারণকে ঐহিক সুখভোগের আশা ত্যাগ করিয়া ধর্ম ও বিশ্বাসের পথ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতে থাকেন। ফলে সমগ্র মধ্যযুগকে ইউরোপের অন্ধকারযুগ বলা চলে। একদিকে দম্ভ ও ভোগলোলুপতা ও তজ্জনিত জিঘাংসা আর একদিকে বিশ্বাস ও ধর্মোন্মাদনা এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এখানেও তখন শিক্ষা ছিল শাস্ত্র-সর্বস্ব এবং তাহার প্রেরণা ছিল ধর্মীয়। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের যুগে ইউরোপের এই মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহারপর ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ নূতন আদর্শ ও নূতন চিন্তার জন্ম দেন এবং অন্ধকার যুগ কাটাইয়া ইউরোপ নূতন জীবনধর্মে ও নূতন শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়।

আমরা আজ ইউরোপীয় মনিষীবৃন্দের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন চিন্তন ও রূপায়ণের জন্য বহুলাংশে ঋণী। তাঁহাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তবেই আমরা অতীত ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতির গৌরবকথা জানিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছি। এইজন্য ইউরোপীয় নব জাগরণ ও তাহার সহিত শিক্ষার নূতন মূল্যবোধ বিষয়ে আমাদিগকে জানিতে ও বুঝিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা করার যোগ্যতা লাভের জন্য এই জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপে শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার

ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ও অতীতের অনুসরণ যখন অত্যন্ত বেশী গুরুত্বলাভ করিয়াছিল তখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য—সমাজকে অগ্রগতি প্রদান, শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হইতেছিল। এই গতানুগতিকতার দৃষ্টিসীমাও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় যে চিন্তার বলিষ্ঠতা ছিল তাহাও বর্জিত হইয়াছিল। ইহার কারণ ছিল। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনের প্রথম যুগে রোমানগণ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালাইয়া ছিলেন। ৩১১ খৃঃ পর এই অবস্থা পরিবর্তিত হইতে সুরু করে ও ইহার পরেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের হাতে। যে সমস্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম প্রথমে গ্রহণ করেন তাঁহারা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার নিপীড়িত শ্রেণীর লোক। ইহারা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি স্বভাবতই বিরূপ ছিলেন এবং শ্রেণী কৌলিন্যে নিম্নস্তরের ব্যক্তি হিসাবে ঐ সভ্যতাদ্বয়ের মহত্তর অবদান সমূহ উপলব্ধির সুযোগ তাঁহারা পান নাই। সুতরাং খ্রীষ্টীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের সহিত কোনরূপ সংযোগ খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানিবে এই বিশ্বাসে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা তাঁহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিতে সচেষ্ট হইলেন। শিক্ষাব্যবস্থা চার্চের পরিচালনাধীনে আনা হইল

মধ্য যুগের গতিহীনতা

ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসকেই শিক্ষার প্রধান ভিত্তি করিয়া তোলা হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইউরোপে যুগ-পরিবর্তনের হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। ধর্মান্ধতার প্রভাবে উদ্ভূত ধর্মযুদ্ধ তাহাকে বিভিন্ন দেশের সংস্পর্শে আনিয়াছে এবং তাহার ফলেই জীবন সম্বন্ধে প্রশ্নসংকুল করিয়াছে। অপরদিকে ব্যবসায়বাণিজ্য বিস্তার লাভ করায় নূতন অর্থ-নৈতিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ফলে নূতন চেতনা, নূতন প্রশ্নবোধ, নূতন মূল্যবোধের উদ্ভব হইল। ইহাকে বলা হয় নব জাগরণ বা রেঁনেসা। ইটালীতে ইহার উদ্ভব হয় এবং পরে সমস্ত ইউরোপে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। ইহার প্রভাবে সমস্ত জীবনদৃষ্টিরই পরিবর্তন আসে—ধর্মীয় পুরোহিতের অনুশাসনে পরিচালিত পারলৌকিক বিশ্বাসপ্রধান নিয়ন্ত্রিত জীবনের বিরুদ্ধে বর্তমান জগতের অনুভূত সুখ-দুঃখকে অধিকতর মূল্য প্রদান যাহার মূল সুর।

নব জাগরণের যুগ

হিউম্যানিষ্টদের প্রাদুর্ভাব

এই পরিবর্তন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে আবার গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে থাকে। যাঁহারা এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তাঁহারা মানবিকতাবাদী নামে পরিচিত হন ও গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয় 'মানবিক বিদ্যা' (Humanities) নামে পরিচয় লাভ করে। এই আন্দোলন ইটালী হইতে ক্রমশঃ নেদারল্যাণ্ড, ফরাসী, স্পেন, জার্মানী ও ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ করে। অপর দিকে পোপ শাসিত ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের স্থলে অপেক্ষাকৃত যুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে খ্রীষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন সুরু হয়—প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম আন্দোলনের আকারে।

এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন জার্মানীর মার্টিন লুথার (Martin Luther)। ইনি অবশ্য পুরাপুরিভাবে সকল গ্রীক পণ্ডিতের

প্রোটাষ্টাণ্ট ধর্মের উদ্ভব—হিউ-ম্যানিজম যুগ

লেখার প্রচার সমর্থন করিতেন না। আশঙ্কা করিতেন যে অনেক অখ্রীষ্টান লোকের লেখার সহিত পরিচিতি খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারে। তথাপি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে তাহাকে যুক্তিগ্রাহ্য করিয়া তোলার যে আন্দোলন তিনি প্রবর্তন করেন তাহার মূল সুরের সহিত রেঁনেসা আন্দোলনের সঙ্গতি ছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন যদিও শিক্ষাকে চার্চের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নাই তথাপি এই ধর্মীয় শিক্ষার স্থলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধর্মনিরপেক্ষ-আইন, শিল্প-কলা ও ভাষা-সাহিত্য শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাঁহার পরবর্তী সংস্কারকদের মধ্যে ইরাস্‌মাস্ (Erasmus), ভিভাস (Vivous), র‍্যামাস (Rameus), জন ক্যাল্‌ভিন্ (John Calvin), উল্লেখযোগ্য। হিউম্যানিষ্টগণ শিক্ষাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের গণ্ডী-বদ্ধতা হইতে মুক্তি দিবার আন্দোলন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল অগভীর। তাঁহারা অতীতের অখ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া মানবসভ্যতার বিকাশের কথা ভাবিয়াছেন ও তাহার জন্য গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্য জ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়াছেন—কিন্তু সেই তুলনায় শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ও পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা দ্বারা নূতন নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্র ও সীমার বিস্তার বিষয়ে যথোচিত গুরুত্ব দেন নাই। ইহার পরবর্তী যুগের

রিয়েলিজম্ বা বাস্তববাদী যুগ

শিক্ষার বিকাশ ধারায় এই নূতন প্রেরণা দৃষ্ট হয় ও ইহাকে শিক্ষার রিয়ালিজম্ বা বাস্তববাদের যুগ বলা হয়। এই যুগ আরম্ভ হয় লুইস ভিভাসের অভ্যুদয় হইতে। ইনি স্পেন দেশে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে ইংলণ্ডের "টমাস মোর" এর সংস্পর্শে

আসেন। প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ইরাসমাসের সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিল। ইনি যদিও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব দিতেন তথাপি তর্কবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়কে শিক্ষাক্রমভুক্ত করার কথা বলেন ও শিক্ষার মনোবিজ্ঞান বিষয়েও অবহিতি প্রদর্শন করেন। পিটার, র‍্যামাস, মুলকাষ্টার প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণও এই পথে অগ্রসর হন। তৎপরে ফ্রান্সিস বেকন নামক ইংরাজ দার্শনিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়া এই আন্দোলনকে বেশ কিছুটা অগ্রসর করিয়া দেন। তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই যুগে কোপারনিকাস সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া জ্যোতির্বিদ্যার পরিধিকে যথেষ্ট বিস্তৃত করেন এবং এই সময় গণিত শাস্ত্রেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে ও মুদ্রণ-যন্ত্রের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। ইহার পরে কেপ্‌লার গ্যালিলিও ও নিউটনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের সূত্রপাত ঘটায়। অপরদিকে দেকার্তের দার্শনিক মতবাদ প্রভাবে গণিত বিজ্ঞানের ভাষারূপে পরিগণিত হয়। হিউম্যানিষ্টগণ যেমন ভাষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করিয়াছিলেন রিয়েলিষ্টগণও তেমনি অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। রিয়েলিষ্টগণ এক আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখিতেন যেখানে সব মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে এবং শিক্ষা দ্বারাই সেই স্বপ্ন বাস্তব হইবে ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ইংলণ্ডের টমাস মোর, ইটালীর ক্যাম্পানেলা, জার্মানীর জোহান ভেলেটিন এণ্ডা ও ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক বেকন প্রত্যেকেই এই কল্পিত স্বর্গ রাজ্যের চিত্র আঁকিয়াছেন ও এই স্বর্গরাজ্য সৃষ্টির প্রধান উপায় হিসাবে শিক্ষার উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছেন।

এইভাবে শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্তি বিষয়ে যেমন নূতন চিন্তা ও আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছিল তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি সাধনের বিষয়েও নূতন প্রচেষ্টা এই যুগে সুরু হয়। জার্মানীর উলফগ্যাংগ র‍্যাটিক এই বিষয় পথিকৃতের সম্মান পাইতে পারেন। ইনি শিক্ষা-প্রদান ব্যাপারে মনের অনুসঙ্গ অনুসরণ, এক সময় একটি শিক্ষনীয় বিষয় শিক্ষাদান, শিক্ষার পুনরাবৃত্তির সার্থকতা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, মুখস্তবিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব, শিক্ষার উদাহরণ সমূহের উপযোগিতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোক-সম্পাত করেন। কিন্তু এই যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিক্ষাবিদ্ **হইতেছেন জন এমস্ কমিনিয়াস্** (Comenius) (১৫৯২-১৬৭০)।

শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কার প্রচেষ্টা

ইনি মোরাভিয়ার একটি গ্রামে জন হস প্রবর্তিত একটি বিশেষ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ খ্রীষ্টীয় পরিবার পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃজনোচিত ভালবাসা ও সরল জীবন যাপন ও সম-অধিকারে বিশ্বাস করিতেন। কমিনিয়াসের শিক্ষাচিন্তায় উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি শৈশবে পিতামাতা হারান ও আত্মীয়গণ কর্তৃক পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বাল্যে সামান্যই লেখা-পড়ার সুযোগ পান। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি ল্যাটিন শিক্ষার সুযোগ পান ও অধিকতর বয়সকালে উহা শিক্ষা করিতে হওয়ায় তৎকালীন ল্যাটিন শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটীগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। তিনি ২০ বৎসর বয়সে যাজক-বৃত্তির প্রস্তুতি হিসাবে হারবন কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এই সময় তিনি হেন্‌রী আলষ্টেভ নামক কেলভিনের মতাবলম্বী গুরুর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁহার

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কমিনিয়াস

প্রভাবেই শিক্ষাব্যাপারে আগ্রহী হন। তৎকালে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতির সুখ্যাতি ছিল ও তিনি তাহার সহিত পরিচিত হন। মোরাভিয়াতে প্রধান ধর্মযাজক হিসাবে কর্মে লিপ্ত থাকাকালে তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত পুঁথিপত্র লেখেন ও তৎকালীন বহু জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত পত্র মারফৎ যোগাযোগ রাখেন। তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে শিক্ষা দ্বারাই মানুষের উন্নতি সম্ভব ও সকল ব্যক্তিকে সব বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া ঐশ্বরিক কর্তব্য।

ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহে সর্বস্বান্ত হইয়া তিনি মোরাভিয়া হইতে বিতাড়িত হন ও পোল্যাণ্ডের লিসা সহরে বাস করেন। পরে সুইডেনে গমন করেন এবং সেইখানে ল্যাটিন শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত হন। তারপরে হাঙ্গেরীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ভার পান। কিন্তু তাঁহার আদর্শকে রূপদানের সুযোগ সুবিধা তিনি লাভ করেন নাই। তাঁহার শেষজীবন—(১৬৫৪-১৬৭০) তিনি আমষ্টারডম সহরে কাটান ও শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তকাদি লেখেন। তিনি প্যানসোফিয়া বা 'সার্বজনীন জ্ঞান' পুস্তকে এই মত প্রকাশ করেন যে সকলকে সব জ্ঞানের শাখার মোটামুটি জ্ঞান প্রদান করা উচিত। এজন্য তিনি তাঁহার গুরু আলফ্রেড্‌এর অনুসরণে একটি বিশ্বকোষ রচনায় হাত দেন। তিনি বেকনের আদর্শ অনুসারে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরীক্ষাগার ও অন্যান্য ব্যবস্থার কথাও ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন। শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ে তাঁহার অভিমত এই যে শিক্ষা জীবনকে উন্নত, উদ্যমশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ করিবে। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় না তাই শিক্ষা অধিকতর সার্বজনীন হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য তিনি উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও এইজন্য নিজে অনেক পাঠ্যপুস্তক লেখেন। তাহাছাড়া ভাল শিক্ষক ও ভাল

শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি চারটি বিশেষ পর্যায়ে শিক্ষাকে বিভক্ত করেন—(১) শৈশবের শিক্ষা—এই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিপুণতার সহিত শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন—তিনি শিশুশিক্ষায় উপকথা, গল্প, ছড়া, খেলাধূলা, হাতের কাজ, সঙ্গীত ও কৌতুকের স্থান দিয়াছেন। (২) তিনি বাল্যে ধনী দরিদ্র সকল বালক বালিকাকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও তাহার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াদির সহায়ে বস্তুজ্ঞান শিক্ষা, কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন, লেখাপড়া, ব্যবহারিক গণিত, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাধারণ ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান, সঙ্গীত ও সম্পাদ্যশিল্প শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছেন। (৩) তাহার পরবর্তী স্তরে শিশুরা ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করিবে কিন্তু তাহাদের বিচারশক্তির বিকাশ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টি দিতে হইবে এবং ব্যাকরণ, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও ছন্দজ্ঞান লাভ করিবে। এই প্রতিটি বিষয় পুঁথিগতভাবে শিখিবে না, বাস্তব কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিখিবে। (৪) পরবর্তী স্তরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ভ্রমণ মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। মেধাবী ছাত্ররাই এই শিক্ষার সুযোগ পাইবে।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ

তিনি শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের পুস্তক লিখিয়াছেন ও তাঁহার ঐ পুস্তকে লিখিত নানা তথ্য আজিও সমান মূল্যবান বিবেচিত হয়। আবেগানুভূতি ও ইচ্ছা বিষয়ে তাঁহার অভিমত আধুনিক যুগে স্বীকৃতি পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিলে তবেই শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ প্রযুক্ত হয় ও জানিবার কৌতূহল সৃষ্টি দ্বারাই আগ্রহ জন্মান যায়। তিনি শিশুদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষাদান কৌশল নির্বাচন বিষয়ে বলিয়াছেন এবং শিক্ষণীয়

বিষয় নির্বাচনে বয়স অনুযায়ী শিশুর মানসিক বিকাশ জানার প্রয়োজন বিষয়েও বলিয়াছেন। এইগুলি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত সত্য। গ্রহণ ক্ষমতা বিচার করিয়া শিক্ষা দিলে তবেই শিক্ষা সার্থক হয়—এই কথা তিনি অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়াছেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার কাল নির্বাচন, ভাষা ও জ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা একত্রে প্রদান, সাধারণ জ্ঞান লাভের পর বিশেষ জ্ঞান প্রদান, বয়স অনুযায়ী শিক্ষাপ্রদান ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান—এই সব বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি আজিও মনোবিজ্ঞান সম্মত বলিয়া স্বীকৃত। শিক্ষাক্ষেত্রে গনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার পক্ষে যুগাতিক্রমকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে জানা হইতে অজানা ও শিশুকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের উপযোগিতা বিষয়ে তাঁহার চিন্তা সেই যুগের তুলনায় খুবই অগ্রসরশীল ধারণা বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। তাঁহার লিখিত ল্যাটিন পাঠ্যপুস্তকসমূহ ও তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

কমিনিয়াসকে শিক্ষাবিদ হিসাবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের পুরোধা বলা চলে।

কমিনিয়াস শিক্ষায় সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে চিন্তা প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তী যুগে তাহা বিকাশলাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে ল্যাটিন শিক্ষার উপর হিউম্যানিষ্টগণ যে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বাড়াবাড়ি পরবর্তী শিক্ষাসংস্কারকগণের চোখে পড়ে ও তাহার সংশোধন করিয়া মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রশ্ন তাঁহারা সঙ্গতভাবেই উত্থাপন করেন।

পরবর্তী যুগের শিক্ষাসংস্কারকগণের মধ্যে দার্শনিক লকের (Locke) নাম স্মর্তব্য। ইনি ইংল্যাণ্ডের বৃষ্টলের নিকটে ১৬৩২ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। দার্শনিক হিসাবেই তিনি প্রখ্যাত। শিক্ষা বিষয়েও তিনি অনেক চিন্তা রাখিয়া গিয়াছেন যাহা পরবর্তী-গণকে প্রভাবিত করিয়াছে। তিনি মনঃস্তত্ব বিষয়ে তাঁহার মতামত দিয়াছেন যাহা কমিনিয়াসের অনুরূপ মতামতের সহিত সঙ্গতিযুক্ত—কিন্তু কমিনিয়াসের সিদ্ধান্ত অধিকতর বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি মুখস্থ করার উপর জোর দিতে নিষেধ করিয়াছেন—মুখস্থ করার ক্ষমতা বিকশিত করা যায় ইহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বাড়ে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য তিনি গণিতশাস্ত্র শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। **শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করিয়া শিক্ষাদান ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিকে শিক্ষকের অন্যতম কাজ বলিয়া তিনি মনে** করিতেন। পাঠ্যক্রম নির্বাচনে জীবনের প্রয়োজনকে গুরুত্ব প্রদানের কথা তিনি বলিয়াছেন। তিনি ল্যাটিন শিক্ষার প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপের বিরোধী ছিলেন ও যুক্তি দ্বারা গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বিষয়ে তিনি পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছিলেন। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করিয়া শিশুর জানার আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার অভিমত খুবই প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় বহন করে।

দার্শনিক লকের শিক্ষাচিন্তা

শিক্ষায় অনুরাগ সৃষ্টির গুরুত্ব

দার্শনিক দেকার্তে গণিত—বিশেষতঃ জ্যামিতিতে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণের পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হন ও দর্শনশাস্ত্রকেও অনুরূপ যুক্তি

বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হন। লকের যুক্তির প্রতি আনুগত্য ও তজ্জন্য গণিত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ দেকার্তের ঐ মতবাদের সহিত সঙ্গতিযুক্ত। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, লিবনিৎজ ও নিউটনের আবিষ্কারসমূহ ইঁহাদের যুক্তিবাদকে বলশালী করে ও ভলটেয়ার (Voltaire) নামক দার্শনিক কবির বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইহাকে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত করে। তাঁহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ—ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পন প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে বুদ্ধিজীবিদের মন হইতে নির্বাসিত করে। যদিও ভলটেয়ার ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই, শুধু তাঁহার সর্বশক্তিমান ইচ্ছা দ্বারা জাগতিক সকল কিছু ঘটে এই বিশ্বাসকেই তিনি দূর করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখা ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়াছিল ও যুক্তিবাদ ক্রমে ইন্দ্রিয়বাদে পরিণতিলাভ করিতেছিল।

কবি ভলটেয়ারের সংস্কার আন্দোলন

এই যুগেই জিন জ্যাকুইস রুশো (Rousseau) জন্মগ্রহণ করেন (১৭১২)। তিনি ভলটেয়ারের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু শেষদিকে তীব্র মতপার্থক্য হওয়ায় ঐ বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক। শৈশবে তিনি মা হারান এবং তাঁহার দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করেন। শৈশবে পিতার প্রভাবে তাঁহার পাঠে অনুরাগ জন্মে কিন্তু প্রেমের উপন্যাসাদি পড়ার ফলে তিনি অল্পবয়সই পরিপক্ব হইয়া উঠেন। এইজন্য অভিভাবকহীন অবস্থায় তাঁহার কৈশোর ও যৌবন প্রশংসনীয়ভাবে কাটে নাই। কাজকর্মেও তিনি যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। অভাববশেই তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন ও ম্যাডাম ডি, ওয়ারেনস

রুশোর জীবনী

নাম্নী এক ক্যাথলিক মহিলার আশ্রয়লাভ করেন। এই মহিলার সহায়তায় তিনি যাজকবৃত্তি, সঙ্গীতবিদ্যা ও কেরাণীবৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পরে লকের পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একজন উচ্চ কর্মচারীর দুইটী পুত্রের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যর্থ হন। কিন্তু এই সময়ে তিনি বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেন ও কিছু পড়াশুনা করেন। ১৭৪১ খৃঃ তিনি প্রেমজনিত ঈর্ষাবশে ওয়ারেনস এর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্যারিসে গমন করেন। সেখানে তিনি ভলটেয়ার, দিদিরো প্রমুখ মনীষীদের বন্ধুত্ব লাভ করেন। হেরেসি লেভালিউর নাম্নী এক মহিলার সহিত এই সময় তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় ও যদিও ঐ মহিলা অত্যন্ত নিম্নস্তরের ব্যক্তিত্বসম্পন্না তথাপি তিনি তাঁহার সহিত ২৫ বৎসর বাস করেন ও তাঁহাদের পাঁচটী সন্তান জন্মে। তিনি এই সন্তানগণের প্রতি কোনরূপ পিতার কর্তব্য সম্পন্ন করেন নাই। ৩৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার প্রতিভার কোন স্ফুরণ দৃষ্ট হয় না—পরন্তু তাহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও খামখেয়ালীপনাই বড় হইয়া চোখে পড়ে। কিন্তু এই সময় একটি রচনা প্রতিযোগিতায় তাঁহার একটি রচনা তাঁহাকে হঠাৎ বিখ্যাত করিয়া তোলে। রচনার বিষয়বস্তু ছিল "বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি মানুষের নৈতিক উন্নতি অথবা অবনতি ঘটাইয়াছে?" উহাতে তিনি বিজ্ঞান ও শিল্পকে তীব্র আক্রমণ করেন। ইহার পরে তিনি "মানুষের মধ্যে বৈষম্যের কারণ কি"—এই বিষয়ে আর একটি রচনা লিখিয়া পুরস্কার লাভ করেন। পরে তিনি "সামাজিক চুক্তি" নামক পুস্তক লিখিয়া একজন খ্যাতিমান দার্শনিকরূপে পরিগণিত হন। "এমিলি" নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে মতামত গল্পের আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে নির্বাসিতের জীবনযাপন করিয়া-

ছিলেন এবং সামগ্রিক বিচারে তাঁহার সমগ্র জীবনই দুঃখপূর্ণ ছিল। তিনি শেষ কয়েক বৎসর মানসিক ব্যাধিতে ভুগিয়াছেন। "স্বীকারোক্তি" (Confession) নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনের সত্য পরিচয় অদ্ভুত সাহসিকতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

রুশোর মতবাদ ন্যাচারালিজম

রুশো ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ লেখক। তাঁহার লেখায় যুক্তি অপেক্ষা অনুভূতিই প্রবল এবং প্রকাশভঙ্গী খুবই বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী মতামতে পূর্ণ। তিনি সমাজ হইতে অনেক বঞ্চনা লাভ করিয়াছিলেন তাই তাঁহার লেখায় তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতি বিরূপতা সঙ্গতভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। তৎকালীন সমাজের প্রতি এই বিরূপতা অনেকের মনেই রেখাপাত করিয়াছিল কারণ তৎকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণীর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ছিল অসুখী। তাই তাঁহার লেখা হইতেই পরবর্তী যুগের ফরাসী বিপ্লবের পতাকাবাহীগণ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মতবাদ হিসাবে তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী। তিনি মানুষকে স্বভাবতঃ সৎ বলিয়া মনে করিতেন—প্রকৃতির সব কিছু ভাল সুতরাং প্রকৃতির সৃষ্ট মানুষ স্বভাবতঃ সৎ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সভ্যতা মানুষকে আত্মকেন্দ্রী করিয়া তোলে ; তাহাদের মধ্যে স্বভাব প্রদত্ত সাম্যভাব দূর করে ও নানাভাবে তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করে। এইজন্য মানুষ সভ্যতার নিগড় ভাঙ্গিয়া আবার প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া গেলে তবেই সুখী ও স্বাধীন হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার অভিমত। পরবর্তীযুগে সমাজ সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র বীতরাগ কিছুটা কমিয়াছিল এবং সৎ শিক্ষার মধ্য দিয়া মানুষের যুক্তিবাদকে সততা ও সাম্যের দিকে লওয়া সম্ভব এই অভিমত প্রকাশ

করিয়াছিলেন। 'এমিলি' নামক গ্রন্থে তিনি মানসপুত্রের ও তাঁহার ভাবী পত্নীর শিক্ষা পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত খুব বেশী রকম সঙ্গতিহীন ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকিলেও অনেক মূল্যবান জীবন-সত্য নিহিত ছিল। তিনি শিশু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শিশুর বিকাশ ধারার কতকগুলি সুস্পষ্ট স্তর বিষয়ে আলোকসম্পাত করেন ও "পুনরানুবৃত্তি তথ্যের" জন্ম দেন। অপরপক্ষে শিক্ষার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যে ঝোঁক পরবর্তীকালে প্রাবল্য লাভ করে তাহাও তাঁহার শিক্ষাচিন্তা হইতেই প্রাণ পায়। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশধারা ও ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দিবার ফলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এইজন্য রুশো শৈশবে ও বাল্যে কোনও কৃত্রিম পাঠ্যক্রম শিশুর উপর চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। তৎপরিবর্তে শিশুকে প্রকৃতির ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে থাকিয়া নানা অভিজ্ঞতা আহরণের সুযোগ প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই মত "উল্টাশিক্ষা" বা Negative education নামে খ্যাত। কিন্তু ইহা উল্টাশিক্ষা নহে—শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষাধারার পরিপোষক শিক্ষা ব্যবস্থা মাত্র। শিশু নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়া নিজের চেষ্টায় শিখিবে—শিক্ষক সহায়ক হইবেন মাত্র—ইহাই এই শিক্ষা চিন্তার মূলকথা। শিশুকে সে যুগে বড় মানুষের ছোট সংস্করণরূপেই দেখা হইত ও বড়দের শিক্ষাধারা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। রুশো তৎপরিবর্তে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও তাহার নিজস্ব মানসিক চাহিদাকে স্বীকৃতি দিয়া শিশুশিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীর যুক্তি-ভিত্তিক-শিক্ষার প্রারম্ভ হইবে কারণ তাঁহার মতে এই বয়সেই (১২ হইতে ১৫) যুক্তির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার প্রেরণা হিসাবে

রুশোর শিক্ষা বিষয়ে অভিমত

কৌতূহল ও প্রয়োজনবোধকে ব্যবহার করার কথা তিনি বলিয়াছেন। কল্পনাশক্তির সদ্ব্যবহারকে তিনি পছন্দ করেন নাই। শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে শিশুকে নিজ প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষার সুযোগদান ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষাদান তাঁহার শিক্ষাচিন্তার অন্যতম অবদান। রুশো পুরুষের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপর যেমন গুরুত্ব দিয়াছেন মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহা দেন নাই। রুশোর লেখা হইতেই পরবর্তীযুগের শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাই রুশোকে সঙ্গত-ভাবেই আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়—যদিও কমিনিয়াসের এই বিষয়ে অবদান উপেক্ষনীয় নয়।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ঃ

শিক্ষার স্বরূপ কি, শিক্ষার লক্ষ্য কি—ইহা লইয়া অনেককাল হইতেই আলোচনা হইতেছে কিন্তু কিরূপ শিক্ষা মানুষ গ্রহণ করিতে পারে সে বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনা, গবেষণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। একটি বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময় যেমন বাড়ীটির বাস্তব মালমস্লা ও সেই সকল মালমস্লার প্রকৃতি মনে রাখিয়া তবেই নক্সা রচনা করিতে হয় তেমনই কি ব্যক্তি মানুষ, কি মানুষের সমাজ সম্বন্ধে কোন অভীষ্ট ঠিক করিতে হইলে মানুষের স্বভাব, তাহার সম্ভাবনার হিসাবও মনে রাখা দরকার। আগের যুগের অনেক মনীষী মানুষের কল্যাণ চিন্তায় অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ও অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে অতি মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনে। খ্রীষ্টের প্রেমের বাণী, বুদ্ধের অহিংসা ও বৈরাগ্যের উপদেশ, চৈতন্যের ভাবময়

দিব্যোন্মাদনা সবই সাধারণ মানুষের জীবনে অকেজো প্রমাণিত হইয়াছে। শঙ্করের মোহমুদ্গর সাধারণ মানুষের মোহকে বিশেষ কিছু টলাইতে পারে নাই। তেমনি অনেক রাষ্ট্রবিদের "ইউটোপিয়া" কল্পরাজ্যই রহিয়া গিয়াছে। কারণ মানুষের বাস্তব স্বরূপ না জানিয়াই তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, রোগীর ধাত না দেখিয়াই ঔষধ বাতলাইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে "শত্রু" চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে হিন্দু দর্শনে। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশে ইহারাই রস সঞ্চার করে এ তথ্য তাঁহারা প্রণিধান করেন নাই। তাঁহারা নদীর প্রবল স্রোত ধারাকে রুদ্ধ করার পরিকল্পনা করিয়া ব্যর্থতাই ডাকিয়া আনিয়াছেন—তাহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুধাবন করিয়া নিয়ন্ত্রিত খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন নাই। কমিনিয়াস, রুশো প্রভৃতি শিক্ষাবিদ এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু তাঁহারাও খুব বেশী কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ইহাদের মধ্যে রুশো অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তিনি বলেন যে প্রত্যেক জীবের একটা নিজস্ব বিকাশ ধারা প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত আছে। মানুষও প্রকৃতির সন্তান। কিন্তু সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়াছে তাই সমাজে আসিয়াছে নানা সমস্যা। মানুষ আবার প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হউক—তাহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে মান্য করুক ও বৃহত্তর বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করুক—তাহা হইলেই সে সুখী হইবে। রুশোর তত্ত্বে অতিরঞ্জন আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার উক্তি সমূহদ্বারা একটি উপেক্ষিত সত্যের প্রতি শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই সত্যই হইতেছে মানুষের জীবধর্মিতা। মানুষ জীব তাই তাহার মধ্যে কতকগুলি জৈবীপ্রকৃতি ক্রিয়াশীল।

এই প্রকৃতি জানিয়া তবেই মানুষের আবার আচরণের পরিবর্তন পরিকল্পনা করা সম্ভব হইবে। ছুতোর যেমন বিভিন্ন কাঠের গুণাগুণ জানিয়া তবেই নানা উপকরণ নির্মাণ করিতে পারে তেমনি মানুষের কোনরূপ রূপায়ণ পরিকল্পনা অর্থাৎ শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার আগে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি, তাহার মনোবিজ্ঞান জানার প্রয়োজন আছে।

রুশোর পরবর্তীযুগে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হইতে থাকে। কিন্তু তখনো মনোবিজ্ঞান ঠিকমত গড়িয়া উঠে নাই—তাই এই বিষয়ে খুব সচেতন হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী শিক্ষাবিদগণ যথা—পেষ্টালৎসি, ফ্রয়েবল প্রভৃতিগণ খুব বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আন্তঃপ্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানে শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লইয়া কিছুটা বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হইয়াছিল। রুশোর উচ্ছ্বাস প্রবণতা ইঁহাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ইঁহারাও বাস্তব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে কল্পিত তত্ত্বের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহারা বলিতে শুরু করেন প্রত্যেক শিশুর একটি সুনির্দিষ্ট প্রকাশধারা আছে—সেইটির পোষকতা করাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকের কাজের সঙ্গে মালির কাজের তুলনা করিয়া ইঁহারা বলেন—শিশুর বিকাশধারা জন্মমুহূর্তের পূর্ব নির্ধারিত ও বিধাতা নির্দিষ্ট। শিক্ষক সেই বিকাশধারার পোষকতা করিবেন মাত্র। এই সব কথা নূতন নূতন তাত্ত্বিক হেঁয়ালী সৃষ্টি করে। ফলে সাধারণ ব্যক্তি ও শিক্ষকগণ ঐ সব তত্ত্বে বিশেষ কিছু লাভবান হইতে পারেন না। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মূলকথা সামান্যীকরণ অর্থাৎ সাধারণ বিধি নির্ধারণ

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাবল্য

করা। ব্যত্যয় বা ব্যক্তির ঐ বিধি বহির্ভূত আচরণকে বেশী গুরুত্ব না দেওয়াই বিজ্ঞানের রীতি। তাই তাঁহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এই বাড়াবাড়ি ধারণা মনোবিজ্ঞানের মূল ধারণার বিপরীত বলাই সঙ্গত। তবুও ইহাদের প্রচেষ্টাসমূহ হইতেই পরবর্তীযুগে শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রয়োগ বিধি রচিত হইয়াছে। আজ শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে সমাজ ও ব্যক্তির আদর্শের কথা যেমন ভাবা হয় তেমনই ভাবা হয় ব্যক্তি সাধারণের পক্ষে কতখানি ঐ আদর্শের অনুসরণ সম্ভব এবং এই সম্ভাবনা বিচারে বাস্তব মানব সাধারণের মনোধর্ম ও প্রবণতা অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় আর অগ্রগতির পদ্ধতিকেও মনোবিজ্ঞান সম্মত করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান একসূত্রে গ্রথিত করিয়া সমগ্র শিক্ষাকে প্রয়োগ বিজ্ঞানে উন্নীত করিয়াছে।

শিক্ষার প্রয়োগ-মূলক বিজ্ঞানে পরিণতি

অবশ্য এখনো অনেক কিছু করিবার আছে অনেক অস্পষ্টতা ও মতভেদ বাধা হইয়া রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় মতভেদ রহিয়াছে সমাজ আদর্শের ক্ষেত্রে। তাহারপর মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ এমন সব পরস্পর বিরোধী মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে যাহার মধ্যে সাধারণ শিক্ষাব্রতীর পক্ষে পথ নির্ধারণ খুবই কষ্টসাধ্য। তবু আজ সত্য নির্ধারণে বাস্তব বিচার নূতন দিশারীরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় ঐসব অস্পষ্টতা অদূর ভবিষ্যতে দূর হইবে এমন ভরসা করা যায়।

মানুষ এতদিন প্রকৃতিকে জয় ও প্রকৃতির রহস্যভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতের মূল কার্যকারণ অনুসন্ধানরূপ বিজ্ঞান ও দর্শন লইয়া যত বেশী চিন্তা করিয়াছে নিজের অন্তঃপ্রকৃতি উদঘাটনে তত প্রচেষ্টা ব্যয় করে নাই। যদিও ভারতবর্ষে আত্মদর্শন কিছু নূতন কথা নয় কিন্তু সেখানে Subjectivity ছিল অত্যন্ত বেশী। এখন এক্ষেত্রে

নূতন Objective Studyর প্রেরণা দেখা দিয়াছে এবং তাহার আলোকে শিক্ষাবিজ্ঞানও দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিতেছে। শীঘ্র এমন দিন আসিবে যখন মানুষ নিজেকে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইবার সুস্পষ্ট পথের ইঙ্গিত লাভ করিবে। সেইদিন শিক্ষা সত্যই বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও মানুষ নিজেকে গঠন করা ব্যাপারে অনেক স্বাধীন হইবে।

জোয়ান হেনরিখ পেষ্টালৎসী (১৭৭৬-১৮২৭)—Pestalozzi

রুশোর পরবর্তী চিন্তানায়ক ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবিদ হিসাবে পেষ্টালৎসী সর্বাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শিক্ষাকে মনো-বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ও শিক্ষার্থীর দিকে পরিপূর্ণ দরদবোধ রাখিয়া শিক্ষাদান কার্য সম্পন্ন করার বাস্তব কাজ পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত তিনি সুরু করিয়াছিলেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করার ব্যাপারেও তাঁহাকে অগ্রণী বলা চলে, যদিও এই উভয়ক্ষেত্রে কমিনিয়াসের প্রচেষ্টা উপেক্ষণীয় নহে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—তিনি সুইজারল্যাণ্ডবাসী ইটালীয় প্রটেষ্টাণ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি বাল্যেই পিতাকে হারান। তাঁহার মাতা তাঁহাকে উপযুক্ত রূপে মানুষ করিবার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছিলেন কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু তাঁহার বাল্যশিক্ষা সুসংগত হয় নাই। তিনি যাজক বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। পরে আত্মোৎসর্গ করার মনোভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থা সংস্কারকামী সংঘভুক্ত হন। এই সময়ে তিনি প্লেটো ও রুশোর গ্রন্থাবলী পাঠ করেন এবং সামাজিক সংস্কারব্রতী হিসাবে কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত গ্রহণ করেন। সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তাঁহাকে কিছুকালের

জন্য কারাবরণ করিতে হয়। তৎপরে 'নিউহক' বা নূতন কৃষিক্ষেত্র নাম দিয়া একটি কৃষিক্ষেত্রে স্থাপনপূর্বক নানা কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে নূতন ধরণের চাষের আগ্রহ সৃষ্টি প্রচেষ্টায় ব্রতী হন কিন্তু ঐ কার্যে তাঁহার উপযুক্ত পূর্বজ্ঞান না থাকায় তাঁহাকে অর্থনৈতিক সংকটজনিত ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সময়ে তাঁহার একটি পুত্র হয় ও তিনি বাস্তব শিশু পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাহাকে শিক্ষা দিতে গিয়া অনুভব করেন যে **শিশুশিক্ষায় পুস্তক সাহায্যে বা অন্যভাবে তথ্যজ্ঞান প্রদানই প্রধান কথা নহে—শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই লক্ষ্য হওয়া উচিত।** মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে ও সামাজিক সর্বব্যাধি দূরীকরণে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব ও শিক্ষায় সার্বজনীন অধিকার বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী এই সময়েই বিকশিত হয়। তিনি তাঁহার নূতন কৃষিক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের কুড়িজন দুঃস্থ শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাহাদিগকে আহার্য, আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে কৃষি, কাঠের কাজ, সূতাকাটা ও কাপড় বোনার শিক্ষাও দিতে থাকেন। ঐ শিশুর শরীর, মন, নৈতিক মান ও সাথে সাথে বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত বিকাশ সম্ভব হয় এবং ইহাতে তাঁহার শিক্ষা ব্যবস্থা স্থানীয় আস্থা অর্জন করে। তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া অধিক সংখ্যক শিশু গ্রহণ করেন কিন্তু আর্থিক সংস্থানের অভাবে শেষ পর্যন্ত উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার পরে তিনি 'ঋষির সায়হ্ন কাল,' 'লিওনার্ড ও গ্রাট্রড' নামক দুইটী পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে **গৃহই হইবে শিক্ষার স্বাভাবিক ভিত্তি স্থাপন ক্ষেত্র।** দ্বিতীয় পুস্তকটিতে তিনি একটি গল্পের অবতারণা করিয়া সুশিক্ষার দ্বারা কিরূপে সমাজের উপকার করা যায় তাহা

চিত্রিত করিয়াছেন। মদ্যপ লিওনার্ডের স্ত্রী গ্রাট্রড্ নিজ পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করিলেন ও এইভাবে তাঁহার মদ্যপ স্বামীর হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিতে সক্ষম হইলেন ও তাঁহার প্রভাব গৃহ পরিবেশ অতিক্রম করিয়া ক্রমে গ্রাম ও রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমগ্র রাজ্যের সংস্কার সাধন করিল। এই পুস্তকটিকে তাঁহার লিখিত পুস্তক সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। ১৭৯৮খৃঃ ফরাসী বাহিনীর অষ্ট্রীয়া দেশ আক্রমণের সময়ে অনেক পিতামাতাহীন শিশু একটি হ্রদের তীরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ইনি রাষ্ট্রের নামমাত্র সাহায্য ভরসা করিয়া তাহাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন ও ষ্ট্যাঞ্জ নামক স্থানে একটি শিশু নিকেতন খুলিলেন। ক্যাথলিক অধিবাসীগণ প্রোটেষ্টান্ট হিসাবে তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন ও তাঁহার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তথাপি শুধুমাত্র ঐকান্তিক চেষ্টায় নানা অভাব অভিযোগ এমন কি শিক্ষাদানের সাধারণ উপকরণের অভাব উপেক্ষা করিয়া তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করিলেন। এই সময়েই তাঁহার শিল্পশিক্ষার সহিত বৌদ্ধিক শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে গভীর উপলব্ধি জন্মে। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তিনি পরে উহা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার পর ১৭৯৯খৃঃ তাঁহার শরীর সুস্থ হইলে তিনি "বাউরফ" স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন ও তথায় ৫ বৎসর কাজ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্পশিক্ষার সমন্বয় সাধনের সুযোগ পান নাই—কিন্তু পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তৎসম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া "কিভাবে গ্রাট্রড্ তাহার শিশুদিগকে শিক্ষা দেন" নামক পুস্তকে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতির বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮০৫

খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউব্যাটল হ্রদের তীরবর্তী ইভারডনে গমন করেন। এখানে তিনি ২০ বৎসর ছিলেন এবং প্রথম ১০ বৎসর বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি বাস্তব পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক শিক্ষাদান প্রনালীকে আরো বিকশিত করেন ও ভগ্নাংশ প্রভৃতির শিক্ষাদান উপযোগী বাস্তব উপকরণ সমূহ আবিষ্কার করেন। তাঁহার বিদ্যালয় দেশবিদেশের অনেক শিক্ষাগ্রহী ব্যক্তির তীর্থস্থানে পরিণত হয়। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবল এইখানে আসিয়া তাঁহার শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সহিত সুপরিচিত হন। তাঁহার বিদ্যালয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু শেষ ১০ বৎসর তাঁহার এই প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে ও ১৮২৫খৃঃ অত্যন্ত হতাশ হইয়াই তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তাহার পরে তিনি দুইটী পুস্তক প্রকাশ করেন। উহার মধ্যে "হংস সঙ্গীত" পুস্তকে তিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত তাঁহার কর্মোদ্যমের ক্রটী-বিচ্যুতি ও সাফল্য-অসাফল্যের বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তকটির নামের অর্থ মৃত্যুপথযাত্রী হংসের শেষ সঙ্গীত। ১৮২৮খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

পেষ্টালৎসির শিক্ষামত

রুশোর শিক্ষাদর্শের বাস্তব অনুকরণ

তিনি শিক্ষা বলিতে **শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ বুঝিতেন।** এই বিকাশ যদিও শিশুর আভ্যন্তরীণ তাগিদ হইতেই হইবে তথাপি ইহা শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা পরিপূর্তি লাভ করে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন এবং তাই তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন। রুশো শিশুকে স্বাভাবিক পরিবেশে রাখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তাগিদে তাহাকে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে বলিয়া শিক্ষকের কাজকে কেবল তত্ত্বাবধায়ক পর্যায়ে আনিতে চাহিয়াছিলেন—পেষ্টালৎসি **শিশুকে বুঝিয়া তাহার উপযোগী পদ্ধতি ও**

উপকরণাদি সহায়ে তাহার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলিয়াছেন। তিনি প্রকৃতি বলিতে শুধু বহিঃপ্রকৃতি বুঝেন নাই শিশুর অন্তঃপ্রকৃতিকেও বুঝিয়াছেন। এইভাবে তিনি রুশোর "না-ধর্মী" শিক্ষামতের স্থলে এক মনোবিজ্ঞান সম্মত "হ্যাঁ-ধর্মী" শিক্ষার ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতিকে শিক্ষার অন্যতম সহায়ক হিসাবে স্বীকার করিয়াও তিনি কিন্তু শিশুকে প্রকৃতির মধ্যে অবাধ বিচরণ করিয়া শিক্ষা আহরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেন নাই; পক্ষান্তরে তিনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তব পর্যবেক্ষণ সহায়ে শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে ধারণালাভের সহায়তা প্রদানকে তিনি গুরুত্ব দিয়াছিলেন ও ঐজন্য উপযোগী শিক্ষোপকরণের ব্যবহার বিষয়েও পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। শিশু শিক্ষায় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং শিল্প, কৃষি প্রভৃতি উদ্যোগ কর্মের সহায়তা গ্রহণ করিয়া তিনি আধুনিক কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষার ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ছোট শিশুর শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিয়া ঐ বয়সের শিক্ষক হিসাবে মাতার ভূমিকাকে তিনি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নীতিশিক্ষার জন্য উপদেশ অপেক্ষা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত আচরণটির মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলেই যে সত্যকার সুফল লাভ করা যায় ইহাও তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বাস্তবকাজে ও চিন্তায় শিক্ষাকে সাধারণের সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন এবং শিক্ষালয়কে গণ-তান্ত্রিকভাবে সংগঠিত করা বিষয়েও বাস্তব উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ছিল অকৃত্রিম। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও শিক্ষায় কর্মের ও পর্যবেক্ষণের উচ্চমূল্য দান ব্যাপারে তাঁহাকে পথিকৃৎ বলা হয়।

শিক্ষায় পর্যবেক্ষণের মূল্য

সমালোচনা

তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পান নাই এবং সাফল্যকে সংহত করিবার মত ধৈর্যের অভাব তাঁহার ছিল। এই জন্য সাফল্যের সাক্ষাৎ পাইয়াও তাঁহাকে প্রচেষ্টাক্ষেত্র হইতে বারবার সরিয়া যাইতে হইয়াছে ও তিনি মনোবেদনা লইয়াই জীবন শেষ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁহার দরিদ্রের প্রতি দরদবোধ ও বিশেষভাবে শিশু-প্রীতি তাঁহার চরিত্রকে মহান করিয়াছে। শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁহার অনেক ত্রুটী বাহির করা সম্ভব হইলেও তিনি শিক্ষার যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অবদান আজিও অম্লান রহিয়াছে। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ বিষয়ে তিনি যেটুকু করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তাহা হয়তো বর্তমান অগ্রগতি বিচারে যৎকিঞ্চিৎ ও ত্রুটিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু এই বিষয়ে তিনিই পথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। শিল্প প্রভৃতিকে শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সহায়করূপে ব্যবহার, শিক্ষায় ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ ও উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ সহায়ে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট করা বিষয়ে তাঁহাকে পথিকৃৎ বলিতেই হইবে। কমিনিয়াসের শিক্ষাচিন্তায় ইহার কিছু কিছু আভাস অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহা ইঁহার হাতে যেমন রূপ পাইয়া শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে পূর্বে তাহা করে নাই। শিক্ষামনোবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উন্মেষ সাধনের কথাও বলিয়াছেন—আবার বাহিরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা অভীষ্ঠ শিক্ষা প্রদানের কথাও বলিয়াছেন। ইহার প্রথমটি পরবর্তীযুগে ফ্রয়েবলকে তাঁহার প্রসিদ্ধ কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রেরণা জোগাইয়াছে ও শেষটি হার্বাটের হাতে অধিকতর পরিণতি লাভ

করিয়াছে। নিজের কাজ ও অভিজ্ঞতা তিনি যেমন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি নিজের ত্রুটী, অসাফল্যও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এইভাবে নিজের কাজের সুষ্ঠু সমালোচনা ও উপযুক্ত মূল্যায়ন প্রচেষ্টা তাঁহাকে শিক্ষাবিজ্ঞানী হিসাবে অধিকতর সম্মানযোগ্য করিয়াছে। এইসব বিবেচনা করিলে সকল ত্রুটী উপেক্ষা করিয়াও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদের সম্মান না দিয়া পারা যাইবে না।

জোহান ফ্রেডারিশ হার্বার্ট (Herbart) (১৭৭৬-১৮৩৪)

ইনি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্টের পরিত্যক্ত কোয়েসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাচার্যের পদে নিযুক্ত হন ও তাঁহারই মত শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়ি বৎসর অধ্যাপনা করেন। শিক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ নূতন নহে। যে সমস্ত দার্শনিক উভয় বিষয়ে সমান যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তাঁহার অবদান আজিও পূর্ণ স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

ইনি প্রাশিয়ার অলডেনবার্গ সহরে এক কৃষ্টি-সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ছিলেন ব্যবহারজীবি এবং মাতা একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁহার পিতামাতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ায় তিনি মাতার রক্ষণাবেক্ষণেই মানুষ হন। শৈশব হইতেই তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হন ও দার্শনিক ফিক্‌টের ছাত্র হিসাবে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু পাঠ শেষ করিবার পূর্বেই তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডের এক গভর্ণরের গৃহ শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করিতে হয়। সেই সময় তিনি বার্গডর্ফের শিশু বিদ্যালয়ে গিয়া পেষ্টালৎসির শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা

সম্বন্ধে তাঁহার মতাদর্শের সহিত পরিচিত ও আকৃষ্ট হন। পরে তিনি গৃহশিক্ষকতা ছাড়িয়া গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে উপাধি অর্জন করেন। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নষ্ট হয় নাই। পরে তিনি কোয়েন্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাণ্টএর স্থলাভিসিক্ত হন ও ঐ বিশ্বাবিদ্যালয়ে ২০ বৎসর শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেন। ইহা ছাড়া শিক্ষাপ্রীতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ বশতঃ তিনি প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন। পরে ১৮৩৩ খ্রীঃ তিনি আবার কোয়েন্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপদে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিক্ষাবিজ্ঞানের উপর পুস্তক লিখিয়া বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। কার্ল ভল্‌কমার ষ্টোয়, টুইসকন, জিলার, প্রভৃতি তাঁহার সুযোগ্য ছাত্রগণ তাঁহার ঐ খ্যাতি আরও বৃদ্ধি করেন ও শিক্ষাবিজ্ঞানে হার্বাটধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার শিক্ষামত প্রধানতঃ প্রথম জীবনের গৃহ-শিক্ষকতা ও পরবর্তী যুগের বাস্তব শিক্ষাদান অভিজ্ঞতা, পেষ্টালৎসির শিক্ষাধারার সহিত পরিচিতি এবং তাঁহার যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ এই তিনটী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

হার্বাটের দার্শনিক মতবাদ :—

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপনির্ণয় ও তাহার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সমাজনীতি, চরিত্রনীতি প্রভৃতির সমালোচনা ও সংযোজনা। বিশ্বে যে নিয়ম শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি বর্তমান তাহা অনুধাবন করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই বিশ্বের স্রষ্টা হিসাবে কোনও বুদ্ধি বিবেচনাযুক্ত সত্তার কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। এই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় ও সৃষ্টি প্রকরণ ব্যাখ্যাই ছিল

প্রথম যুগের দর্শন—ইহা ছিল আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে খ্যাত। কিন্তু বিশ্বে শুধু সঙ্গতি ও সুষমার অস্তিত্ব দেখা যায় না। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি, কুশ্রীতা ও মন্দের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাই অনেক দার্শনিক একজন স্রষ্টার বিরুদ্ধ শক্তিও কল্পনা করিয়াছেন ও দুইএর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক আরোপ করিয়া বিশ্ব বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অপর পক্ষে বিশ্বসৃষ্টি আধ্যাত্মিক পরিকল্পনাহীন ও বস্তুসমূহ নিজের নিয়মে চলিয়াই বর্তমান সঙ্গতি অসঙ্গতিযুক্ত বিশ্ব সম্ভব করিয়াছে বলিয়া জড়বাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিয়াছেন। পরবর্তীযুগে ফ্রান্সিস বেকন ও দেকার্তে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা বিশ্লেষণ করিবার দিকে দর্শনের দৃষ্টি ফিরাইয়া নব্য দর্শনের ধারা প্রবর্তন করিলেন। বেকন মানুষের প্রাপ্ত সকল জ্ঞান একত্রিত করিয়া তাহার উৎপত্তির ধরণধারণ প্রণিধানপূর্বক তাহার নির্ভরশীলতা যাচাই করা ও তাহার ভিত্তিতে দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার এক নূতন ঝোঁক প্রবর্তন করিলেন, আর দেকার্তে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল জ্ঞানকে সন্দেহ করিয়া এবং কেবলমাত্র সন্দেহকারী "অহং"এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ভিত্তিতে দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। অতঃপর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সংবিদ সমূহের যথার্থ নির্ধারণ, মনের স্বরূপ নির্ধারণ ও তাহারই ভিত্তিতে প্রতিভাত বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা দর্শনের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান দর্শনের প্রধান দুইটি শাখারূপে গণ্য হইয়াছে। স্পিনোজা বিশ্বে একটি সর্বব্যাপী অসীম সারবস্তুর অস্তিত্ব হইতেই ইন্দ্রিয় ও মনের সসীমত্বহেতু ঘটনাসমূহের প্রতীতি সৃষ্টি করিতেছে, জ্যামিতিক উপপাদ্যের আকারে এই তত্ত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া

দর্শনের শাখা হিসাবে মনো-বিজ্ঞান ও অর্থ-বিজ্ঞানের জন্ম

যুক্তি তর্ক গ্রাহ্য দর্শনের ভিত্তি গড়িয়া গিয়াছেন। লক মানবীয় জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার সীমা বিশ্লেষণ দ্বারা মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাপ্ত সংবিদ-সমূহকেই জ্ঞানের মূলাধাররূপে দেখিয়াছেন ও এইভাবে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সমূহই যে আমাদের সকল জ্ঞানের ভিত্তি তাহা প্রমাণ করিয়া জ্ঞানের প্রকারভেদ ও তাহার সীমাবদ্ধতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী দার্শনিক বার্কলে দর্শনের এই অজ্ঞেয়বাদী পরিণতি ও অপরপক্ষে কার্যকরণ সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবাদী ঝোঁক হইতে দর্শনকে পুনরায় অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

জ্ঞানের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের স্থান

তিনি বলিলেন আমরা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের পরোক্ষজ্ঞানই প্রাপ্ত হই—তাহারা বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে সাক্ষাৎজ্ঞান দিতে পারে না। আলো-শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বাহিত হইয়া যে বিশেষ সংবেদন সৃষ্টি করে তাহা আমাদের মনের দ্বারাই ঐ বস্তুটিরও অস্তিত্ব স্বরূপবোধরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং মনই সৎবস্তু—অর্থাৎ তাহার অস্তিত্বেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সুতরাং এই বিশ্ব বস্তুধর্মী নয় মনোধর্মী। ঈশ্বর অনন্ত মনন শক্তির আধার এবং আমাদের স্বরূপও মনোধর্মীস্বরূপ। বস্তুজ্ঞান উপজাত জ্ঞানমাত্র, ইহা সত্যস্বরূপ নহে। ইহার বিরোধিতা করিলেন হিউম। তিনি বলিলেন মন ও বিশ্বমন বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা বার্কলে দিয়াছেন তাহাও তাঁহার মনের উপলব্ধি। মনের উপলব্ধির বাস্তব অস্তিত্ব যদি অপ্রমাণিত বলিয়া গণ্য হয় তবে যে মন দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা হইতেছে তাহার অস্তিত্বও সাথে সাথেই অপ্রমাণিত হইয়া যায়। এইভাবে হিউম অধ্যাত্মবাদী দর্শন খণ্ডন করিলেন। কিন্তু তিনি সাথে সাথে ইহাও দেখাইলেন যে বহির্বস্তু

যে সমস্ত সংজ্ঞা বহন করে তাহা বস্তুর কতকগুলি গুণই প্রকাশ করে এবং বস্তুর স্বরূপ ও বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর ক্রিয়ার কার্যকরণ সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্যকরণ-সম্বন্ধ-শৃঙ্খলাবাদ মনের আরোপিত ধর্ম। ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ সিদ্ধ নহে। তাঁহার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত জড়বিজ্ঞানের ভিত্তিতেও আঘাত করিল। এইভাবে অধ্যাত্মদর্শন ও জড়বিজ্ঞান উভয়ের ভিত্তিতে আঘাত করিয়া হিউম পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দার্শনিক প্রবর ক্যাণ্ট দর্শনের এই অচল অবস্থা সমাধানে উদ্বুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় নিচয় সহায়ে আমরা যে বস্তুজ্ঞানপ্রাপ্ত হই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে বুদ্ধির কতকগুলি প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞান সহায়েই বস্তু হইতে প্রাপ্ত ইন্দ্রিয় বাহিত সংবেদ বস্তু সম্বন্ধে ধারণালাভে সাহায্য করে। ইন্দ্রিয় সাহায্যে সংবেদ পাওয়া যায় না এমন বিষয়েও বুদ্ধি তাহার প্রত্যক্ষ পূর্ব জ্ঞানের আরোপ করিতে যাইলে তখন নানা ভ্রমের সম্মুখীন হইতে হয় ও বিপরীত সিদ্ধান্তে আসা যায়। সুতরাং সকল সত্য বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে। কিন্তু বুদ্ধিই একমাত্র সত্য ধারণার উপায় নহে—প্রত্যয় সাহায্যেও অনেক বিষয়ে সত্য ধারণা লাভ করা যায়। যেসব দ্রব্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সংবেদ সহায়ে জানা সম্ভব নহে সেখানে বুদ্ধি অপেক্ষা প্রত্যয়ই নির্ভরযোগ্য এবং শেষোক্ত উপায়েই আমরা বিশ্বস্বরূপ ও বিশ্বকরণ তথা নৈতিক নিয়মসমূহ জানিতে পারি। তাই প্রত্যয়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সৎ প্রমাণ। ক্যাণ্টের এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া রুশো, প্রত্যয়প্রধান প্রকৃতিবাদী দর্শন অনুসরণ করেন। কিন্তু হার্বার্ট তাঁহার দর্শনের প্রথমাংশের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হন এবং দর্শনেন্দ্রিয় সহায়ে কিভাবে আমরা বহির্বস্তুর ধারণা লাভ করি তাহা প্রনিধানপূর্বক ও তাহার

প্রত্যয় বাদের উদ্ভব

আলোকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বিশ্লেষণপূর্বক সত্য ধারণা লাভের পন্থা আবিষ্কারে ব্রতী হইলেন। এইজন্য ইহার দর্শন মনোবিজ্ঞান প্রধান। তিনি ক্যাণ্টের মত বুদ্ধির প্রত্যক্ষপূর্বক ধারণাকে মনের ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা না করিয়া তাহার উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্যাণ্ট, দেশ ও কাল ধারণাকে বুদ্ধির প্রত্যক্ষ পূর্ব ধারণা ও উহা মনের ধর্ম বলিয়াছেন—কিন্তু হারবার্ট উহাদিগকে ইন্দ্রিয়নিচয় হইতে প্রাপ্ত বস্তুসংবেদসমূহ হইতে সঞ্জাত ধারণা মনে করেন। তিনি দেশ ও কালের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই ও সৎপদার্থ সমূহকে চিন্তার অধীন মনে করিয়াছেন।• আত্মার বা অহং এর সহিত বিভিন্ন সংবেদের সংঘট ঘটিলে তাহার অনেকগুলির প্রভাব পরস্পর কাটাকাটি করে ও সমজাতীয় সংবেদগুলি পরপর সংযুক্ত হইয়া প্রত্যয় উৎপন্ন করে—ইহাই তাঁহার প্রত্যয় সম্বন্ধে অভিমত। এইভাবে তিনি মনের কাজকে যন্ত্রবিদ্যার নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনোবিজ্ঞানকে "মনের যন্ত্রবিদ্যা" বলা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি এই মতবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞানে যন্ত্রের নিয়ম আরোপ

হার্বার্টের শিক্ষামত :—তিনি প্লেটোর মতই সৎগুণের বিকাশ সাধন ও নৈতিক চরিত্রগঠনকে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি নৈতিক সৌন্দর্যবোধকে চরিত্রবিজ্ঞানের ভিত্তি মনে করিতেন অর্থাৎ সুরুচিবোধ তাঁহার মতে চরিত্রগঠনের প্রধান উপকরণ। তাই তিনি মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় সুস্থ ধারণাসমূহ প্রদান করিয়া ইচ্ছা ও রুচিবোধকে বিকশিত করার প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন। ক্ষুদ্র সাংসারিক স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া নৈতিক সৌন্দর্য ও রুচিবোধের দ্বারা পরিচালিত হইলেই চরিত্র গঠিত

হইয়াছে মনে করিতে হইবে—ইহাই তাঁহার অভিমত। শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসাবে তিনি পেষ্টালৎসির পর্যবেক্ষণধর্মী শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাদানের দ্বারা মানুষের বিকাশ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর স্বাভাবিক বিকাশকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। তিনি জাতির ক্রমবিকাশের ধারার সহিত ব্যক্তির বিকাশের ধারার সঙ্গতি বিশ্বাস করিতেন —ইহাই পরে "সংস্কৃতি পর্ব তথ্য" (Culture epoch theory) রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়াছেন। চাপাইয়া দেওয়া শৃঙ্খলা অপেক্ষা শিক্ষার্থীর স্বতঃ সঞ্চারিত শৃঙ্খলাবোধকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হইতেই এইরূপ শৃঙ্খলাবোধ আসিতে পারে ও শিক্ষাকার্য গভীরতা লাভ করিতে পারে। এইজন্য শিক্ষাকে আগ্রহকেন্দ্রী করিবার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিয়াছেন। কিন্তু তিনি "হাত বুলিয়ে শিক্ষাদান" বা Soft pedagogy-এর অনুসরণকারী ছিলেন না। তিনি আগ্রহ অর্থে পুরস্কারাদি লাভের আগ্রহ মনে করিতেন না, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহই বুঝিতেন। ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে বিরতি দ্বারাই আগ্রহ সৃষ্টি হয় ইহাই তাঁহার মনোবৈজ্ঞানিক অভিমত। সত্যকার আগ্রহ স্থায়িত্বধর্মী ও উহা ক্লেশ স্বীকারের শক্তি প্রদান করে। তিনি চিন্তাক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ঘটাইয়া বিভিন্নমুখী আগ্রহ সৃষ্টিপূর্বক ব্যক্তিকে বিকশিত করিয়া তোলা ও বহু ব্যক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ রচনার উপযোগী করিয়া তোলার বিশ্বাসী ছিলেন।

সংস্কৃতি পর্ববাদ

শিক্ষা পদ্ধতি :—

হার্বার্ট তাঁহার মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহকে সার্থকভাবে শিক্ষার্থীর নিকটে উপস্থাপিত

করার একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা অধিকতর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া হার্বাটের পঞ্চ-সোপান-পদ্ধতিরূপে আজিও প্রচলিত রহিয়াছে। তিনি মনে করিতেন যখন আমরা প্রথমে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করি তখন ঐ বিষয়েই আমাদের মানসিক শক্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়, নিজের ও পূর্বলব্ধ বিষয় সমূহের প্রতি আমরা অনবহিত হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহার পরবর্তী বিষয়ে পর্যায়ক্রমে ঐ বিষয়টির সহিত নিজের ও পূর্বজ্ঞানলব্ধ বিষয়সমূহের একত্র সন্নিবেশ প্রচেষ্টা দেখা দেয়। ইহার একটি পর্যায় তাই অভিনিবেশ ও দ্বিতীয় পর্যায়টি সংবদ্ধকরণ। ইহার ভিত্তিতে তিনি শিক্ষনীয় বিষয়কে (১) সুস্পষ্টতা, (২) সম্বন্ধস্থাপন, (৩) সংবদ্ধন ও (৪) পদ্ধতি—এই চারিটি স্তরে প্রদানের কথা বলেন। তাঁহার পরবর্তীগণ এই পর্যায়গুলির নাম দেন (১) উপস্থাপন অর্থাৎ নূতন তথ্য শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত করা, (২) তুলনা ও সম্বন্ধস্থাপক নূতন তথ্যকে মনের পূর্বার্জিত তথ্য ও জ্ঞানের সহিত একত্রীকরণ, (৩) সামান্যীকরণ বা নূতন জ্ঞানের সহিত পুরাতন জ্ঞানকে মিলাইয়া পূর্ণতর জ্ঞান বা তত্ত্ব অনুধাবন, ও (৪) প্রয়োগ অর্থাৎ নূতন লব্ধ জ্ঞান বা তথ্যকে নূতন নূতন ক্ষেত্রে ব্যবহারের মধ্য দিয়া দৃঢ়ীকরণ। এই চারিটি স্তরের সহিত প্রাথমিক একটি স্তর যুক্ত হইয়াছে; তাহা হইতেছে আগ্রহ সৃষ্টি বা মানসিক প্রস্তুতি। হার্বাট যে ইহার উপর গুরুত্ব দিতেন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ৫টী স্তর বর্তমানে অনুসৃত হয়। (১) প্রস্তুতি, (২) উপস্থাপন, (৩) তুলনা ও সংযোগ সাধন, (৪) সামান্যীকরণ, ও (৫) প্রয়োগ। ইহার মধ্যে ২, ৩, ৪ এই তিনটিকে একটি স্তরের

পঞ্চ সোপান পদ্ধতি

মধ্যেই সুংযুক্ত করা যায় ও বর্তমানে তাই (১) **প্রস্তুতি**, (২) **উপস্থাপন** ও (৩) **প্রয়োগ এই তিনটি স্তরই ব্যবহৃত হয়**। মামুলী বিষয় সমূহের পাঠদানে আজিও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ শ্রেণীগত পাঠদানে ইহার সুবিধা আজিও স্বীকৃত।

সমালোচনা :—হার্বাটের মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহকে অনেক ক্ষেত্রে কাল্পনিক ও যান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু তাঁহার সময়ে ফলিত মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই। শুধু আত্মসমীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁহার এই তথ্যসমূহ যথেষ্ট অগ্রগামী চিন্তার পরিচায়ক। তিনি পেষ্টালৎসির মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাকে অনেকখানি অগ্রগতি প্রদান করিয়াছিলেন ও শিক্ষাকে দার্শনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখাইয়াছিলেন। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁহার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ফ্রেডারিশ উইলহেল্‌ম আগষ্ট ফ্রয়েবল (Froebel) (১৭৮২-১৮৫২)

পেষ্টালৎসির শিক্ষাচিন্তায় সাক্ষাতভাবে উদ্বুদ্ধ এই শিক্ষাবিদ্ শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অবিনশ্বর স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—তুর্গিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ওবারহইটব্যাচ সহরে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি শৈশবেই মাতাকে হারান এবং গ্রাম্য পাদরী পিতার রক্ষণাবেক্ষণে মানুষ হন। বাল্যে তিনি অল্প মেধাসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হন। পরে মামার রক্ষণাধীনে কতকটা অবহেলার সহিতই বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান। মামা তাঁহাকে বনবিভাগের কর্মচারী হইবার শিক্ষানবিশীতে নিযুক্ত করেন। বনানীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাঁহার সহিত নিজ অগ্রজের নিকট হইতে প্রাপ্ত সর্বেশ্বরবাদী দার্শনিক মতবাদ মিশ্রিত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের প্রতি এক ভাবময় অনু-

রাগ জন্মে। তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শুরু করেন কিন্তু ঋণের দায়ে নয় সপ্তাহ কারাবরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হন। কয়েক বৎসর বেকার থাকিয়া ফ্রাঙ্কফুটের নর্মাল স্কুলের ড্রইং শিক্ষক পদ প্রাপ্ত হন। শিক্ষকতা কাজে ব্রতী হইয়া পেষ্টালৎসির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন ও আরও দুই তিনজন ছাত্র সমভিব্যাহারে ইভারডনে গিয়া দুই বৎসর পেষ্টালৎসির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকেন। তাহার পর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিজ বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। তাঁহার দুইজন সহকর্মী ল্যাঙ্গেবেল ও মডনডর্কের সহিত মিলিতভাবে কিয়েলহউ সহরে একটি বিদ্যালয় খোলেন ও সেখানে পেষ্টালৎসির ভাবধারায় শিক্ষাদান করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার শিক্ষায় প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগকে অধিক গুরুত্ব দিতে থাকেন—কারণ বনবিভাগের কাজ করার সময় ও খনিজ বিদ্যা অধ্যয়ন কালে তিনি প্রকৃতির রহস্য ও মানব জীবনে তাহার প্রভাব বিষয়ে খুবই আগ্রহী হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি কাগজ ও কাঠের কাজকর্ম, সামাজিক শিক্ষা ও কাজকর্ম, গণতান্ত্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালন প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ের কাজ-কর্মের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি শৈশব হইতে ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার উপরই বেশী গুরুত্ব দেন। "মানুষের শিক্ষা" নামক পুস্তকটি তিনি এইখানে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই বিদ্যালয় বন্ধ করিতে হয়। পরে সুইজারল্যাণ্ডের সরকার কর্তৃক আহুত হইয়া সেখানে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান ও শেষে বার্কডর্ফের পেষ্টালৎসি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন। সেখানকার কাজ ছাড়িয়া জার্মানীতে আসিয়া বনানী শোভিত ও প্রাকৃতিক শোভাময় ব্রাঙ্কেনবার্গ সহরে ৩ হইতে

৭ বছরের শিশুদের জন্য নার্শারী স্কুল খোলেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের নাম দিয়াছিলেন কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু উদ্যান। শেষোক্ত বিদ্যালয় ও তাঁহার অভিজ্ঞতাসমূহ-বর্ণিত পুস্তকগুলি তাঁহাকে শিক্ষাবিদ হিসাবে অমর করিয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে তিনি তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণা ও মতামত প্রচারনায় ব্যয় করেন। তাঁহার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁহার মতাবলম্বনে শিশু বিদ্যালয়সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৮৫১ খ্রীঃ প্রুশিয়া সরকার তাঁহাকে সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া সন্দেহ করেন ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করিয়া দেন। দশ বৎসর পরে প্রুশিয়ার সরকার স্বীকার করেন যে ভ্রমাত্মক সংবাদের ভিত্তিতে ঐরূপ করা হইয়াছে এবং সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীঃ কিছুটা ব্যথাহত চিত্তে এই বিশ্ব বিখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রাণত্যাগ করেন।

ফ্রয়েবলের শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি :—

ফ্রয়েবল নিজ শিক্ষাচিন্তার পশ্চাতে দার্শনিক ভিত্তিকে গুরুত্ব দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু দার্শনিক হিসাবে তাঁহার স্বীকৃতি দার্শনিক সমাজে ছিল না। তিনি কিছুদিন জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেলিং এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার দার্শনিক মত শেলিংএর দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। শেলিং ফিক্‌টে নামক অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকের শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি স্পিনোজা দ্বারা প্রভাবিত হন। আমরা ইতিপূর্বে দার্শনিক প্রবর ক্যাণ্টের কথা আলোচনা করিয়াছি। ফিক্‌টে ক্যাণ্টের দর্শনকে আরও অধ্যাত্মবাদীমুখী করেন। দর্শনেন্দ্রিয় বাহিত সংবেদনকে মনঃ-বুদ্ধি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সংবিতে পরিণত করে এবং বুদ্ধিতে অবস্থিত প্রত্যক্ষপূর্ব দেশকাল ও অপর কতকগুলি বিচার প্রয়োগে ব্যবস্থিতরূপ প্রদান

করে ও তাহার ফলেই বস্তু জগত হইতে বাহিত সংবেদ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় ও আমরা বহিঃপ্রকৃতিতে পরম্পার্য লক্ষ্য করিতে ও প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ অনুধাবণ করিতে পারি। বহিঃপ্রকৃতিতে যে নিয়ম আছে তাহা আমাদের মনেও আছে নতুবা শুধু ইন্দ্রিয়বাহিত সংবেদ প্রভাবে তাহার হৃদয়ঙ্গম সম্ভব নহে। ইহাই ক্যাণ্টের অভিমত। ফিক্‌টে বুদ্ধিতে কিভাবে প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞান সম্ভব হয় তাহা ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনি বলিলেন অহং অসীম ও কালাতীত; কিন্তু তাহা খণ্ডিত হইলে অসীমের ক্রিয়া খণ্ডিত ও প্রতিহত হয়। সেই প্রতিহত অসীমের ক্রিয়াই বহির্বস্তুর সংবেদরূপে অহংএ ফিরিয়া আসে। অনন্ত অহং নিজে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতে পারে না বলিয়া নিজেকে এইরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া অহং বহিঃপ্রকৃতির জন্মদান করে। কিন্তু অহং নিজের অসীমত্বকে অনাস্বাদিত রাখিতে চাহে না— তাই তাহার বিচ্ছিন্ন সত্তাকে পুনঃগ্রথিত করিয়া অসীম অহং রূপ পুনঃপ্রাপ্তির প্রচেষ্টাও তাহার মধ্যে আছে। বিজ্ঞান ও সমাজ রচনার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন অহং এর সেই প্রচেষ্টা দেখা যায়— দর্শনও তাহারই প্রচেষ্টার আর একদিক। শেলিং ফিক্‌টের এই আধ্যাত্মদর্শন হইতে তাঁহার দর্শন সুরু করিলেন বটে কিন্তু পরে তিনি বহিঃপ্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ও উহাকে অহং এর অপর প্রকাশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতি ও জ্ঞাতা, ইহাদের অভেদ দর্শনই দর্শনের অভিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তাহারও পরে তিনি মিষ্টিসিজম্ এর দিকে ঝুঁকিয়াছেন। ফ্রয়েবল তাঁহার বনবিভাগের শিক্ষানবিশী কর্মরত অবস্থায় চিন্তা ও ভাবের দিক হইতে সর্বেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। শেলিংএর প্রভাবে ও সমসাময়িক দার্শনিক ক্রোচের প্রভাবে তাঁহার ঐ দার্শনিক দৃষ্টি-

ভঙ্গীই দৃঢ়তা লাভ করে। বিশ্ব সত্তা ও বিশ্বে তাঁহার অনন্ত বিধান উপলব্ধি করাই তিনি জ্ঞানের লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ ঘেঁষা হইলেও তাহা পুরাপুরি সর্বেশ্বরবাদ বলা যায় না—একই বিশ্বাত্মার বহুত্ব, ইহাই তাঁহার দার্শনিক মতবাদ। তিনি তৎকালীন "বিরুদ্ধ সংঘাত বিধি" দর্শনকেও তাঁহার শিক্ষামত ব্যাখ্যায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং ক্রমবিবর্তনের কথাও ব্যবহার করিয়াছেন—যদিও ঐ ক্রমবিবর্তন ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে একার্থযুক্ত নহে। তিনি বলিয়াছেন, "বিরুদ্ধগুণের সমন্বয় দ্বারা ব্যক্তি অধিকতর জটিল ও উন্নত অবস্থায় আসে ও এইভাবে তাহার ক্রমবিবর্তন ঘটে।" কিন্তু প্রকৃতির সহিত শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ তাহাকে উন্নত করে—এই তথ্য ব্যাখ্যায় তিনি শেলিংকেই অধিকতর অনুসরণ করিয়াছেন।

শিক্ষামত :—

তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে শুধু জ্ঞান, অভ্যাসগঠন বা কলা-কৌশলে নৈপুণ্য অর্জন বুঝিতেন না—**সর্বাঙ্গীন বিকাশকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়াছেন।** তিনি **শৈশবের শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন।** শিশুর খেলাকেই শিশুর প্রকৃতিগতভাবে শিক্ষালাভের পদ্ধতি বলিয়া তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন। শিশুর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা তাঁহাকে এই সত্য অনুধাবণে সাহায্য করিয়াছিল। এই সত্য তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক শিক্ষাবিদ অনুধাবণ করিলেও তাঁহারা শিশু শিক্ষায় ইহার বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর ব্যাপারে সামান্যই অগ্রসর হইয়াছেন। এইদিক হইতে ফ্রয়েবলের অবদান অতুলনীয়।

তাঁহার উদ্ভাবিত "উপহার" ও বৃত্তিমূলক খেলাসমূহ :—

শিশুর খেলা বিষয় তাঁহার সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত পদ্ধতি ও উপকরণসমূহ শিশু শিক্ষায় তাঁহার সাফল্যের বাস্তব সাক্ষ্য। উপহার

(gifts)গুলি কতকগুলি খেলনা যেগুলির আকার আকৃতি পরিবর্তন করা যায় না—বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত করিয়া খেলিতে হয়। ১ম উপহার হইতেছে ৬টী পশমের বল—ইহাদের রঙ বিভিন্ন। এইগুলি নানাভাবে গড়াইয়া ও সাজাইয়া শিশুরা খেলা করিবে। তিনি ইহার উপযোগিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

শিশুর উপহার দার্শনিক খেলনা

গোলাকার বস্তুর মধ্যে বিন্দু, সরলরেখা, বক্ররেখা, সমতল সব কিছুই আছে ও ইহা একাধারে সসীম ও অসীম। এইগুলির মধ্য দিয়া শিশু সসীমের মধ্যে অসীমের ধারণা করিবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা পাইবে—ইহাই তাঁহার যুক্তি। বলাবাহুল্য তাঁহার এই দার্শনিক যুক্তির সহিত খুব কম লোকই একমত হইবেন। তাঁহার অন্যান্য উপহারগুলি নানা জ্যামিতিক আকারযুক্ত ও প্রত্যেকটীর জন্যই তিনি ঐরূপ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। দার্শনিক ব্যাখ্যার সহিত একমত না হইলেও প্রত্যেকটি খেলনাই শিশুর আনন্দ ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্যামিতিক আকার, বর্ণ প্রভৃতি ধারণা লাভের সহায়ক বলিয়া উৎকৃষ্ট শিক্ষোপকরণ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য।

বৃত্তিমূলক খেলা

তাহা ছাড়া তিনি কাদা, কাগজ, কাঠ, বালি প্রভৃতির সাহায্যে যে বৃত্তিমূলক খেলা (occupations) গুলির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। তিনি শিশুদের উপযোগী অনেক ছড়া ও গল্প সংগ্রহ করিয়া "মায়ের খেলা ও শিশুর ছড়া" নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যালয়ে খেলার আধিক্য থাকিলেও সেখানে শৃঙ্খলা ও খেলাগুলির সাহায্যে চিন্তা ও ধারণাশক্তির বিকাশ ঘটানোর সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকায় শিশুর ব্যক্তিত্বের স্ফূরণসহায়ক ছিল। তাহা ছাড়া প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, শিশুদের পরস্পরের সহযোগিতা ও

নিজেদের কাজ নিজেরা করার শিক্ষা লাভের সুযোগ ও কল্পনামূলক গল্প প্রভৃতির সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা বিদ্যালয়কে একাধারে আনন্দময় ও শিক্ষাপ্রদ করিয়াছিল। কড়া শাসন ও কটু বাক্য ব্যতিরেকেই ঐ বিদ্যালয়ে সুন্দর শিক্ষা ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হওয়ায় শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও স্বতঃশৃঙ্খলাবোধের স্ফুরণ সহজ হইত।

ফ্রয়েবলকে নিঃসন্দেহেই ছোট শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কারের পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায়। শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহার অবদান চির উজ্জ্বল থাকিবে।

মেরিয়া মণ্টেসরী (Maria Mantessari) (১৮৭০—১৯৫২)

আমরা পূর্বে যে সমস্ত শিক্ষাবিদের কথা আলোচনা করিয়াছি তাঁহারা অধিকাংশই দার্শনিক। এখানে আমরা একজন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ শিক্ষাবিদের বিষয় আলোচনা করিব। আর একদিক হইতেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে। পূর্বে আলোচিত শিক্ষাবিদগণ সকলেই পুরুষ—ইনিই প্রথম প্রথিতযশা মহিলা শিক্ষাবিদ। সম্ভবতঃ এই উভয় বৈশিষ্ট্যই যুগ পরিবর্তন সূচিত করে। বর্তমানে শিক্ষা অধিকতর বাস্তবমুখী হইয়াছে ও তাহার সার্থকতার জন্য শারীরবিদ্যা ও ব্যবহারিক মনোবিদ্যার প্রয়োগ বাড়িয়াছে। অপর পক্ষে মহিলাগণকেই বর্তমানে শিশুশিক্ষকের ভূমিকায় অধিকতর উপযোগী মনে করা হয়। মণ্টেসরীর মধ্যে যুগের এই উভয় দাবীই স্বীকৃত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—

মেরিয়া মণ্টেসরী ইটালীদেশের আনকোরার নিকটবর্তী চিরাভেলীতে ১৮৭০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন ও রোম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

১৮৯৪ খ্রীঃ প্রথম মহিলা চিকিৎসাবিদ হিসাবে এম. ডি উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসা ব্যবসা অপেক্ষা শিক্ষার পথই পছন্দ করেন এবং ১৯০০ হইতে ১৯০৭—এই সাত বৎসর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ঐ বিদ্যালয়ে নৃতাত্ত্বিক শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসালয়ের সহকারী হিসাবে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার পর তাঁহাকে ত্রুটীযুক্ত শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিশেষ অধিকর্তার পদ দেওয়া হয়। এই সময়ে **এডোয়ার্ড সেগুইন** নামক একজন ফরাসী চিকিৎসাবিদ বিকলাঙ্গ পশ্চাতপদ শিশুদের সুস্থতা সাধন পদ্ধতি বিষয়ে সুইজারল্যাণ্ডে ও পরে আমেরিকায় সুনাম করিয়াছিলেন ও তিনি তাঁহার শরীর বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকপাঠে ডাক্তার মণ্টেসরী উদ্বুদ্ধ হন ও তাঁহার পদ্ধতির প্রয়োগ ও উন্নতিসাধন করিতে থাকেন। সাধারণতঃ এই সব শিশুদের ইন্দ্রিয়সমূহ অবিকশিত থাকে তাই তিনি সেগুইনের পদ্ধতির মধ্যে ইন্দ্রিয় নিচয়ের যে বিকাশ ব্যবস্থা ছিল তাহারই উন্নতিসাধন করিতে থাকিলেন ও আশাতীত ফল পাইলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি "ভাল বাসগৃহ ব্যবস্থাপক রোমীয় সংস্থার" আহ্বানে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিশুগৃহের ভারগ্রহণ করেন। বস্তিবাসীদের জন্য নূতন গৃহের ব্যবস্থা করাই ঐ সংস্থার কাজ ছিল। বস্তিবাসীরা কাজে গেলে তাহাদের অরক্ষিত শিশুরা নবনির্মিত গৃহসমূহ নষ্ট করিত বলিয়াই বস্তি অঞ্চলে এইরূপে শিশুগৃহে শিশুদিগকে আনিয়া রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। মণ্টেসরী ত্রুটিযুক্ত শিশুদের জন্য উদ্ভাবিত ইন্দ্রিয় শিক্ষার পদ্ধতি সমূহ এই সাধারণ শিশুদের উপর প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইলেন ও অন্যান্য কিছু নূতন পদ্ধতিও

আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার পদ্ধতি বিষয়ে তিনি পুস্তক প্রকাশ করিলেন ও তাহা সমাদর লাভ করিল। অনেক শিশু-বিদ্যালয়ে তাঁহার পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থাকিল ও তিনি সেইগুলির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, ও তাঁহার "শিশুগৃহে" শিশুকে গণতন্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হইত এই অজুহাতে ১৯৩৫ খ্রীঃ নাজী জার্মানীতে ও ১৯৩৬ খ্রীঃ ইটালীতে তাঁহার "শিশুগৃহ" সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ও মহাযুদ্ধের সময় তাঁহাকে নির্বাসিত হইতে হয়।

তাঁহার "শিশু-গৃহ" পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

ইহার পরিবেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, আনন্দদায়ক হইবে ও ছোটদের উপযোগী ছোট ছোট চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ থাকিবে। শিশুরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করিতে শিখিবে ও তাহাদের গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং নিজেরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিখিবে।

শিশুগৃহের পরিচালিকা কিছু ব্যবহারিক মনোবিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্না ও মণ্টেসরী পদ্ধতিতে জ্ঞানসম্পন্না ও শিশুদের সাধারণ রোগ সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্না হইবেন। তাহাকে বলা হয় ডিরেকট্রেস।

বিদ্যালয়ের শিক্ষোপকরণ দুইশ্রেণীর—ইন্দ্রিয়নিচয়ের শিক্ষার জন্য উপকরণ সমূহ ও ডাইডাকটিক এপারেটাস নামক পরিকল্পিত খেলনাসমূহ। প্রথম ধরণের খেলনা উপকরণ সাহায্যে শিশুদের রং চেনা, স্পর্শশক্তির ও স্মরণশক্তির বিকাশ ব্যবস্থা করা হয়। চোখ বাঁধিয়া দিয়া শব্দ শুনিয়া দ্রব্য চেনা, স্পর্শশক্তির দ্বারা দ্রব্য চেনা, নানারকমের রঙ হইতে বিশেষ রঙের দ্রব্য বাছিয়া বাহির

ইন্দ্রিয়ের বিকাশ-সহায়ক খেলনা

করা প্রভৃতি এই ধরণের খেলনা আসবাব। দ্বিতীয় ধরণের খেলনার সাহায্যে শিশুরা আকার, আকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারে ও তাহাদের স্নায়ু-মাংসপেশীর-সংযোগ বিকশিত হয়। যেমন, কতকগুলি বিশেষ আকার আকৃতির খাঁজে অনুরূপ তলযুক্ত দণ্ড প্রবেশ করানো ও ঐভাবে একটি বিশেষ খেলনার অংশ জোড়া দেওয়া, অনেক আকারের ঘুঁটি বা ছক হইতে আকার অনুসারে এক রকমের ঘুঁটি বা ছক পৃথক করা, অনেক খণ্ড জোড়া লাগাইয়া একটি চিত্র বা জ্যামিতিক ছক পুরা করিয়া তোলা ইত্যাদি। ৪ বছর বয়সে শিশু-

অক্ষর ও শব্দ চেনা

দিগকে অক্ষর চিনিতে ও লিখিতে দেখানো হয়। এইজন্য তাহারা কাগজে বা পিচবোর্ডে কাটা সাদৃশ অক্ষর বাছে ও সাজায়। আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিয়া চেনার সুবিধার জন্য সিরিষ কাগজ দিয়া কাটা অক্ষর থাকে। তাহার পর বহিরাকৃতি অনুসারে অক্ষর লিখিতে দেওয়া হয়।

অক্ষর চিনিবার পর অক্ষর গ্রথিত করিয়া উদ্ভূত শব্দ (নাম প্রভৃতি) পড়িতে দেওয়া হয়। পড়িবার সময় **উচ্চারণের উপর জোর দেওয়া হয়।**

গল্প বলা

বাস্তবধর্মী গল্পবলা, তাহার চিত্র দেখানো ও গল্প বলিতে শেখানো হয়।

শব্দগুলি পড়িতে শিখিলে ছোট ছোট বাক্য পড়িতে শেখানো হয়। বানান শেখার উপর প্রথমে গুরুত্ব কম দিয়া পরে গুরুত্ব

সংখ্যা সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা

দেওয়া হয়। ঐরূপ ১ সংখ্যার প্রতীক দণ্ড হইতে সুরু করিয়া ১০ সংখ্যার প্রতীক দণ্ড সাহায্যে শিশুরা ১ হইতে ১০ পর্যন্ত গণনা করিতে এবং যোগ ও বিয়োগ করিতে শেখে। ইহাতে সংখ্যা সম্বন্ধে তাহারা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ

করে। ইহার অধিক সংখ্যা শেখার জন্য প্রচলিত ছবি, ছড়া প্রভৃতি ব্যবহার হয়।

মন্টেসরী অলীক কল্পনাশ্রয়ী গল্প শিশুদিগকে বলার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে ইহাতে শিশুর মন সংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহার "শিশুগৃহে" শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সমালোচনা :—

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিকায় মন্টেসরীর শিশুগৃহ পদ্ধতি শিশুপালনের ক্ষেত্রে একটি মহৎ অবদান সন্দেহ নাই। শিল্প বিপ্লবের যুগে সাধারণ শ্রমিকেরা শিশুকে অরক্ষিত রাখিয়া পিতামাতা উভয়েই কর্মের অহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হন। সেই সময় শিশুরা কোন শিশুপালন অভিজ্ঞতাসম্পন্না মহিলার তত্বাবধানে থাকিলে তাহাদের শৈশব জীবন সুখের ও শিক্ষার হইবে তাই ডিরেক্‌ট্রেসের পরিচালনাধীন বিদ্যালয় রাখার ব্যবস্থা সঙ্গত হইয়াছে। তাঁহার "শিশুগৃহে" যে ইন্দ্রিয়সমূহের শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহার পশ্চাতে শিক্ষণের স্থান বদল (Transference of training) এর ধারণা আছে বলিয়া অর্থাৎ একদিকের নিপুণতা অন্যদিকে কার্যকরী হয় এই ধারণা আছে বলিয়া শিক্ষাবিদগণ মনে করেন। বর্তমানে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানীগণ এইরূপ স্থান বদল সম্ভব বলিয়া মনে করেন না ; তাই অনেকে স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু ইহা শিশুর আনন্দদায়ক খেলা ও অনেক শিশুরই কিছু কিছু ইন্দ্রিয়জনিত দুর্বলতা থাকে এইদিক বিবেচনা করিলে তাহাদের এই সমালোচনা টেঁকে না। তাঁহার Didactic apparatusগুলি সুপরিকল্পিত এবং শিল্প প্রাধান্যযুক্ত বর্তমান সমাজ পরিবেশের

শিশুদের উপযুক্ত খেলনা। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে খেলনাগুলি শিশুদের স্বতঃস্ফূর্তি ও কল্পনাবিকাশে সহায়ক নহে। মন্টেসরীর শিশুগৃহে শিশুরা সময় অনুসারে খেলা করে, ইচ্ছামত খেলা করিতে পারে না। এই বিষয়ে কিণ্ডারগার্টেন এর শিশুদের স্বাধীনতা অধিক। শিশুগৃহে শিশুরা পৃথক পৃথক ভাবে খেলা করে। কিণ্ডারগার্টেনে তাহাদের সংঘবদ্ধ খেলার ব্যবস্থা অধিক থাকায় সেখানে সমাজ চেতনার বিকাশ অধিক। মন্টেসরী কল্পনাশ্রয়ী গল্পাদি হইতে শিশু-দিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের শৈশবের একটি মহৎ আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু অবাধ অলীক কল্পনা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী মন্টেসরীর বিরূপতা একেবারে ভিত্তিহীন নহে। মন্টেসরী বিদ্যালয়ে যে নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা আছে তাহা শিশুদের পক্ষে অধিক কঠোর বলিয়া অনেকে মনে করেন কিন্তু বর্তমানে এইরূপ শিশুগৃহ অধিক সংখ্যায় চালু হইবে মনে করিলে শৃঙ্খলা সমস্যার প্রতি কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া অসঙ্গত বিবেচিত হয় না। ফ্রয়েবল শিশুদের খেলনা পরিকল্পনায় কষ্টকল্পিত দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, যদিও স্বাভাবিক শিশুপ্রীতি প্রেরণায় খেলনাগুলিকে শিশুদের পক্ষে আনন্দদায়ক করিয়াছিলেন। ডাঃ মন্টেসরী তৎপরিবর্তে শিশুর মনোবিজ্ঞান সম্মত ও বাস্তব ধারণা উদ্দীপক খেলনা উদ্ভাবনের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়া ঐ দিকে নূতন দিশারী বা প্রদর্শক হইয়াছেন। সব দিক বিবেচনা করিলে শিশু শিক্ষার অগ্রগতিতে ডাঃ মন্টেসরীর অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক শিক্ষাবিদ—ডিউই, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী :—

জন ডিউই (John Dewy) (১৮৫৯-১৯৫২)

সংক্ষিপ্ত জীবনী :—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভারমাউন্ট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পিউরিট্যান সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন ও দোকানের মালিক ছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে বাইবেল পাঠের ক্ষমতার অধিক শিক্ষা প্রচলিত ছিল না। তিনি ভারমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্নাতক উপাধিলাভ করেন ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাল্টিমোর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি লাভ করেন। তৎপরে প্রথমে মিনেসোটা পরে মিচিগ্যান ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। তখন পশ্চিমাঞ্চলের ঐ অঞ্চলসমূহে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং তিনি ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও জীবনসমস্যা-সমূহের সহিত গভীর পরিচয়লাভের সুযোগ পাইতেছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনদর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও তাঁহার শিক্ষামতকে রূপদানে সহায়তা প্রদান করিয়াছিল। শিকাগোতে তিনি দর্শনের অধ্যাপনা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের পরিচালক ছিলেন। এইখানে তিনি চার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের শিশুদের উপর তাঁহার শিক্ষা-চিন্তার প্রয়োগ ঘটাইবার সুযোগ পান। তাঁহার শ্রেণীগুলিতে ১০ জনের অধিক ছাত্র থাকিত না এবং তিনি তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরাপুরি স্বাধীনতা দিয়া প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির স্থানে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা করেন। তাঁহার জীবন-

কেন্দ্রী "সমস্যা সমাধান ভিত্তিক" শিক্ষাপদ্ধতি এইভাবে জন্মলাভ করে ও তাঁহাকে শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশ্বে সুপরিচিত করিয়া তোলে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানে আহূত হন ও পরে দুই বৎসরের জন্য পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তী যুগে তিনি তুরস্ক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের জন্য ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুইটি শিক্ষক সংস্থা সংগঠিত করেন ও শিক্ষকগণের শিক্ষাদান ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদানের সপক্ষে অভিমত সংগঠিত করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত বয়সে তিনি মেক্সিকো দেশে আশ্রয়গ্রহণকারী লিও ট্রটস্কির বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকারের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে তিনি তাঁহার জন্মভূমি নিউ ইংল্যাণ্ডে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন ও ৯৩ বৎসর বয়সে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ঐ একই বৎসরে পৃথিবী আর একজন শিক্ষাবিদ ম্যাডাম মণ্টেসরীকে হারায়। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ, সঙ্গতিপূর্ণ ও শেষ জীবনেও তাঁহার চরিত্রের ঋজুতা অটুট ছিল।

দার্শনিক মতবাদ :—

জন ডিউই একাধারে শিক্ষাব্রতী ও দার্শনিক ছিলেন ও উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁহার অবদান অতি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক অবদানও উপেক্ষণীয় নহে এবং দ্বিতীয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করিলে তাঁহার শিক্ষাচিন্তা পরিপূর্ণ ভাবে বুঝা যাইবে না। প্রথম জীবনে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সেই তিনি দার্শনিক হিসাবে কিছুটা খ্যাতি লাভ করেন। বাল্যজীবনে তিনি পিউরিট্যান পিতার প্রভাবে মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডারউইনের

ক্রমবিবর্তনবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং বাইবেল কথিত সৃষ্টি-তত্ত্বের অসামঞ্জস্যতা তাঁহার চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহার মীমাংসার জন্য তিনি জীববিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র উভয় বিষয়ে আগ্রহী হইয়া উঠেন। বাল্টিমোরের জন হপ্কিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দার্শনিক চার্লস পিয়ার্স ও মনস্তত্ত্ববিদ্ ষ্ট্যানলী হলের সংস্পর্শে আসেন। ইঁহাদের প্রভাবে তিনি ষ্ট্যানলী হলের সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পিয়ার্সের প্রাগম্যাটিজম দ্বারা প্রভাবিত হন। পরে তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদ দ্বারাও কিছুটা প্রভাবিত হন কিন্তু পরবর্তী যুগে বিশেষভাবে প্রাগ্ম্যাটিজমকেই তাঁহার দার্শনিক মতবাদরূপে গ্রহণ করেন ও এক্সপেরিমেণ্টালিজম নামক প্রাগ্ম্যাটিজমের একটি নূতন শাখার জন্মদান করেন। এই দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে তাঁহার "গতিশীল শিক্ষা" চিন্তার সঙ্গতি রহিয়াছে।

ভাববাদী দর্শনসমূহ জাগতিক ঘটনাসমূহের পশ্চাতে অপরিবর্তনীয় সত্য ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অন্বেষণ করে। হেগেলের পূর্ববর্তী ভাববাদীগণ উপরোক্ত ধরণের সত্য ও উদ্দেশ্যকেই বিশ্বের যথার্থ হেতু মনে করিতেন—জাগতিক ঘটনাসমূহকে ইহারই প্রতিফলিত ছায়ামাত্র বলিয়া গণ্য করিতেন। হেগেল তাঁহার দর্শনে বাস্তব জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই বাস্তব জগতের অস্তিত্ব ও পরিণতি প্রধানতঃ মূলীভূত চিৎশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন—কেবল দ্বিতীয়টিও ক্রমান্বয়ে প্রথমটির উপর প্রভাব সৃষ্টি করিয়া পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে কিছুটা অংশ গ্রহণ করিতেছে—এই-রূপ মনে করিতেন। হেগেলের দর্শন পরবর্তী ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন ধারার জন্ম দিয়াছে। একটি হইতেছে মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শনে বস্তুজগতকেই সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে ধরিয়া বস্তুর গুণগত পরিবর্তন দ্বারা ভাব জগতের উৎপত্তি স্বীকার

করা হইয়াছে ও বস্তুজগৎ ভাবজগতের ঘাত প্রতিঘাতে জগতের পরিবর্তন সমূহ ঘটিয়া চলিয়াছে—এইভাবে জাগতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতেও বিশ্বসত্যের অপরিবর্তনীয়তার পরিবর্তে গতিশীলতা স্বীকৃত হইয়াছে। অপর পক্ষে অন্য আকারে জেমস বিশ্ব সত্যের স্থিতিশীল অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রাগম্যাটিজম দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়াছেন। এই দর্শন বিশ্বের ঘটনাবলীর পশ্চাতে কোনও শাশ্বতঃ সত্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান নিরর্থক বলিয়া মনে করে ও উহার আরোপকে ভাবালুতা বলিয়া মনে করে। সত্য মাত্রেই যুগসত্য। প্রয়োগ দ্বারাই তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বের ধর্ম—সুতরাং সত্য মাত্রেই পরিবর্তনশীল।

প্রয়োগবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য

চরম আদর্শ বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব নহে, দোষগুণ লইয়াই জগৎ। যুগের বাস্তব সত্য জানিয়া বুঝিয়া তাহার সহিত জীবনের সুর বাঁধিতে হইবে। যেহেতু যুগ সত্য পরিবর্তিত হইবে সেই হেতু জীবনকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করিতে হইবে। মার্কসীয় দর্শনে যেমন অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম প্রদর্শন করিয়া তাহার সাহায্যে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা সম্ভব করার উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে প্রাগম্যাটিজমে তাহা হয় নাই। ডিউইর ইনষ্ট্রুমেন্টালিজম জেমসের দর্শনেরই প্রকারভেদ মাত্র। তিনি দর্শনকে জীবনের পটভূমি বিচারের যন্ত্র হিসাবেই দেখিয়াছেন। যে দর্শন শুধু জগতের প্রকৃতজ্ঞান আহরণ করিতে ব্যস্ত তাহা অসম্পূর্ণ দর্শন। প্রয়োগসিদ্ধ দর্শনই পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও প্রয়োগের দ্বারা জীবনে সিদ্ধিলাভ দ্বারাই ঐ দর্শনের সার্থকতা বিচারিত হইবে, ইহাই তাঁহার প্রয়োগ ধর্মী দর্শনের মূলকথা। যেহেতু মানুষ একা বাঁচিতে পারে না এবং এক ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত অপরাপর ব্যক্তির

ইচ্ছা অনিচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন ব্যতীত ব্যক্তির পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে সেইজন্য সকলের সুবিধার জন্য গণতন্ত্রকে অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। জীবনের পটভূমি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। তাই জীবনকে সার্থক করিতে হইলে ঐ পরিবর্তনশীল পটভূমিকাকে অনুধাবন করিতে হইবে ও তদনুসারে জীবনকে সার্থকভাবে খাপ খাওয়াইতে হইবে। যে দর্শন এই ব্যবস্থার পূর্ণ সহায়তা প্রদান করিবে তাহাই সার্থক দর্শন। এই দর্শনে জগতের পরিবর্তনশীলতার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত মার্কসীয় দর্শনের মিল থাকিলেও মার্কস তাঁহার "নেগেশন অফ নেগেশন" ও "পরিমাণগত পরিবর্তন হইতে গুণগত পরিবর্তন" সাহায্যে যেমন সংঘাতজনিত কারণ দ্বারা জাগতিক পরিবর্তনের ধারা উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন জেমস বা ডিউই তাহা করেন নাই। তাই মার্কসীয় দর্শনে পশ্চাদ্‌গামিতা ও প্রগতিশীলতার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আছে। প্রাগ্‌ম্যাটিজমে তাহা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উভয় দর্শনেই জাগতিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণে দর্শনের প্রয়োগকে উহার অন্যতম সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উভয় দর্শনের মূলগত পরিবেশ এই সাদৃশ্য ও পার্থক্য সূচিত করে। জার্মানীর সমস্যা প্রপীড়িতাবস্থা কিন্তু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি—দ্বন্দ্ব ও প্রগতির দর্শন মার্কসবাদের উপযোগী পীঠভূমি ছিল। অপর পক্ষে বিকাশশীল ও অপেক্ষাকৃত দ্বন্দ্বহীন এবং জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগ সংযুক্ত তৎকালীন আমেরিকা দ্বিতীয়োক্ত দর্শনের উপযোগী ক্ষেত্র ছিল সন্দেহ নাই। উভয় দর্শনই জীবনকে বলিষ্ঠ ও উদ্যমশীল করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই প্রাধান্য পাইয়াছে ও দুই পরস্পর বিরোধী

উভয় দর্শনের উপর পরিবেশের প্রভাব

রাজনৈতিক শিবিরের "যুদ্ধের চীৎকারে" পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ডিউই এর শিক্ষামত :—

ডিউইর জীবন বেশ দীর্ঘ এবং তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক অভিজ্ঞতার কাল তাই বেশ দীর্ঘ; কারণ তিনি প্রথম যৌবন হইতেই শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে দার্শনিক চিন্তা ও শিক্ষাসংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা—এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে সমানভাবে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। কাজেই একটি অপরটিতে ছায়াপাত করিয়াছে। ইহার সাথে সাথে তৎকালীন আমেরিকার সম্প্রসারণশীল ও সৃজনধর্মী সমাজ এই উভয়ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ডিউই তাঁহার দার্শনিক চিন্তা-সমূহ যেমন পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন তেমনি তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে সেইগুলির ধারাবাহিক আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য তাঁহার সুলিখিত পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে যথা—Democracy in Education, Education today, Experience and Education, My Pedagogic creed.

শিক্ষার সংজ্ঞা :—

ডিউই শিক্ষাকে জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার কাছে জীবন ও শিক্ষা সমার্থক ছিল। যেহেতু জীবন গতিশীল, আজকের জীবন ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করিতেছে সুতরাং আজকের জীবন সার্থকভাবে যাপিত হইলে তাহা ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থকতা সাধনে সহায়ক হইবে। যে শিক্ষা

আজকের জীবনকে অধিকতর সার্থকতা প্রদান করিবে তাহা পরবর্তী জীবনের সার্থকতার ভিত রচনা করিবে। সুতরাং শিক্ষার সার্থকতা বিচারের জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকাইয়া থাকার যুক্তি নাই। আজকের জীবনের সার্থকতা সাধনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই হইবে। জীবন অর্থে নানা ছোট বড় সমস্যা, ঐগুলির সার্থক সমাধান দ্বারা জীবন সার্থক হয়। আর ঐগুলির সার্থক সমাধানই ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থক সমাধানের ক্ষমতা প্রদান করে। এইজন্য শিক্ষার ধরণ হইবে বর্তমান জীবনের বাস্তব সমস্যার সুষ্ঠু ও সচেতন সমাধান।

শিক্ষা ও জীবন সমার্থক

শিক্ষা ও গণতন্ত্র :—

যেহেতু মানুষ একা বাঁচিতে পারে না সুতরাং সমাজকে স্বীকার করিতেই হইবে। সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে হইলে যাহাতে একের ইচ্ছা অনিচ্ছা অপরের স্বাধীনতার পরিপন্থী না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ সমাজ গণতান্ত্রিক না হইলে সকলের স্বাধীন সত্তা কখনও সম্ভব নয়। তাই গণতান্ত্রিক আদর্শকে মানিতেই হইবে। কিন্তু শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আবহাওয়া আনিতে না পারিলে শুধু ভোটাধিকার ও আইন দ্বারা প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ সম্ভব নহে। তাই বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শিশুকে শৈশব হইতেই গণতান্ত্রিক ভাবধারায় ও আচরণে অভ্যস্ত করিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম দোষ, ইহাতে শিক্ষার্থী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলিতে শিক্ষা পায়, গণতন্ত্রের শিক্ষা পায় না। যখন শিশুরা জীবনের বাস্তব

শিক্ষা ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রয়োগ

সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ও নিজেদের যৌথ সমাজ জীবন ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধম্যে শিক্ষালাভ করে তখন শিক্ষা হয় জীবনাশ্রয়ী ও গণতান্ত্রিক।

ডিউইএর মতবাদের প্রয়োগ :—

তাঁহার ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে ডিউই বিদ্যালয় নামে বিশ্বপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁহার শিক্ষাদর্শের হাতে-নাতে প্রয়োগ ঘটাইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে শিশুরা নানা কর্মসমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে। তাহারা সক্রিয়ভাবে শিক্ষালাভ করে এবং গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের শিক্ষালাভ করে। এই বিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা অপেক্ষা সহযোগিতা ও সমষ্টি কল্যাণই প্রাধান্য পায় এবং বিভিন্ন বিষয়ের পৃথক পৃথক জ্ঞানলাভের পরিবর্তে শিশুরা **বাস্তব জীবনসমস্যার সমাধান প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত সামগ্রীক জ্ঞানলাভ করে।** শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে আলোচনা-চক্র, যৌথ সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (workshop method) প্রভৃতি গণতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতিসমূহ এখানকার অভিজ্ঞতা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। ডিউই এর মতে শিক্ষাকে "কেজো" শিক্ষা ও সত্যানু-সন্ধানের জন্য শিক্ষা এই দুই কৃত্রিম ভাগে বিভক্ত করা ভুল। জীবনের প্রয়োজন ও প্রয়োগশীলতাই শিক্ষার প্রধান প্রেরণাস্থল হওয়া বিধেয়। ইহাকে তাঁহার ইনষ্ট্রুমেণ্টালিজম দর্শনের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ বলা চলে।

গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি-সমূহের উদ্ভব

ডিউই এর শিক্ষামত বিষয়ে সমালোচনা (রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের সহিত তুলনা) :—

ডিউইএর শিক্ষামত তাঁহার দার্শনিক সত্যের সহিত ওতপ্রোত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষামত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ উভয় পক্ষেরই সমালোচনার স্থল হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার ইনষ্ট্রুমেন্টালিজম দার্শনিক মতবাদই সর্বাপেক্ষা বেশী সমালোচিত হইয়াছে। বাস্তববাদীরা (Realists) মনে করেন জগৎব্যাপার একটি সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়মে আবদ্ধ। এই জগৎবিধি জানাই তাঁহাদের কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য— প্রয়োগশীলতা তাই শিক্ষার গৌণ ব্যাপার মাত্র। কিন্তু ডিউইর দার্শনিক মতবাদে জগৎপরিণতির এইরূপ অবশ্যম্ভাবিতা মানিয়া লয় না এবং সেইজন্য তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগসিদ্ধি অত্যন্ত উচ্চ মূল্য লাভ করিয়াছে। অপরপক্ষে ভাববাদীরা ধ্রুব সত্যে বিশ্বাসী—কার্যকারী হইল বলিয়াই যে কোনও চিন্তা সত্য এই বিচার তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা নীতি ও ধর্মকে অবশ্য পালনীয় মনে করেন। ইহার ফল অনেক সময়ই মনঃপুত না হইতে পারে, তবু কার্য হিসাবে তাহা সম্পাদনীয় হইবে। এইজন্য ইঁহারা অবশ্যশিক্ষনীয় বিষয়সমূহে গুরুত্ব দেন এবং ডিউইএর কেজো শিক্ষাকে নিতান্ত দোকানদারী পেশাদারী শিক্ষা বলিয়া ছোট করেন। তাঁহাদের মতে সাফল্যকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিলে লোভ ও ঈর্ষা প্রবল হইয়া উঠিবে এবং যতই না কেন গণতান্ত্রিক কাঠামোতে শিক্ষাকে আবদ্ধ করা হউক— ক্রমে প্রতিযোগিতার শক্তিই প্রবল হইয়া উঠিবে। কারণ ঐহিক সাফল্যকেই এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে।

শিক্ষাকে জীবনের প্রয়োজন ও প্রয়োগশীলতার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখাকে উচ্চতর শিক্ষার বিকাশ পরিপন্থী বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। কারণ জীবনের আশু প্রয়োজন সিদ্ধি অপেক্ষা

জ্ঞান লাভের আনন্দে জানার প্রেরণাই উচ্চতর জীবনের ক্ষেত্রে মানুষকে অধিকতর প্রেরণা জোগায়। জীবনের প্রয়োজন বুঝিলে তবে জানিব এইভাবে শিক্ষার প্রেরণাকে স্থূল করিবার ফলে উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণের ক্ষুধাকে খর্ব করা হইবে বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। শিক্ষাকে শিশুদের কাছে তাহাদের বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার ও আনন্দ লাভের উৎস এইরূপে সর্বদাই উপস্থাপিত করিলে তাহারা গভীর বিষয় সমূহে জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজনীয় একাগ্রতা ও মানসিক চর্যার অভ্যাস গঠন করিতে প্রবুদ্ধ হইবে না। এইজন্য ইহাকে Soft pedagogy বা "গায়ে হাত বুলানো শিক্ষাব্যবস্থা" বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন।

ডিউই এর শিক্ষামত বিষয়ে এইরূপ বিরোধী সমালোচনা হইলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাকে তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ দিয়াছেন। ইতিপূর্বে যদিও শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা স্থান লাভ করিয়াছিল কিন্তু ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় নাই। গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত ডিউইর শিক্ষাদর্শের অনেক মিল আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে।

গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের সহিত পার্থক্য

দার্শনিক বিশ্বাসে গান্ধীজী অনেকখানি ভাববাদী —যদিও তাঁহার দার্শনিক মত খুব বেশী যুক্তি-তর্কের সাহায্যে কোথাও ব্যাখ্যা করেন নাই—ধর্মীয় বিশ্বাস রূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। অপরদিকে গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষাদর্শকে শুধুমাত্র গণতন্ত্রের কাঠামোতে আবদ্ধ না রাখিয়া তাঁহার সমাজবিপ্লবআদর্শের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার ঐ বিপ্লবী সমাজচিন্তার মধ্যে "ইউটোপিয়" সমাজতন্ত্রের সঙ্গতি পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা যন্ত্রশিল্পের বিরোধী

এবং ব্যক্তিগত সততার ভিত্তির উপর আস্থাশীল। এইজন্য আধুনিক যুগের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা সমূহের সহিত তাহার মূলগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বাদ দিলে ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রণে সমাজের কল্যাণচেতনার যে গুরুত্ব গান্ধীজী দিয়াছেন তাহা ডিউইর গণতান্ত্রিকতাকেও বেশ ছাড়াইয়া যায় ও আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত তাহার সঙ্গতি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ডিউই এর শিক্ষাচিন্তা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যেও দার্শনিক মতাদর্শের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদে প্রচীন ভারতের উপনিষদের সর্বব্রহ্মবাদ ও "বার্গসঁ"র সৃজনশীল অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব দেখা যায়—পরন্ত প্রাগম্যাটিজম ও ইনষ্ট্রুমেণ্টালিজম ভাববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ সৃজন ধর্মী কাজকর্মে যেরূপ গুরুত্ব দিয়াছেন ডিউইর শিক্ষা চিন্তায় তাহার পুরাপুরি সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে পার্থক্য

গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ :—

গান্ধীজীর নানা ঘাত-সংঘাত ও কর্মময় জীবনের সহিত ভারতবাসী হিসাবে আমরা এত পরিচিত যে এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। মাত্র তাঁহার শিক্ষাদর্শের কথা আলোচনা করিলেই চলিবে। শুধু এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে গান্ধীজী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ও বিশ্বসভ্যতায় ভারত একটি নূতন সুর সংযোজন করিয়া সার্থক হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেই সুরটি হইতেছে ত্যাগ, ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও সার্বিক কল্যাণবোধ।

গান্ধীজী শিক্ষাব্রতী হিসাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন আফ্রিকায় তাঁহার স্থাপিত টলষ্টয় ফার্মে। ভারতবাসীর প্রতি আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তিনি তথাকার ভারতবাসীদিগকে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ফলে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। তিনি ঐ সব শিশুদিগকে নানা কাজ করিতে নিযুক্ত করিতেন ও তাহারা সানন্দে ঐ সব কাজ করিত। তিনি ঐ সব শিশুদের সহিত নানা কাজ করিতেন ও প্রাসঙ্গিক কথাবার্তার মধ্যে তাহাদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। পরে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি বিভিন্ন আশ্রম স্থাপন করেন ও সেখানেও তাঁহার পক্ষে এই ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের রূপায়ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানে তাঁহার উপদেশ চাওয়া হয়। সমস্যাটি মূলতঃ অর্থনৈতিক। প্রাদেশিক সরকারের আয় সীমাবদ্ধ ও পুলিশব্যবস্থার জন্য ব্যয় সংকোচের অধিকার তাহার নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এই দুইটি কার্যক্রম একত্রে হওয়া সম্ভব নহে কারণ প্রথমটি আয় সংকুচিত করিবে দ্বিতীয়টি ব্যয় বৃদ্ধি করিবে। এক্ষেত্রে সরকার উহার প্রথম কার্যক্রমটি সাময়িকভাবে ত্যাগ করা যায় কিনা তদ্বিষয়ে তাঁহার উপদেশ চাহিলে তিনি বলিলেন জনসাধারণ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিলে তবেই তাহার আয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হইবে—এইরূপ চিন্তা অসহ্য। ইহার প্রতিকার স্বরূপ তিনি কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা প্রবর্তনের উপদেশ দিলেন। ঐরূপ কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার বাহন হইবে সমাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন হয় এইরূপ

গান্ধীজীর শিক্ষা অভিজ্ঞতা

শিল্পকর্ম ও ঐ উৎপাদনের দ্বারা লব্ধ অর্থ দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হইবে বলিয়া তিনি আস্থা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই অভিমত বিমিশ্র সম্বর্দ্ধনা পাইল। কেহ তীব্র বিরোধিতা করিল, কেহ ইহাকে প্রগতিশীল শিক্ষাচিন্তা বলিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইল।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূলকথা

তিনি বিশ্বাসী শিক্ষাব্রতীদের হাতে উহার পরিপূর্ণ পরিকল্পনা রচনার ভার দিলেন। তদনুযায়ী ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা রূপ পাইল। ইহাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইয়াছিল। (১) ভারতের সকল শিশুর জন্য ৭+হইতে ১৪ পর্যন্ত অবৈতনিক এই শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হইবে। (২) সমাজ-প্রয়োজন সিদ্ধ করে এমন কোনও উৎ-পাদনাত্মক কাজ এই শিক্ষার মাধ্যম হইবে। (৩) ঐ উৎপাদনাত্মক শিল্পকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হইবে যেন বিদ্যালয়গুলির চলতি ব্যয় উৎপাদন হইতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা নির্বাহিত হয়। (৪) শিক্ষার বাহন হইবে মাতৃভাষা এবং হিন্দুস্তানী ভাষার জ্ঞান আবশ্যক হইবে। (৫) শিক্ষার বৌদ্ধিক মান এমন হইবে যেন শিক্ষার্থী নিজ প্রচেষ্টায় উচ্চতর জ্ঞান আহরণে সক্ষম হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থী বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হইবে। (৬) শিক্ষার্থী শিক্ষার মাধ্যম শিল্পে এতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে যেন সে ঐ কাজের দ্বারা উত্তর জীবনে স্বাবলম্বী হইতে পারে। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় গান্ধীজীর সমাজচিন্তা প্রচ্ছন্ন ছিল, তত প্রকট ছিল না। পরবর্তী যুগে তাঁহার অনুগামীগণ ইহাকে পরিপূর্ণভাবে গান্ধীবাদী ভাবাদর্শে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অপরপক্ষে অপরাপরগণ তাঁহার সহিত ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গতি আনিয়া ও উৎপাদনধর্মী কর্মের গুরুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে আধুনিক-যুগ-গ্রাহ্য রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বর্তমানে এই উভয় শিক্ষাধারাই বুনিয়াদী

শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হয়। আমরা গান্ধীজীর নিজস্ব শিক্ষাচিন্তা বিষয়েই এখন আলোচনা করিব—পরিবর্তিত রূপটি নহে।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার সমালোচনা

(১) সমাজের প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক কর্মকে শিক্ষার মাধ্যম করায় বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সম্প্রসারণের উপযোগিতা পাইয়াছে। উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় শিক্ষাকে নিয়মনিষ্ঠার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে—Soft pedagogy দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছে। কিন্তু বিকেন্দ্রীত সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী শিল্প কর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়া ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পকে "অচ্ছুত" ঘোষণা করিয়া ইহা যুগোপযোগী উৎপাদনশিল্প হইতে বিপরীত পথে সমাজকে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। (২) অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় শিক্ষার মানসিক বিকাশকে গৌণ করিবার ঝোঁক ইহাতে রহিয়াছে। (৩) শিশুর আবেগানুভূতি ও প্রক্ষোভ-মূলক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। (৪) শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রকে খর্ব করা হইয়াছে। শেষোক্ত সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ও সমাজকল্যাণ এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু সমাজকল্যাণকে উপেক্ষা করা কদাচই যায় না। তাই সমাজকল্যাণকর কাজের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—সুশিক্ষকের দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে।

অনেকে গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তার এই সমালোচনা করেন যে তিনি শিক্ষাকে উৎপাদনধর্মী শিল্পের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাকে একান্ত সংকীর্ণ করিয়াছেন—ইহার বৃহৎ ও ব্যাপক সংজ্ঞাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমালোচনায় গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাকে ঠিকমত বোঝা হয় নাই। শিল্পকাজ গুরুত্ব পাইলেও তাহার পশ্চাতে যে সমাজ-

দর্শন রহিয়াছে তাহাও কম গুরুত্ব পায় নাই। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষা নিছক শিল্পকেন্দ্রী নহে—ইহা সমাজকেন্দ্রীও। আর কাজ করিতে গেলে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং শিল্প, সমাজ ও প্রকৃতি এই তিনটিই সমানভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিতে রহিয়াছে। অপরপক্ষে অনেকগুলি শিশু যখন মিলিতভাবে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করিবে তখন স্বভাবতঃই তাহাদের আনুভূতিক ও প্রক্ষোভিক জীবনকে উপেক্ষা করা হইবে না—সুতরাং শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভিক বিকাশের দিকটিও বুনিয়াদী শিক্ষায় উপেক্ষিত হয় না। বরং ডিউইএর শিক্ষাচিন্তায় কর্ম সমস্যাকে মাত্র বিদ্যালয়ের ও শিশুদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা হয়—বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুকে সমগ্র মানবজাতির সামাজিক সমস্যা ও আদর্শসমূহের সংস্পর্শে আনা হয়—তাই এক্ষেত্রে শিক্ষার সংজ্ঞাকে আরও ব্যাপক করা হইয়াছে।

কিন্তু বিকেন্দ্রীত শিল্প ও সমাজ ব্যবস্থাকেই মানব সভ্যতার একমাত্র সংকটত্রাণ পন্থারূপে উপস্থাপিত করা এবং অর্থনৈতিক সমস্যাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে একদেশ-দর্শী ও যুগপ্রগতির বিরোধী ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে—এই সমালোচনায় সঙ্গতি আছে মনে হয়। বর্তমানযুগে যন্ত্রকে জোর করিয়া অস্বীকার করা সম্ভব মনে হয় না। তাহা ছাড়া শিশুকে একটি বিশেষ সমাধান চিন্তায় আবদ্ধ করা শিক্ষাকে প্রচারধর্মী করিয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সকল ক্ষেত্রেই তাহার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। এই যুগোত্তর প্রতিভার বিভিন্নমুখী জীবনের সংক্ষিপ্ততম পরিচয়ও এখানে প্রদান করিতে গেলে পুস্তকের কলেবর

অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে তাই সেই প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকাই ভাল। বিশেষতঃ আজ তিনি সকল যুগের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁহার জীবনপরিচিতি সকলেই অন্যভাবে পাইয়াছেন বা পাইতে পারেন। তাই তাঁহার শিক্ষাচিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই নিবদ্ধ থাকিব। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য যে ধর্মবিশ্বাসের আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন তাহা উপনিষদের যুগের ভাববাদী অধ্যাত্মবাদের আবহাওয়া। তাঁহার কাব্যকৃতি তাই শিব, সত্য, সুন্দর ও আনন্দের আস্বাদন ব্যাকুলতার কাব্যিক প্রকাশ। তাঁহার শিক্ষাচিন্তাতেও এই মহান আদর্শের প্রকাশ দেখি। অপরপক্ষে তিনি শৈশবে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে শিশুর প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণের যে স্মৃতি বহন করিতেন তাহার আলোকে তিনি তাঁহার শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রী করিয়া গড়িয়াছেন।

রবীন্দ্র জীবনদর্শন —তাঁহার শিক্ষা চিন্তার পটভূমি

তিনি তাঁহার পিতার সাধনক্ষেত্র বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার শিক্ষা-চিন্তাগুলিকে রূপায়িত করিতেছিলেন ও ঐ কাজ তাঁহাকে যে সব উপলব্ধি প্রদান করিয়াছিল তাহাই তাঁহার পুস্তকাদিতে ও প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাই তাঁহার শিক্ষাচিন্তা যেমন চিন্তা আকারে প্রকাশিত তেমনি তাহার কিয়দংশ বাস্তবে রূপায়িত দেখা যাইবে। অবশ্য চিন্তাকে সব সময় সঠিক রূপায়ণ সম্ভব নয়—তাই শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় শান্তিনিকেতনে পাই তদপেক্ষা অনেক বড় শিক্ষাবিদের পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবন্ধনিচয়। তাঁহার অতুলন প্রকাশব্যঞ্জনা ঐগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ করিয়াছে ও সম্ভবতঃ অনেক যুগের অনেক শিক্ষাবিদের চিন্তার খোরাক হইয়া সেইগুলি বিরাজ করিবে।

রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক ছিলেন। মিষ্টিক বা মরমীয়াবাদীরা মনে করেন ঈশ্বর কোনও মহান অনুপ্রেরণায় বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন ও বিশ্বপ্রকৃতির নানা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া মানুষকে নানা ইঙ্গিত ইশারায় তাঁহার সেই মহান অনুপ্রেরণা ও প্রেমের পথে টানিতেছেন। তাই বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনাসমূহ বিক্ষিপ্ত নহে—শিব, সত্য, সুন্দর ও আনন্দের রহস্য-বার্তার বাহক। "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর তুমি তাই এসেছ নিচে—আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে বিশ্বপ্রেম ও আনন্দঘন সুন্দরের ও সত্যের বার্তা অহরহ বিঘোষিত হইতেছে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহাকে আস্বাদন করার শক্তিকে বিকশিত করাই তাঁহার শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান উপেক্ষিত হইলে চলিবে না—সেইগুলি বাহিরের জীবন হইলেও বাস্তব জীবনের ভিত্তি। তথাপি সেইগুলির সমাধানই জীবনের সব কিছু নহে। এইখানেই ডিউইএর শিক্ষাচিন্তার সহিত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বপ্রকৃতি

প্রকৃতিকে তিনি শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষক মনে করিতেন—তাই তিনি প্রাচীন আর্যঋষিদের মতই প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গণে তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাছে প্রকৃতি রুশোর প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যময়। মানব প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি ও ভগবানের মধ্যে তিনি একই আনন্দলীলার প্রকাশ দেখিয়াছেন। "আনন্দধ্যেব খল্লিমানি ভুতানি জায়ন্তে"র উপলব্ধি সহজ হইবে—মানুষ তাহার ব্যক্তিসত্তাকে অনন্ত বিশ্বসত্তার সহিত একত্রে উপলব্ধি করিয়া তাহার মহৎ উত্তরাধিকারের পরিচয় পাইবে বলিয়া তিনি

বিশ্বপ্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন—শুধু প্রকৃতিকে জানার জন্য নহে।

শিক্ষার্থী শিক্ষকের ঘনিষ্ট সংযোগ

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কখনই শুধু তথ্য-তত্ত্বের জ্ঞান আহরণ বলিয়া মনে করিতেন না—মনন ও আত্মীকরণ দ্বারা অন্তর্চরিত্রের বিকাশকেই তিনি শিক্ষা বলিয়া বুঝিতেন। গুরু বা শিক্ষকের মুখে নানা জ্ঞানের কথা শুনিয়া অথবা নিছক পুস্তক পাঠ করিয়া তাই এই শিক্ষা আহরণ সম্ভব নহে। গুরু ও শিষ্য একত্র মিলিয়া জ্ঞানকে অনুভূতি সাহায্যে আত্মস্থ করিলে তবেই তাহা শিক্ষা হয়। এইজন্য গুরু-শিষ্যের নিকট সম্বন্ধ চাই। প্রজ্জ্বলনশীল দীপশিখা সাহায্যে যেমন অপর দীপ প্রদীপ্ত হয় তেমনি গুরুর জ্ঞানান্বেষী চিত্তের সংস্পর্শ শিষ্যের চিত্তকে প্রদীপ্ত করিবে—ইহাই তাঁহার শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে ধারণা। তাই গুরুশিষ্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও একের দ্বারা অপরের প্রভবনকে তিনি গুরুত্ব দিয়াছেন ও শিক্ষককে আচার্যের স্থলাভিসিক্ত করিয়াছেন।

শিক্ষার সঙ্গীত ও চিত্রকলার স্থান

আনন্দ হইতেই বিশ্ব জন্ম লাভ করিয়াছে ও বিকশিত হইয়াছে। সঙ্গীত, শিল্পকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সেই আনন্দেরই মানবিক প্রকাশ। তাই এই সব ললিতকলা—যেগুলি পূর্বে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এদেশে অনাদৃত হইত ও উচ্চমার্গের জ্ঞান হিসাবে গণ্য হইত না সেইগুলিকেই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চমূল্য দিয়াছেন। শিক্ষাকে তিনি শুধু তথ্য-তত্ত্বের জ্ঞান বলিয়া দেখিতেন না—ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও অনন্ত বিশ্বসত্তার সহিত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতিকেই তিনি শিক্ষা বলিয়া গণ্য করিতেন। এইরূপ শিক্ষায়

আনুভূতিক বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সব সুকুমার শিল্পকলা সেইদিকে শিক্ষার্থীর বিকাশ সহায়ক সন্দেহ নাই।

ভাষা ও সাহিত্যের স্থান ও মাতৃভাষার গুরুত্ব

রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানকেও অনুরূপ কারণেই প্রয়োজন সিদ্ধির পন্থা হিসাবেই দেখিতেন না—ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের অন্যতম সহায়ক হিসাবেও দেখিতেন। তাই তাঁহার শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা অন্যতম স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়াছেন এবং ইহাকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষাই আমাদের চিন্তার মাধ্যম। যাহা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিখি তাহা অন্তরের ধন হয়—অন্য ভাষার মাধ্যমে যাহা শিখি তাহা কিছুটা বাহিরের পোষাক হইয়া থাকে।

শিক্ষার আড়ম্বর হীনতা

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার আড়ম্বরহীনতার সমর্থক ছিলেন। বাহিরের আয়োজন মনকে অন্তর্মুখী না করিয়া আড়ম্বর, আয়োজন প্রভৃতির দিকেই আকৃষ্ট করে। এইজন্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অপেক্ষা তপোবনের শিক্ষা ছিল অধিক অন্তর্মুখী। শুধু দারিদ্রের জন্যই নহে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবেও আমাদিগকে শিক্ষায় আড়ম্বরহীনতা আনিতে হইবে—তিনি ইহাই মনে করিতেন।

গ্রাম সংগঠন ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ভাববাদী ও মরমীয়া দার্শনিক হইলেও তিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখময় জীবনকে কখনো উপেক্ষা করিতেন না—পল্লীর বর্তমান জড়তা ও কূপমণ্ডুকতা ঘুচাইয়া সেগুলিতে প্রাণচঞ্চল ও আশাদীপ্ত জীবনের প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার শিক্ষা চিন্তার আর এক দিক। তাই তিনি শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে গ্রাম-সংগঠনের কাজে প্রয়োগধর্মী

বিজ্ঞান-চর্চার ব্যবস্থাও রাখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চর্চাদ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিকাশ ঘটে তাহাও তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন। যদিও শান্তিনিকেতনে রীতিপদ্ধতি-সম্মত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা তিনি করিয়া তুলিতে পারেন নাই তবু সাধ্যমত তাহার আয়োজন তিনি রাখিয়াছিলেন।

শিক্ষার বিশ্বজনীতা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার সবচেয়ে বড় অবদান শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ভেদ বিভেদের গণ্ডী অস্বীকার করিয়া বিশ্ব মানবের মধ্যে একতাবোধ জাগাইয়া তোলা। 'বিশ্বভারতী' নামেই এই ধারণাটি প্রকাশিত রহিয়াছে। বাস্তব ভাবেও তিনি ইহা রূপায়ণ করিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন ও তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তিনি তাহাতে সফলকামও হইয়াছেন। একাধারে ভারতীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু মহান তাহাকে গ্রহণ করা ও অপর দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙিয়া মহামানবের সাগরতীর্থে অবগাহন করার মত মননশীলতার বিকাশ সাধন, এই দুরূহ ব্রত তিনি সার্থকভাবেই পালন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা এখানে অনেক বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাব্রতীর শিক্ষাসাধনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত অভিমত জানিয়াছি। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত কতকগুলি প্রশ্ন ও সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষাদর্শের প্রয়োগ সমস্যা

শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রয়োগ :—

শিক্ষাবিদ ডিউই "শিক্ষায় গণতন্ত্র" বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহার অস্তিত্ব আরও অনেক আগের যুগের শিক্ষাবিদগণের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও দেখা গিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদগণের মধ্যে কমিনিয়াস, পেষ্টালৎসি ও ফ্রয়েবল এর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখি। ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় ইহা অনেকখানি সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালে গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তায় ইহার ভালরকম প্রতিফলন দেখা গিয়াছে এবং বর্তমানে প্রগতিশীল শিক্ষাচিন্তার ইহা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে।

প্লেটোর শিক্ষা চিন্তায় গণতন্ত্র

শিক্ষাব্যবস্থার সহিত সমাজ ব্যবস্থার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, ইহা অতি পুরাতন সিদ্ধান্ত। প্লেটো তাঁহার সমাজ চিন্তার পোষক হিসাবে যেমন দর্শনকে আনিয়াছেন তেমনি আনিয়াছেন শিক্ষাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবনদর্শন, সমাজদর্শন আর শিক্ষাদর্শন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। প্লেটোর সমাজ আদর্শ ছিল অভিজাত-তান্ত্রিক। কিন্তু তিনি সমাজের নিয়ন্তা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরণের সাম্যবাদ তথা গণতন্ত্র স্থাপনের পোষকতা করিয়াছেন, তাই তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থাতেও কিছুটা গণতান্ত্রিক ভাবধারা দেখা যায়—যদিও তাহা প্রকৃত গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে অনেক

দূরে ছিল। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল না তাই শিক্ষায় গুরুবাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু সংঘবাদী বৌদ্ধধর্ম অনেকাংশে গণতান্ত্রিক ভাব-সম্পৃক্ত ছিল তাই বৌদ্ধ সংঘারামে অনেক বেশী গণতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায়। সংঘারামগুলিতে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অনেক অধ্যাপক অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াইতেন—একই গুরুর উপদেশ আপ্তবাক্য হিসাবে মানিয়া লইতে হইত না। ভারতবর্ষের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাও বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এক হিসাবে বেশী প্রগতিশীল ছিল—ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণ সমবেত-জীবন-যাপন করিতেন। একজন শিক্ষকের সহিত একদল ছাত্র একত্র বাস করিতেন এবং সুনিয়ন্ত্রিত পবিত্র জীবন যাপন ব্যাপারে শুধু ছাত্রগণই শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকিতেন না—ছাত্রগণ শিক্ষকের জীবন তত্বাবধানেরও অধিকার পাইতেন। ইহা সুস্পষ্টরূপে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার অনেকখানিই এই গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে নিহিত ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষার গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের বিপরীত চিন্তা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা। দার্শনিক নিৎসের সমাজ-দর্শন ইহার চরমতম স্বাক্ষর বহন করে। তিনি শক্তিকেই অধিকার বলিয়া মনে করিতেন এবং শক্তিমানের অধীনে সাধারণ ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়াই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। এই দর্শনের ভিত্তিতেই তিনি তাঁহার শিক্ষা-চিন্তা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সমাজচিন্তা ও শিক্ষাচিন্তা পরবর্তীযুগে নাৎসিবাদের মধ্যে অনেকাংশে প্রতিফলিত

শিক্ষার সৌরতন্ত্রী চিন্তাধারা

দেখা যায়। উপরের উদাহরণ সমূহ হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে সমাজ যে রূপ লইবে তাহার বীজ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকা উচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সহজ সত্যটি আমরা মনে রাখি না। আমাদের দেশ অন্যান্য অনেক দেশের মতই আজ গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা গৃহীত হইলেও শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা গৃহীত হয় নাই—অন্ততঃ সাংগঠনিক কাঠাম হিসাবে হয় নাই। পরন্তু ইহা পুরাপুরি আমলাতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মহাকরণ হইতে নির্দেশ বড় হইতে ছোট আমলা মারফৎ প্রধান শিক্ষকের কাছে আসিতেছে—অন্যান্য শিক্ষকগণ তাহা ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দিতেছেন। শ্রেণীর "মনিটার" সেই নির্দেশ পালনে শিক্ষককে সাহায্য করিতেছেন মাত্র—তাহার গণতান্ত্রিক নির্বাচন তাই আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর কোনও পরিবর্তনই সূচিত করিতেছে না। এই ভাবে আমলাতান্ত্রিক শিক্ষার কাঠামোতে ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার শিক্ষালাভ করিয়া যে যুবক সাবালক হইবেন তিনি হঠাৎ একুশ বৎসর বয়স প্রাপ্তিমাত্র গণতান্ত্রিক ভাবধারা গ্রহণ করিতে পারেন না। হয় তিনি জবরদস্ত আদেশদাতা হইবেন—নতুবা বশংবদ আজ্ঞাবহ হইবেন অথবা "শক্তের ভক্ত নরমের যম" হইবেন। বস্তুতঃ আজ আমরা সমাজে তাহাই দেখিতেছি।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্র-বিরোধী রূপ

মানুষের আদি প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী—তাহারা যুগপৎ সক্রিয় থাকে বলিয়া ভারসাম্য রক্ষিত হয়। বস্তুতঃ আরও গভীরভাবে দেখিলে প্রকৃতির প্রতিটি ব্যাপারেই এমনি ধরণের বিষম-সমন্বয় দেখা যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠাবৃত্তি ও

বশ্যতাস্বীকারবৃত্তি এইরূপ দুইটি বিষম-ধর্মী বৃত্তি। সাধারণতঃ আমরা আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালীর নিকট বশ্যতাস্বীকার করিতে উৎসুক হই এবং আমাদের অপেক্ষা শক্তিহীনের নিকট নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। প্রথমটি হইতে আসে হীনমন্যতা ও দ্বিতীয়টি দম্ভের জন্ম দেয়। ইহার কোনটিই আদর্শ মনুষ্য চরিত্রের পক্ষে প্রশংসাযোগ্য নহে—অথচ এই দুইটির অস্তিত্ব উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গণতন্ত্রের মধ্যে এই দুইটির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি বিচারের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বজায় রাখে—কিন্তু সমষ্টির সিদ্ধান্ত সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে। এই দুইটির সুষ্ঠু সমন্বয় দ্বারাই গণতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়িত হইতে পারে—তাহা না হইলেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা জন্মলাভ করিবে।

গণতান্ত্রিক আচরণ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান সম্মত বিচার বিশ্লেষণ

প্রতিদিনের চিন্তায়, কর্মে ও মনোবৃত্তিতে এই সমন্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হয় ও তবেই গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। কিন্তু ইহা এমন একটি শিক্ষা যাহা পুস্তক পাঠ বা বক্তৃতা সাহায্যে সম্ভব নহে, আশৈশব আচরণ ও চিন্তন দ্বারাই ইহা আয়ত্বসাধ্য। তাই শিক্ষাব্যবস্থাতেই তাহার ভিত্তি রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণতন্ত্রের এই ত্রিবিধ শিক্ষা সহজ হয়—কারণ কোনও আচরণকে প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ ও তৎপরে আচরণে পর্যবশিত করণের কতকগুলি অসুবিধার দিক আছে। আচরণে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঠিক অনুভূতি সহায়ে তাহার দোষগুণ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না এবং এইভাবে অনুভব করিতে

না পারিলে বুদ্ধিদ্বারা বিচার অনেক সময় পূর্ব-সিদ্ধান্ত-দুষ্ট হইয়া উঠে। কোনও আচরণকে প্রচলিত করার দুইটি পন্থা আছে—একটি আদেশ ও শাস্তি-ভীতি দ্বারা ও আর একটি প্রভবন সাহায্যে। দ্বিতীয়টিই মনোবিজ্ঞান সম্মত পন্থা কারণ ইহা দ্বারা ব্যক্তিত্ব আহত হয় না—আচরণকারী বিনা মানসিক বাধায় উহা গ্রহণ করিতে পারে। আচরণে ইহা অনুসৃত হইবার পর ইহার সুফলগুলি অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি-বিশ্লেষণ সাহায্যে সহজ-বিচার্য হইয়া উঠিতে পারিবে এবং তখন ইহার প্রতি মানসিক আনুগত্য জন্মিবে ও ইহা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রকৃত গণতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিবে।

গণতন্ত্র শিক্ষার জন্য কর্মের আয়োজন থাকা দরকার

কিন্তু শিক্ষা যখন মাত্র বৌদ্ধিক জ্ঞানলাভের পর্যায়ে থাকে তখন শিক্ষার্থীরা কোনও গণতান্ত্রিক পটভূমিতে মিলিত হইবার সুযোগ পায় না। তাহারা একত্র মিলিতভাবে শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করে মাত্র। শ্রেণী শৃঙ্খলা ইত্যাদির জন্য সামান্য কয়েকটি বিধি বিধান পালন করিতে হয় এবং সমস্বার্থবিশিষ্ট কয়েকটি ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে একটি একতাবোধ জন্মে সত্য কিন্তু তাহা তেমন বাস্তব-ভিত্তিক নহে। অধিকন্তু পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তাহাদের আবেগানুভূতিজনিত তাগিদ খুব কমই থাকে তাই পূর্বোক্ত একতা গঠনাত্মক না হইয়া অনেক সময় বিরোধীধর্মী হয়। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান শিক্ষা অনেকাংশেই প্রতিযোগিতাভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধের বীজ থাকিয়া যায়। তাই বর্তমান বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হইতে পারে না। পাঠ্যক্রম তাহাদের উপর

চাপাইয়া দেওয়া, পরীক্ষা-পদ্ধতি এবং সংগঠন প্রভৃতিও তাহাই। সুতরাং এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত কয়েকটি শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া একটা গণতান্ত্রিক খোলস পরাইয়া দিলেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক শিক্ষার কাজ কিছুমাত্র আগাইয়া যাইবে না।

কিন্তু কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় বিশেষতঃ জীবনাশ্রয়ী কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় বাস্তব-প্রয়োজন-উদ্ভূত গণতান্ত্রিক আচরণ শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়। কাজকর্ম, খেলাধূলা করিতে গেলেই নানা উপকরণ যৌথভাবে ব্যবহার করিতে হয়। ঐগুলি একজন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিলে অপরের অসুবিধা হয় ও অসুবিধাগুলি এমন ধরণের যে প্রত্যেক ব্যবহারকারী তাহার অবিবেচনাজনিত কর্মের ফল নিজেই অনুভব করিতে শেখে। সুতরাং সকলের সুবিধার জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের বাস্তব প্রয়োজন অনুভব করার অনুকূল পরিবেশ কর্মাশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থায় আছে। কর্মগুলি আবার যদি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহানুকূল্য লাভ করে তবে তাহারা সাফল্যের সহিত কর্ম সম্পাদনের তাগিদে তাহার সুযোগ প্রদানকারী গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানগুলি অনুসরণ ও অনুধাবনের অধিক প্রেরণা লাভ করিবে। তাই ডিউই প্রবর্তিত জীবনাশ্রয়ী কর্মসমস্যা পদ্ধতি ও গান্ধীজী প্রবর্তিত উৎপাদনাত্মক কর্মপদ্ধতি গণতন্ত্র শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষকের অবহিতি প্রয়োজন

কিন্তু গণতন্ত্রের শিক্ষাকে সফল করিতে হইলে শিক্ষককে গণতন্ত্রের মূল সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাহার সংগঠনের মধ্যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায় গণতন্ত্রের শিক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে সত্য কিন্তু মূলতঃ ইহা নিছক গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক বিপ্লবাত্মক শ্রেণীহীন সমাজ আদর্শ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তিনি ঐরূপ সমাজের জন্য সকলের বাধ্যতামূলক উৎপাদনধর্মী কর্মের ব্যবস্থা কল্পনা করিয়াছেন ও তাই শিশুগণ ঐ সমাজ আদর্শের প্রতি আনুগত্য হিসাবেই কাজগুলি সম্পাদন করিবে—তাহাদের ভালো লাগে বা তাহাদের সাময়িক প্রয়োজনবোধ জাগিয়াছে বলিয়া করিবে এইরূপ স্বাধীনতা ইহাতে স্বীকৃত হয় নাই। অবশ্য কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা না থাকিলেও কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সহজেই অনুসরণ করা যায় ও তাহাই শিশুর চরিত্রগঠনে সহায়ক হইবে। কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচনের সুযোগ না দিয়া সমাজের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া অভীষ্ট কর্মটি সম্পাদনের প্রতি আগ্রহী করিয়া তুলিতে হইবে। কর্মগুলি জীবনের নিত্যপ্রয়োজন নির্বাহে সহায়ক হওয়ায় সাধারণ শিশু ইহাতে সহজে আগ্রহী হইবে। কিন্তু অভিজাতবর্গের শিশুরা ও মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের ক্ষেত্রে ইহার প্রতি সহজ অনুরাগ না থাকিবারই সম্ভাবনা—ইহারা সাধারণতঃ অন্নবস্ত্র আবাস-সংক্রান্ত অসুবিধা তেমন অনুভব করে না। এদিকে সমাজ আদর্শে প্রভাবিত করিয়া উদ্দিষ্ট কর্মগুলিতে আগ্রহী করিয়া তুলিতে হইলে সামাজিক পরিবেশ সেই আদর্শের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন—কিন্তু

গান্ধীজীর শিক্ষা চিন্তায় সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ

দুঃখের বিষয় সেইরূপ আদর্শ পরিবেশ বর্তমান সমাজে নাই। দ্বিতীয়তঃ, গান্ধীজী যে বিকেন্দ্রীত উৎপাদন-ব্যবস্থা-সম্বলিত সমাজ-আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাকে অনেকেই ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাৎ-অনুবর্তনবাদী মনে করেন। কিন্তু নিছক গণতন্ত্র দ্বারা বর্তমান সমাজের সুস্থতা সাধিত হইরে কি না ইহা বর্তমান যুগে প্রশ্নাকারে দেখা দিয়াছে। বর্তমান সমাজ ধনবৈষম্য ও উৎপাদন-বণ্টনজনিত অসাম্যহেতু যে জটিল সমস্যাসমূহে প্রপীড়িত তাহার সমাধান না হইলে গণতন্ত্র অর্থহীন প্রচেষ্টারূপে গণ্য হইবে। উহা সমাজের মূল সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না—ইহা সঙ্গতভাবেই অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। সেই হিসাবে শিক্ষার মাধ্যম কর্ম নির্বাচনে সমাজ চেতনাবোধের গুরুত্ব দিয়া গান্ধীজী সঙ্গত কাজ করিয়াছেন ও সেই দিক হইতে গান্ধীজীর শিক্ষা-চিন্তা ডিউইএর শিক্ষা-চিন্তা হইতে অধিকতর প্রগতিশীল মনে করিবার কারণ আছে।

গান্ধীজীর কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার সহিত সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষার তুলনা

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে এক ধরণের কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা প্রবর্তিত আছে। সেখানে শিক্ষার্থীগণ উৎপাদনাত্মক ও সৃজনধর্মী নানা কাজ করে প্রধানতঃ শিক্ষার্থী-গোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। কিন্তু যেহেতু ঐ দেশগুলিতে দেশের প্রতি অঞ্চলের সমস্যা ও প্রয়োজনের সহিত সমগ্র দেশের প্রয়োজনের সঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে তাই শিক্ষার্থী-গোষ্ঠীর নিজেদের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে সম্পাদিত উৎপাদনধর্মী কাজের সহিত সমগ্র দেশের প্রয়োজনের বিরোধ নাই—সঙ্গতি আছে। এখানে কি শিক্ষার্থী কি নাগরিক সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করে তাই কর্ম-নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন সেখানে নাই। কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রয়োগ এখানেও হয় সুতরাং এই

শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্মাশ্রয়ী শিক্ষার সহিত গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষার যথেষ্ট মিল আছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রথমোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অনুকূলে বিকশিত করিলে তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আদর্শ লাভেও সহায়ক হইবে। অসুবিধা এই যে কর্ম-সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রথমেই ইহা খুব বেশী উৎপাদনে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় না। সকলের বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা কর্ম-পরিকল্পনা রচনা করিয়া-ও কর্ম-সম্পাদন বিধি প্রস্তুত করিয়া কাজ করিতে সময় লাগে বেশী, ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাও থাকে অনেক। তাহার পরিবর্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হইলে প্রথম দিকে কর্মের পরিমাণগত ও গুণগত সাফল্য অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কর্মকেন্দ্রী হইলেই যে শিক্ষা গণতন্ত্রসম্মতভাবে চলিবে তাহা নহে বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইবে কর্মের গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষের প্রতি অধিক অনুরাগী শিক্ষক গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী না হইবার ফলে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাকে আরও স্বৈরতন্ত্রী করিয়া তুলিবেন। প্রকৃতপক্ষে আজ বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ত্রুটি অনেক বিদ্যালয়ে ও শিক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উৎপাদন বা কাজের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষের প্রতি আগ্রহশীল শিক্ষক যেন ইহা মনে রাখেন যে কাজটি যান্ত্রিকভাবে শেখা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করাই কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার সাফল্যের মাপকাঠি নহে—শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, কর্মের প্রতি অনুরাগ, যৌথভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহনশীলতা, উপস্থিতবুদ্ধি প্রভৃতিই ইহার সাফল্যের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক্। তাহা ব্যতীত ইহাও তাঁহারা বিবেচনা করিতে

পারেন যে যখন গণতান্ত্রিকভাবে কাজের পরিকল্পনা ও বিধি-বিধান রচনা করিয়া কর্মসম্পাদনের সুযোগ শিক্ষার্থী লাভ করে তখন কর্মটির প্রতি তাহাদের নিজস্ব আসক্তি জন্মে বলিয়া ক্রমেই তাহাদের কর্মের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় ও শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের বিচারেও লাভবান হওয়া যায়—বিশেষতঃ যখন কাজটি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের জীবন সহায়ক হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা শিক্ষকের পক্ষেও সমান প্রয়োজন।

উৎপাদন আগ্রহ বনাম গণতান্ত্রিক আদর্শ

ডিউই প্রবর্তিত জীবনকেন্দ্রী কর্মসমস্যা-সমাধান-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ তাহাদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত কোনও বাস্তব সমস্যার সমাধানমূলক কর্মে ব্রতী হইয়া কাজটির সম্পাদন পরিকল্পনা নিজেরা তৈয়ারী করে ও উহা সম্পাদন করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে থাকিয়া পরিকল্পনা রচনা, তাহার রূপায়ণ ও তাহা সম্পাদিত হইবার পর উহার গুণাগুণ বিচার—ইহার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদিগকে তাঁহার অভিজ্ঞতা দিয়া সাহায্য করেন কিন্তু আদেশ-নির্দেশ দেন না—প্রভাবিত করেন মাত্র। তিনি ঐ কাজটির সম্পাদন সহায়ক হইবে এমন সাঙ্গীকৃত জ্ঞানসমূহ নিজে প্রদান করেন অথবা যে পুস্তকাদি হইতে তাহা আয়ত্বসাধ্য হইবে তাহার সন্ধান দিয়া উহা লাভে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষার্থী এইভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্ম সম্পাদন ও জ্ঞানার্জন উভয়ের শিক্ষাই লাভ করে। জ্ঞান লাভের জন্য গণতান্ত্রিক যৌথ প্রচেষ্টা হিসাবে সেমিনার পদ্ধতি, সিণ্ডিকেট আলোচনা পদ্ধতি প্রভৃতি নানা পদ্ধতি এইভাবে গড়িয়া উঠিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও ক্রমেই বিকাশলাভ করিতেছে। যে শিক্ষার্থী শৈশব হইতেই এইভাবে গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় শিক্ষা পাইবে সে উত্তর-

কালে একজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হইতে পারিবে ইহা আশা করা যায়। ইহার জন্য শিশুকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কোনও উৎপাদন কার্যে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে ও শিশু ঐ উৎপাদন দ্বারা স্বীয় সমাজের প্রয়োজন তথা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া সমাজ-কর্তব্য সম্পন্ন করিবে ও তাহাতে আনন্দ লাভ করিতে শিখিবে। কিন্তু কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ডিউইএর গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসৃত হইবার যোগ্য কারণ ইহা দ্বারাই কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হইবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গণতান্ত্রিক আদর্শে বিদ্যালয় সংগঠন

বিদ্যালয়ের কাজকর্মগুলি সম্পাদন ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পরিচালন সফল করিতে হইলে সমগ্র বিদ্যালয়টিকেই গণতান্ত্রিক ধাঁচে সংগঠিত করিতে হইবে। এইজন্য বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীর নিয়ম শৃঙ্খলার বিধি-বিধান রচনা, নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিচালন ও বিচ্যুতি সমূহের প্রতিবিধান ব্যবস্থাও শিশুদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। যতদূর সম্ভব বাস্তব অধিকার দিয়াই ইহা সুরু করিতে হইবে নতুবা কৃত্রিম অধিকার দিয়া ভাঁওতা সৃষ্টি করিতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবে। বলা বাহুল্য তাহার জন্য শিক্ষকবর্গের মানসিক প্রস্তুতি ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন হইবে। গণতন্ত্রে ভুল করার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভুলের মধ্য দিয়া শিক্ষালাভের নীতি মানিয়া নেওয়া হইয়াছে সুতরাং এখানেও অনেক ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই প্রকৃত শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে। এইজন্য শিক্ষকবর্গের সহনশীলতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন।

কোনও উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে সহজেই শিক্ষক ছাত্রের ও ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে সহজ বোঝাবুঝি ও সহনশীলতা গড়িয়া উঠে। এইজন্য বিদ্যালয়ে উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণা থাকা বাঞ্ছনীয়। দেশাত্মবোধ বা মানব-প্রীতি এইরূপ আদর্শ হইতে পারে। বলা বাহুল্য শেষোক্তটি অধিকতর উদার। সব চেয়ে ভাল হইবে উভয়ের সঙ্গত সংমিশ্রণ। সমাজতন্ত্রের আদর্শে শেষোক্তটি তো আছেই

শৃঙ্খলা বিধানে উচ্চ আদর্শের স্থান

তদুপরি সত্য ও যুক্তির প্রতি অনুরাগ ও সমষ্টি চেতনার উচ্চ আদর্শ থাকায় তাহা অধিকতর ঘাতসহ হইতে পারে ও আত্মকেন্দ্রী মনোভাবের বিরুদ্ধে সচেতনা ও দ্বন্দ্ব তাহাকে আরও সক্রিয় হইতে সাহায্য করে। বিরোধী ভাবধারার সহিত সংগ্রাম আদর্শকে আরও শাণিত করে। তাই এইরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা এবং পরস্পর প্রীতি ও সহনশীলতা তথা একাত্মবোধ বাড়ায়। বিরোধী প্রবণতাকে সংহত করিতে পারিলে ইহা গণতান্ত্রিক সংগঠনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। উৎপাদনাত্মক শ্রম ও গঠনাত্মক সমালোচনার সহিত সংহত করিতে পারিলে ইহা গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ রচনার অত্যন্ত সহায়ক হইবে। কিন্তু দ্বন্দ্বের ও সমালোচনার ভাব বৃদ্ধি হইতে দিলে আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে—সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই এক্ষেত্রে থাকিবে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় বিদ্যালয় সংগঠনে উপরের নীতির প্রয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গণতন্ত্র সম্মত শিক্ষায় শিক্ষকগণের পরস্পর সম্পর্ক

শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্বাগ্রে শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলেই সেই আদর্শ ক্রমে ছাত্রদের পরস্পরের সম্পর্ক ও শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করিবে। কিন্তু বর্তমানে

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের সহযোগিতা

সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণের সম্পর্ককে গণতন্ত্রসম্মত বলা চলে না। প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের সর্বেসর্বা। পরিচালকমণ্ডলী তথা সরকার তাঁহার মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রধান শিক্ষক তাঁহার এই পদাধিকার বিষয়ে অত্যন্ত বেশী সচেতন তাই তিনি আদেশ-নির্দেশ মারফৎই সহকারী শিক্ষকগণকে বিভিন্ন কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করেন। সহকারী শিক্ষকগণও তাই নিজ নিজ ন্যস্ত কর্তব্যটুকু সম্পাদন করিয়াই দায়িত্ব শেষ করেন। ইহাতে বিদ্যালয় একটি সংঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-রূপে সংগঠিত হইতে কখনই পারে না। অবশ্য অনেক ভাল প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকদের সহিত ভাল সম্পর্ক রাখেন এবং বিদ্যালয়ের নানা কাজ-কর্মে তাঁহাদের যুক্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু এইরূপ সম্পর্ক রাখা ও যুক্তি গ্রহণ করায় বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বাধ্যবাধকতা নাই। মাত্র তিনিই বিদ্যালয়ের কাজকর্মের জন্য দায়ী এবং যে কোনও সিদ্ধান্ত তিনি নিজ দায়িত্বেই গ্রহণ করিতে পারেন। সহকারীদিগের মতামত গ্রহণ সেখানে অনেকখানিই স্বৈচ্ছিক ব্যাপার। বলা বাহুল্য এইরূপ সংগঠন-

বিধি কদাচ গণতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাহাছাড়া সাধারণ বিদ্যালয়ে বিষয়গত পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত সহকারী শিক্ষকগণের আর বিশেষ কিছু দায়িত্ব থাকে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহ কর্মকেন্দ্রী ও জীবনকেন্দ্রী হওয়ায় সেখানে শ্রেণী পাঠন ছাড়াও অনেক কাজকর্ম আছে এবং এই কাজকর্মে সকল শিক্ষকের মতামত গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়। তথাপি সেখানেও গণতান্ত্রিক আবহাওয়া আসিয়াছে বলা চলে না। তাই বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া আনিতে হইলে প্রথমেই প্রধান ও সহকারী শিক্ষকগণের এই প্রচলিত সম্পর্কের স্থলে নূতন গণতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে তাহা স্থাপন করা সম্ভব :—

(১) **শিক্ষকের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন :—**

বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের সহযোগিতার উপরই বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নির্ভরশীল—এই আবহাওয়া আনিতে হইবে ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজকর্মের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। প্রধান শিক্ষক নিজ দায়িত্ব অংশ ছাড়া কোনও বিশেষ শিক্ষক সাময়িক অসুবিধায় পড়িলে তাঁহার দায়িত্বাংশ পালনের ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু তিনি সর্বেসর্বা—এইরূপ ব্যবস্থারই পরিবর্তন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে বিদ্যালয়ের সুনাম দুর্নামের ভাগ একা প্রধান শিক্ষক পাইবেন না। বর্তমানে তাহাই করা হয়। কোনও বিদ্যালয়ে কোনও বিষয়ে উন্নতি দেখা দিলে প্রধান শিক্ষক প্রশংসা পান—রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। সহকারীগণ কোনও স্বীকৃতি লাভ করেন না। ইহাতে তাঁহাদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বিদ্যালয়ের কোন

বিষয় সাফল্য সকল শিক্ষক ছাত্রের যৌথভাবে প্রাপ্য হওয়া উচিত ; ব্যক্তিগতভাবে প্রধান শিক্ষকের নহে।

(২) **শিক্ষকসভার কার্যক্রমাদি নির্ধারণ বিধি :—**

বিদ্যালয়ের কাজকর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ অথবা কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সকল শিক্ষকের মিলিত সভায় হওয়া উচিত ও ঐ সভাগুলিতে সকল শিক্ষক স্বাধীনভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ আবহাওয়া থাকা উচিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আইন-কানুন-প্রথা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া সহকারী-গণকে পরিচালন করিতে পারিবেন। কিন্তু পদাধিকারবলে কাহাকেও প্রভাবিত করিবেন না ইহাই বিধি হওয়া উচিত। সিদ্ধান্ত-সমূহ যতদূর সম্ভব সর্বসম্মত হওয়া ভাল নতুবা অধিকাংশের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোনও অধিকাংশের সিদ্ধান্ত বিধিবহির্ভূত হয় তখনই তাহা প্রধান শিক্ষক উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া বর্জন করিতে পারেন বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে পারেন। ভাল সম্পর্ক গড়িয়া উঠিলে এইরূপ মতবিরোধ-ক্ষেত্র কদাচিৎ আসিবে।

(৩) **শিক্ষক সম্বন্ধে সমালোচনা বিধির পরিবর্তন :—**

বর্তমানে সহকারীগণের সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষকের অভিমত উচ্চমূল্য বহন করে এবং এই অভিমত গোপনীয়ভাবে জ্ঞাপন করা হয়। এইজন্য সহকারীগণ প্রধান শিক্ষকের তুষ্টি বিধানের জন্য অধিক সচেতন থাকেন—তাঁহার নিকট প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখেন। অনেক সময় ভাল শিক্ষক সঙ্গত কারণে প্রধান শিক্ষকের বিরোধিতা করিয়া চাকুরীক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েন। ফলে সকল শিক্ষকই দূরে দূরে থাকিয়া নির্ধারিত কর্মটুকু সম্পন্ন করিতে ও

অন্যভাবে প্রধান শিক্ষককে তুষ্ট রাখিতে প্রয়াসী হন। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কোনও শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা হইলে প্রধান শিক্ষক শিক্ষক-সভাতেই তাহা তুলিবেন ও সমগ্র সভা তাহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এইরূপ বিধি থাকাই গণতন্ত্রসম্মত। ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে প্রধান শিক্ষক অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে ঐ শিক্ষককে সংশোধন করিতে প্রয়াসী হইবেন।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসৃত হইলে তবেই বিদ্যালয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক আবহাওয়া স্থাপিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য এইরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পূর্বে শিক্ষকগণের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সমবেদনার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া দরকার। উপরের আলোচনায় মনে হইবে যে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব কিছু থাকিতেছে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য

তাঁহার নৈতিক দায়িত্ব ইহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। প্রথমতঃ তাঁহাকে শুধু আইনতঃ সকলের উপরে থাকিলেই চলিবে না, তাঁহাকে সকলের আস্থাভাজন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে শিক্ষকগণের প্রত্যেকের যে বিশেষ গুণপনা আছে তাহা জানিতে হইবে ও বিদ্যালয়ের কল্যাণে সেই গুণ প্রয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অসুবিধা-সমূহ জানিতে হইবে ও তাহা যতদূর সম্ভব দূরীকরণে যত্নশীল হইতে হইবে। যাঁহার যে গুণ আছে সেই গুণটিকে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত ও অপর শিক্ষকগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ত্রুটির ক্ষেত্রে প্রথমে তাহা ব্যক্তিগত প্রভাবে দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। উহাতে সফল না হইলে তবেই তাহা সর্বজন-গোচরে আনিয়া উহার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করিতে হইবে। তাঁহাকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও মানবতাবাদী হইতে হইবে।

সহকারী শিক্ষকের কর্তব্য

সহকারী শিক্ষকগণকে ও বিদ্যালয়ের কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়া নিজ নিজ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইবে তাহা মান্য করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত বিরূপ মনোভাব থাকিলেও তাহা ভুলিয়া তাঁহাকে দৈনন্দিন কাজকর্মে প্রধান শিক্ষককে সম্মান দিতে হইবে। তিনি শিক্ষক সভায় নিজ বুদ্ধি-বিবেক-মত প্রধান শিক্ষক বা যে কোনও ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার মতের বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তিনি পরে তাহা মানিয়া চলিবেন ইহাই গণতন্ত্রের বিধি। এই বিধি মান্য করিলে তবেই তিনি গণতান্ত্রিক সংস্থার যোগ্য সভ্য হিসাবে কর্তব্য পালন করিবেন।

যদি বিদ্যালয় পরিচালনে ও শিক্ষকগণের সম্পর্কে এইভাবে গণতান্ত্রিক ভিত্তি রচিত হয় তবেই ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে—নতুবা নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ ইহার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে; দ্বিতীয়তঃ ইহার শিক্ষাগত মূল্য অত্যন্ত বেশী।

সাধারণ বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমে প্রয়োজনের দিকটি অর্থাৎ ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করা যাউক। বিদ্যালয়ে অনেকগুলি শিক্ষার্থী একত্রে পাঠাভ্যাস করে। তাই একজনের আচরণ অপরের উপর প্রতিক্রিয়া করে। শ্রেণীতে যখন অনেকগুলি শিক্ষার্থী কোনও একটি শিক্ষণীয় বিষয় অনুধাবন করিতেছে তখন একজন যদি বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইয়া এমন কি সরবে আলোচনাদি না করিয়া নীরবে অন্য কোনও পুস্তক বা পত্রপত্রিকা পাঠরত হয় কিংবা শুধু অন্যমনস্ক হয় তাহাও অপরের পাঠ অনুধাবনে বাধা সৃষ্টি করে। এইরূপ যে সব ব্যক্তিগত আচার-আচরণ দ্বারা অন্যে অনভিষ্টভাবে প্রভাবিত হয় তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিয়া শ্রেণীকার্যের সুষ্ঠু অগ্রগতিতে সাহায্য করাই শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয় দিক। অমনোযোগী ছাত্রকে মনোযোগী করার ক্ষেত্রে আইন-কানুন প্রয়োগ সাহায্য করে না বটে কিন্তু বিষয়ান্তরে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকা হইতে বিরত করা সম্ভব এবং আমরা সাধারণতঃ ইহাকেই শৃঙ্খলা বিধান বলি। কোনও শিক্ষক সার্থকভাবে শ্রেণী পরিচালন করিতে চাহিলে তাঁহাকে ইহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে

কাজ করে। কাজের উপকরণ ও হাতিয়ারসমূহ যদি ঠিকমত ব্যবহৃত না হয় ঐগুলি অকেজো হইয়া যাইবে। সাধারণতঃ একটি হাতিয়ার দ্বারা অনেকে কাজ করিবে, কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহাই রীতি। যাহাতে হাতিয়ারগুলি প্রয়োজনমত সকলেই পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে সম্পাদন বিরক্তিকর হইবে—কাজ অগ্রসর হইবে না। এইজন্য কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাতেও শৃঙ্খলার অত্যন্ত প্রয়োজন। সুশিক্ষককে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রয়োজনগত দিকটি ছাড়া

কর্মকেন্দ্রী বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা

শৃঙ্খলার আর একটি শিক্ষাগত দিকও রহিয়াছে এবং তাহাও কম প্রয়োজনীয় নহে। জীবনের প্রতিটি কার্যের সাফল্য নির্ভর করে চারিত্রিক শৃঙ্খলার উপর। শিক্ষার্থীর জীবনে যদি শৃঙ্খলা-বোধ দৃঢ়বদ্ধ হয় তবে সে উত্তরজীবনে সাফল্যের অধিকারী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি মিলিতভাবে যৌথ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। প্রতিটি ব্যক্তি যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসারে ঐরূপ যৌথ প্রচেষ্টার অংশীদার হন তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে এবং এইরূপ কাজে অধিক সাফল্য পাওয়া যায়। সুতরাং শুধু শ্রেণীর কার্যেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন সীমিত নহে—সমগ্র জীবনেই ইহা সুফল প্রদান করে। তাই শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবোধ শুধু শ্রেণীকার্যের সুপরিচালনার জন্যই প্রয়োজনীয় নহে—ইহা একটি শিক্ষনীয় বিষয়ও।

শৃঙ্খলার শিক্ষাগত মূল্যের দিক

শিক্ষকগণ শৃঙ্খলার এই প্রয়োজন ভালভাবেই বোঝেন·তাই তাঁহারা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য খুবই সচেষ্ট। যে শিক্ষার্থী

শৃঙ্খলা অমান্য করে তাহাকে তিরস্কার করা হয়, শাস্তি দেওয়া হয় এবং যে শিক্ষার্থী শৃঙ্খলা মান্য করিয়া চলে তাহাকে প্রশংসা করা হয়, পুরস্কৃত করা হয়। শৃঙ্খলা বিধানের এই পদ্ধতি এত বেশী প্রচলিত যে শৃঙ্খলা ও শাস্তি এই শব্দদ্বয় প্রায়ই একত্রে উচ্চারিত হইতে শুনি। ছোটদের ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের সহায়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য দেখা যায়—অবশ্য মুষ্টিমেয় শিশু এই কৌশলে সাড়া দেয় না। অপেক্ষাকৃত বড়দের ক্ষেত্রে বাধার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ে। তখন শৃঙ্খলাবোধহীনদিগকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারের ব্যবস্থা দেওয়া হয় কারণ তাহাদের প্রভাব অপরের উপর পড়িতে পারে। ইহাই ছিল কয়েক যুগ আগের অতিপ্রচলিত শৃঙ্খলা বিধান ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাবিদগণ এই পদ্ধতিকে মানিয়া লইতে চাহিতেছেন না। কেন চাহিতেছেন না—তাহা প্রণিধান করা প্রয়োজন।

প্রচলিত শৃঙ্খলা শিক্ষা পদ্ধতি

মানুষের মধ্যে অনেকগুলি বিরোধী বৃত্তি রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আত্মাভিমান বৃত্তি ও আত্মাবমাননা বৃত্তি—এইরূপ একজোড়া পরস্পর বিরোধী বৃত্তি আছে। এই দুইটির সামঞ্জস্য ঘটিলে মানব চরিত্র মাধুর্যমণ্ডিত হয় কিন্তু ইহার একটির আধিক্য চরিত্রের সমতা বিনষ্ট করে। অত্যধিক আত্মাবমাননা বৃত্তির বিকাশে চরিত্রের দৃঢ়তা নষ্ট হয় আবার অত্যধিক আত্মাভিমান বৃত্তির বিকাশ তাহাকে অহংকৃত করিয়া তোলে। যাহা নিজের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী গ্রহণ, অনুসরণ ও সম্মান যোগ্য মনে করিব তাহাকে পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ ও অনুসরণ করিব কিন্তু যাহা বুদ্ধি-বিবেক-সম্মত বলিয়া নিজ চিত্ত গ্রহণ করিতেছে না

শৃঙ্খলা শিক্ষা সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

তাহাকে অস্বীকার করিব। শক্ত চাপ প্রদান সত্বেও গ্রহণ করিব না—ইহাই হইতেছে মাধুর্যমণ্ডিত দৃঢ় চরিত্রের লক্ষণ। অহংকারী ব্যক্তির মত এই ব্যক্তি নিজের বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অপর ব্যক্তির কোনও যুক্তিকে প্রণিধান করিতে অস্বীকার করেন না আবার ব্যক্তিত্বহীন পরানুকারীর মত বিনা বিচারে কোনও কিছু গ্রহণ করেন না। বুদ্ধি-বিবেক-সম্মত বুঝিলে তিনি যে কোনও ব্যক্তির অনুজ্ঞা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহার বিরোধী হইলে সবিনয়ে তাহা অনুসরণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং শাস্তির ভয় উপেক্ষাপূর্বক উহা পালন করিতে সর্বদাই অসম্মত হন। যদি শিক্ষার্থীকে পুরস্কারের লোভ ও শাস্তির ভয় দেখাইয়া শৃঙ্খলা মানিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে তাহাকে অনুরূপ ব্যক্তিত্বের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি শিক্ষা দেওয়া হইল না কি? দেখা যাইবে যে শিশু ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তাহাকে শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া শৃঙ্খলা মানাইতে চাহিলে বিপরীত ফলই দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী বাল্যে শৃঙ্খলাবোধযুক্ত অনুগত ছাত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নাই। অপেক্ষাকৃত কম ব্যক্তিত্বসম্পন্নগণ এই কৌশলে সাড়া দিলেও ইহার ফলে তাহাদের ব্যক্তিত্ব আরও বেশী খর্বিত হইয়াছে—শিক্ষার মহত্তম সুফল হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। অপর পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে শৃঙ্খলার প্রতি বশ্যতা, শৃঙ্খলার প্রতি তাহাদের প্রচ্ছন্ন বিরূপতা সৃষ্টি করিয়াছে ও যেখানে শৃঙ্খলা রক্ষার বাধ্যবাধকতা হিসাবে শাস্তি-পুরস্কার-মূলক ব্যবস্থা নাই সেখানে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া ঐ বিরূপতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাই শিক্ষিত ব্যক্তিকেও অনেক সময় অত্যন্ত বিসদৃশ আচরণ করিতে দেখা যায় অর্থাৎ বিদ্যালয়ের

পুরস্কার ও শাস্তির সাহায্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ও শিক্ষার সুফল

শৃঙ্খলা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঞ্চারণধর্মী স্বতঃশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয় না। এক্ষেত্রে শৃঙ্খলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে।

তাহা হইলে শৃঙ্খলা বিধানের সুষ্ঠুপন্থা কি হইবে? শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলার প্রয়োজন বুদ্ধি ও অনুভূতি সহায়ে বুঝিতে দিতে হইবে ও **আদর্শ সম্মত শৃঙ্খলা স্থাপনের পদ্ধতি** তাহাদের মানসিক সম্মতি লাভ করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইবে অর্থাৎ গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইবে।

কিন্তু ছোটরা শ্রেণীতে পড়াশুনার ব্যাঘাতজনিত অসুবিধা ও তজ্জনিত ক্ষতি তেমন বুঝিতে পারে না। কারণ শিশুর পক্ষে পুস্তককেন্দ্রী পড়াশুনায় সহজাত আগ্রহ আশা করা যায় না। তৎপরিবর্তে তাহারা খেলাধূলা, সৃজনধর্মী কাজকর্মে অগ্রণী হয়। ক্রমে সাধারণভাবে শৃঙ্খলার অনুকূল ক্রমে অনুকূল যুক্তিসমূহ শিশুচিত্তকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু যদি বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা চলিতে দেওয়া হয় তবে শিক্ষক যত যুক্তিই প্রদর্শন করুন না সহজে শৃঙ্খলা আনিতে পারেন না কারণ যুক্তিদ্বারা বুঝিলেও ভিন্নরূপ আচরণের জড়তা (inertia) শিশুরা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। সেইরূপ অবস্থায় কোনও একটি আচরণের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিলেই চলিবে না, শিশুরা যখনই যুক্তিদ্বারা উহা অনুমোদন করিবে তখনই উহাকে রূপান্তর করার ব্যাপারে শিক্ষককে যত্নশীল হইতে হইবে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া শিক্ষকের প্রচেষ্টাহীনতা দ্বারা সুফল আসিবে না। পরন্তু যদি সত্য শিক্ষানুরাগী ও শিশুপ্রেমী হন তবে প্রাথমিক শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা জবরদস্তি ঘটাইলেও পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সমর্থন পাইবেন ও স্বতঃশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন। এক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষকের সত্যকার শিশুপ্রীতি ও শিক্ষানুরাগ তাঁহার

সাফল্যের হেতু হইবে। মেকারেঙ্কো তাঁহার "রোড টু লাইফ" গ্রন্থে এইরূপ জবরদস্তির একটি সাফল্যের বিবরণ দিয়াছেন। পরে তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছেন তাঁহার শেষোক্ত গুণদ্বয়ের বাস্তব পরিচয় পাইয়াছিল বলিয়াই শিক্ষার্থীগণ তাঁহার ঐ জবরদস্তিটুকু মানিয়া লইয়াছিল—ভয়ে নহে। তৎপরে শৃঙ্খলা মানিয়া উহার মহত্ব বুঝিতে শিখিয়াছিল বলিয়াই উহাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গের অবতারণার হেতু এই যে কোনও বিশেষ রকম বিশৃঙ্খল বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আনয়নের প্রথম ধাপে কিছু কিছু জবরদস্তির প্রয়োজন থাকিতে পারে; কিন্তু উহার প্রয়োগ স্বল্পমেয়াদী হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর মনকে যদি শৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগী না করিতে পারা যায় তবে শুধু জবরদস্তির দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী শৃঙ্খলা তাহাদের মনকে দাস্যভাবাপন্ন করিবে, শিক্ষার প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বীতশ্রদ্ধ করিবে ও পরিণামে খারাপই করিবে। সুতরাং শাস্তির দ্বারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার যে ধারণা শিক্ষকদের মধ্যে আজিও দেখা যায় তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা বিধানের প্রক্রিয়াটি হইবে নিম্নরূপ। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে আচরণবিধি শিক্ষার্থীগণই রচনা করিবে; যেমন—বৌদ্ধিক শ্রেণীতে কিভাবে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ও প্রশ্ন করা যুক্তি-যুক্ত, কিভাবে শ্রেণীতে বসা ও শ্রেণী হইতে বাহিরে যাওয়া বিধেয়, কাজের শ্রেণীতে কিভাবে উপকরণাদি বিতরণ করা বিধেয় ইত্যাদি। তৎপরে ঐ বিধিনিষেধগুলি পালিত হইতেছে কিনা দেখিবার দায়িত্বও শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধির উপরেই থাকিবে। অনবধানজনিত ত্রুটি সংশোধন ঐ প্রতিনিধিই করিবে, শিক্ষক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। শিক্ষক বিধি-রচনায়

শৃঙ্খলা বিধানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবেন। ইচ্ছাকৃত অথবা অবহেলা-প্রসূত ক্রমাগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধান ব্যবস্থার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিচার সভার ব্যবস্থা থাকিবে। শিক্ষক বিচারসভার পরিচালক হইতে পারেন কিংবা শিশুরা পরিচালক হইলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভুলত্রুটিগুলি যুক্তিসহ প্রদর্শন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রভাব দ্বারা শিক্ষার্থীগণকে ভুলত্রুটি হইতে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। ইহা মনে করা সম্ভব যে শিক্ষার্থীগণের হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা বিধি মান্য করা অপেক্ষা ভঙ্গ করিবার ঝোঁকই বেশী দেখাইবে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দায়িত্ব পাইলে শিশুরা দায়িত্বশীল হইয়া উঠিতে পারে। এই বিষয়ে "লিট্‌ল কমনওয়েলথ" এর নজীর অত্যন্ত মূল্যবান। সেখানে তথাকথিত বেয়াড়া শিশুগণও দায়িত্ব পাইয়া অত্যন্ত দায়িত্বশীল, কুশলী ও কর্মী-প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইবে দায়িত্ব পাইলে শিক্ষার্থীগণ অনেক সময় শিক্ষক অপেক্ষাও কঠোর শৃঙ্খল-ধর্মী হইয়া উঠে। শান্তিনিকেতনের একটি কিশোর বয়স্ক ছাত্র একটু বেশী স্পষ্ট বক্তা ছিল—অন্যদিক হইতে তাহার অনেক গুণ ছিল এবং সে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিল কিন্তু অনেক সময় রূঢ়তা প্রকাশ করিত। একবার শেষোক্ত কারণে সে একজন শিক্ষকের বিরক্তি উৎপাদন করিল। শিক্ষক মহাশয় অপমানিত বোধ করিয়া ঘটনাটি শিক্ষার্থীদের পরিষদের সম্মুখে আনিলেন। শিক্ষার্থীগণ ঐ শিক্ষার্থীর আচরণ দোষ-দুষ্ট মনে করিয়া তাহাকে ক্ষমা চাহিতে নির্দেশ দিল। শিক্ষার্থী তাহার আচরণে দোষ দেখিতে পাইল না ও ক্ষমা চাহিতে অস্বীকার করিল। ইহাতে শিক্ষক মহাশয় ও ঐ ছাত্রের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা

জন্মিল ও অন্য ছোটখাট আচরণে তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল অর্থাৎ ছাত্রটির অপরাধের বোঝা বাড়িতে লাগিল। অন্য ছাত্রগণ ঐ ছাত্রকে জানাইয়া দিল যে তাহাকে ক্ষমা চাহিতে হইবে নতুবা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিতে হইবে। বিষয়টি তাহারা রবীন্দ্রনাথের গোচরীভূত করায় তিনি ঐ অপরাধী ছাত্রটিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তথাপি ঐ ছাত্রটি নিজ আচরণে অন্যায় দেখিতে পাইল না ও ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত রহিল। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে বলিলেন যে পরের দিন বৈতালিকের পর অপরাধী ছাত্র ক্ষমা চাহিবে। যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ ছাত্রটিকে লইয়া ছাত্রগণ ও ঐ শিক্ষকের নিকটে গেলেন এবং বলিলেন, "এই বালক অল্পবয়স্ক, দোষ বুঝিতে পারিতেছে না। সে পরে নিজ দোষ বুঝিবে। আমি তাহার হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, আপনি শিক্ষক তাহাকে ক্ষমা করুন"। রবীন্দ্রনাথের এই আবেগময় উক্তি শুনিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিহ্বল হইলেন এবং অপরাধী ছাত্রটি আবেগের সহিত কাঁদিয়া উঠিয়া ঐ শিক্ষকের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। এই ঘটনাটি শৃঙ্খলাবিধান ও আচরণ-বিধি পালন, সংরক্ষণ ও ত্রুটি-জনিত প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করিতেছে। গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ মহৎ অনুভূতি ও আকুতির প্রয়োজন, তাহা হইলে সুফল অবশ্যই পওয়া যাইবে। শিশুরা গল্প শোনা প্রভৃতিতে স্বাভাবিক-

কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় শৃঙ্খলা-বিধানের সুবিধা

ভাবে আগ্রহী হয়। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধা ও তাহা না করার অসুবিধা সহজে বুঝিতে পারে। যখন কোনও গল্প সকলে মিলিয়া শুনিতেছে তখন একজন বাধা দিলে সকলের অসুবিধা হইবে তাহা

শিশুদের বুঝিতে অসুবিধা হয় না। খেলাধূলা ও শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহযুক্ত কাজ-কর্মের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটে। তাই ছোটদের কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করা অনেক বেশী সহজ হয়। পুস্তককেন্দ্রী শিক্ষায় যখন কোনও শিশু গোলমাল করিয়া শ্রেণীর কাজে বাধা সৃষ্টি করে তখন বিরক্তিকর ব্যাপার হইতে অন্যান্য শিশুকেও সে মুক্তি দিতেছে বলিয়া অন্য শিশুদের মন তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠে। তখন শাস্তি দিলে শিশুদের মন শাস্তিপ্রাপ্ত শিশুর প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়। এইজন্য শিশুদের মানসিক সমর্থনের পূর্ব সর্ত হইতেছে শ্রেণীকার্যে শিশুদের মানসিক আগ্রহ জাগ্রত করা। অবশ্য এই কথা মনে করিবার কারণ নাই যে প্রতিটি শৃঙ্খলা-বিধানের ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক সম্বলিত বক্তৃতা দিয়া শিশুদিগকে বুঝাইয়া ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। বাস্তব প্রয়োজন বুঝিবার মত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিলে শিশুরা বিনা বক্তৃতাতেই শৃঙ্খলা-বিধায়ক নিয়মগুলির সার্থকতা বুঝিবে ও তাহা পালন করিবে। আবার কোনও একরোখা অবাধ্য শিশু উহার সার্থকতা ঠিকমত অনুধাবন করিতে না পারিলেও সমাজ-সমর্থনের অভাবে ভিন্ন আচরণে নিরুৎসাহিত হইবে, শৃঙ্খলা অনুসরণ করিতে করিতে তাহার মহত্বও ক্রমে বুঝিতে পারিবে। প্রভবন দ্বারা এইরূপ হইবে। কোনও ব্যক্তিই প্রভবনকে উপেক্ষা করিতে পারে না এবং যুক্তি অনুযায়ী হইলে প্রভবনের ফল মন্দ হয় না। প্রভবনের কথায় মনে রাখিতে হইবে শিক্ষক বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে শিশুর উপর অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেন সুতরাং শিক্ষকের নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ শিশুকে প্রাথমিক ভাবে শৃঙ্খলা বোধের প্রতি অনুরাগী করিবে। গণতান্ত্রিকভাবে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য শৈশব হইতেই

তবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় কারণ অনেক-দিন ভিন্ন আচরণে অভ্যস্ত হইলে শৃঙ্খলার প্রয়োজনের অনুকূল যুক্তিগুলি শিশুচিত্তকে তেমনভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। এইজন্য নার্সারী বিদ্যালয়েই প্রাথমিক শৃঙ্খলাবোধ শিখাইবার ব্যবস্থা রাখা বিধেয়। শিশুরা যাহাকে ভালবাসে তাহার কথা মন দিয়া শোনে অর্থাৎ তাহারা তাহাদের শিক্ষকের দ্বারা অনুকূলভাবে প্রভাবিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতেও নার্সারীর এই সুযোগ-সুবিধা অধিক মাত্রায় পওয়া যায়। এই শ্রেণীগুলিতে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা ও শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহযুক্ত কাজ-কর্ম সহায়ে শৃঙ্খলার শিক্ষা দিতে হইবে।

খুব শৈশবে শৃঙ্খলা শিক্ষার সার্থকতা

ব্যক্তিগত শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাবোধ জাগাইবার ব্যাপারে প্রভবনের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আছে কোনও নূতন ছাত্র আসিলে সেখানে সহজেই সেই শৃঙ্খলায় সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয় কারণ সমগ্র বিদ্যালয় বা শ্রেণী তাহার আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

শৃঙ্খলাযুক্ত বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাবোধ সহজে বিকাশ পায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার লক্ষ্য—সর্বাঙ্গীণ বিকাশ

অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়াই যেমন একটি সুস্থ সম্পূর্ণ মানুষ তেমনি অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ গুণের বিকাশ দ্বারাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে। ইহার একটি দিককে অবহেলা করিলে অন্যান্য দিকগুলিও ঠিকমত বিকশিত হইতে পারে না। যদি কোনও ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল না হয় তবে তাহার মানসিক স্ফূর্তি ব্যাহত হইবে, সে চিন্তাশক্তির তীক্ষ্ণতা হারাইবে, অপরের সহিত ব্যবহারে বিরক্তি অনুভব করিবে এবং কোনও আনন্দদায়ক পরিবেশেও রস আস্বাদন করিতে পারিবে না। অপরপক্ষে সে যদি কম-বুদ্ধি-যুক্ত হয় তবে নানা রোগ ও দুর্ঘটনা এড়াইয়া সুস্থ দেহ রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। জীব জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে অনেক বেশী শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও নানা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী শুধু বুদ্ধি-হীনতার জন্য জীবন যুদ্ধে মার খাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং শুধু শারীরিক বলই সব নহে। তেমনি সুস্থ এবং বুদ্ধিমান মানুষ যদি সমাজের দশজনের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখিতে না পারে তবে তাহার জীবন দুর্বহ হয়। যে মানুষ নানা সুকুমার কলার রস আস্বাদন করিতে পারে না তাহার সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকাশ লাভ করে না ও সে অনেকক্ষেত্রে হিংস্র আচরণ করে—নিজেকে ও অপরকে আনন্দ দান করিতে পারে না। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হইল প্রতিটি ব্যক্তিকে মানুষের বর্তমান অগ্রগতি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সমগ্র মানব সমাজের আরও অগ্রগতির উপযুক্ত প্রেরণা

প্রদান করা। মানুষের বিভিন্নমুখী অগ্রগতি আবার একটির সহিত একটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই একমুখী অগ্রগতি-প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। সকল দিকের গড়পড়তা অগ্রগতি উচ্চ হইলে তবেই সে কোনও বিশেষ দিকে কিছুটা অধিক অগ্রগতি দেখাইতে পারে। ইতিহাস ইহার অনেক সাক্ষ্য বহন করে। রোমানগণ হাতের কাজের দায়িত্ব দাসদের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজদিগকে উচ্চ শিল্পকলা ও গনিত বিজ্ঞানাদি বিষয়ে নিমগ্ন রাখিতে গিয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা চরম বিলাসী, অত্যাচারী ও ভোগ-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে তাহাদের পতন ডাকিয়া আনিয়াছিল। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ ও পরবর্তী যুগে মোগল প্রভৃতি বাদশাহগণও অনুরূপ পরিণতি এড়াইতে পারেন নাই। জীবন সংগ্রামের দায়-দায়িত্বে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করার মধ্য দিয়াই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; উচ্চতর চিন্তন ও শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা ও প্রেরণা লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া শুধু বৌদ্ধিক অগ্রগতিকেই শিক্ষা মনে করিয়া আসিতেছি এবং বিদ্যালয় সমূহে তাহার আয়োজন রাখিয়াছি। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইলেও তখন জীবন এমন ছিল যে কোনও ব্যক্তিই জীবন হইতে কর্মকে একেবারে বাদ দিতে পারিত না। আভিজাত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতশ্রেণী জীবন সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজকর্মগুলি অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল এবং উচ্চতর শিক্ষা বলিতে শুধু বৌদ্ধিক চর্চাকেই গুরুত্ব দিয়াছিল সত্য; কিন্তু এইরূপ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। সত্য বটে তখনও বিদ্যালয়ে তাহারা বৌদ্ধিক শিক্ষাই গ্রহণ করিত কিন্তু গৃহপরিবেশে ও সমাজে তাহারা

কাজকর্ম ও আচার আচরণের বাস্তব শিক্ষা পাইত, বংশ ও কুলগত কৃষ্টি ও সামাজিক সংস্কার শিক্ষার গুরুত্ব তখন কম বিবেচিত হইত না। ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধিক শিক্ষার সাফল্যই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার উপায় হিসাবে বিবেচিত হইতে শুরু করিল ও শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার অগ্রগতি-সম্পন্ন অ-বিকশিত "বাবুদল" সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু গ্রামে সাধারণ মধ্যবিত্তের সন্তানগণ তখনও গৃহস্থের সুখ-দুঃখের অংশীদার হইয়াই থাকিত। ইহারা তাই বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগের সাথে সাথে গৃহ ও সমাজ পরিবেশের জীবনকেন্দ্রী শিক্ষাও লাভ করিত। দেখা যাইবে, যে সমস্ত ব্যক্তি স্বীয় মনীষায় সমাজ ও দেশকে অগ্রগতি দিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশই এইরূপ মধ্য-বিত্তের সন্তান। ইহাই বৌদ্ধিক শিক্ষার সাথে সাথে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশ সমন্বয়ের সার্থকতা সুপ্রমাণিত করে। আজ আমাদের সমাজের নব রূপায়ণ হইতে চলিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারেও আজকাল জীবন-সংগ্রাম-মূলক কাজকর্ম সীমিত হইয়া আসিতেছে এবং গৃহ পরিবেশে শিশু ও তরুণগণকে কোনও কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিতে হয় না। এমন কি মহিলা ও কন্যাদের গৃহকর্মের পরিধিও ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া আসিতেছে এবং যতই নগর-সভ্যতা অগ্রগতি লাভ করিবে ততই এই প্রক্রিয়া অধিকতর প্রকট হইবে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার শুধু বৌদ্ধিক অগ্রগতির আয়োজনের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অন্যান্য বিকাশের আয়োজন রাখিতে হইবে। নতুবা শিক্ষার্থীর জীবন ঠিকমত বিকাশ লাভ করিবে না। এমন কি বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও পঙ্গুতার লক্ষণ অধিক-মাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিবে। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার কোন্

কোন্ দিকগুলির উপর গুরুত্ব প্রদত্ত হওয়া উচিত, এখানে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাউক।

শিক্ষায় বিভিন্নমুখী বিকাশ :—

আমরা মানব শিশুর বিভিন্নমুখী বিকাশ প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি :—

(১) শারীরিক ও কর্মনৈপুণ্যগত বিকাশ,

(২) বৌদ্ধিক বিকাশ,

(৩) হৃদয় বৃত্তি ও প্রক্ষোভিক বিকাশ,

(৪) সামাজিক বিকাশ,

(৫) রুচিবোধ, নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ।

এইরূপ ধারণা আজিও অপ্রচলিত নহে যে এই এক একটি দিকের বিকাশের জন্য পৃথক পৃথক আয়োজন রাখা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। এই দিকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে তাই ইহাদের বিকাশের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। তবে বিভিন্ন কাজকর্ম ও প্রক্রিয়ায় ইহার কোনও কোনওটি বেশী গুরুত্ব পাইতে পারে। নানা শারীরিক কস্‌রতি খেলাধূলা ইত্যাদিতে শরীরের বিকাশ ঘটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি, সমাজবোধ, সুরুচিবোধ ও কিছুটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণেরও বিকাশ ঘটে। উৎপাদনধর্মী ও সমস্যা-সমাধান-মূলক কাজকর্ম দ্বারা কর্ম-নৈপুণ্য, প্রয়োগধর্মী বুদ্ধিবৃত্তি, রুচিবোধ তো বিকাশলাভ করেই; তাহা ছাড়া সহজে মানবপ্রীতি, সমাজপ্রীতি গুণেরও বিকাশ লাভ ইহা দ্বারা ঘটান যায়। সঙ্গীত, অভিনয়, সাহিত্য পাঠ দ্বারা বৌদ্ধিক অগ্র-গতি, সমাজবোধ, নীতিবোধ, অধ্যাত্মবোধ ও সাথে সাথে প্রক্ষোভিক বিকাশ ঘটান যাইবে। বিভিন্ন জীবনাশ্রয়ী কাজকর্মের মধ্য দিয়া শিশুর এই বিভিন্নমুখী বিকাশ ঘটাইয়া তাহাকে সমতাযুক্ত মানুষে

রূপায়িত হইতে সাহায্য করাই তাই শিক্ষার লক্ষ্য হইবে। এইরূপ মানুষ রূঢ় বাস্তব সমস্যাসমূহ সমাধান করিতে সক্ষম হইবে কিন্তু বস্তু জগতকেই ধ্যানজ্ঞান করিবে না ; তাহার নিকট সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতির যথোচিত আবেদন থাকিবে এবং অনন্ত বিশ্ব রহস্য, মানব জীবনের গভীর অনুভূতিসমূহ সকল দিকেই ভাবনা চিন্তনের সজীবতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে।

অনেক শিক্ষাবিদ বলিয়াছেন যে সুখী জীবন গঠন করাই শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু "সুখ" শব্দটিকে যতখানি সহজ নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তাহা নহে। সাধারণ মানুষ তো অত্যন্ত অল্পেই তুষ্ট থাকে এইজন্য তাহারা সহজে সুখী হয়। সভ্যতা মানুষের মনে অনেক নূতন নূতন চাহিদা সৃষ্টি করে এবং ঐ সব চাহিদা পূরণ না হইলে সে অসুখী অনুভব করে। এইজন্য অনেকে সভ্যতার বিস্তার বিরোধী। রুশোর Naturalism এই মূল সুরের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সভ্যতা মানুষকে সুখী করে না সত্য, তবে তাহাকে নূতন নূতন সুখানুভূতির ক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। শিক্ষা এই সভ্যতারই অপর দিক, ইহার প্রয়োগশীল দিক। ইহা মানুষকে নূতন নূতন সুখাস্বাদনের ক্ষেত্র প্রদান করে। জেমস বলিয়াছেন "সুখ একটি ভগ্নাংশ যাহার হর হইতেছে চাহিদা এবং লব হইতেছে প্রাপ্তি।" সাধারণ ভগ্নাংশে লব ও হরকে একই সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে তাহার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু এক্ষেত্রে হর বড় হওয়ার অর্থ জীবনের সুখানুভূতির ক্ষেত্রের বিস্তার সাধিত হওয়া। তাই মানুষের জীবনে সুখ-রূপ চাহিদা প্রাপ্তির অনুপাতকে সমতা সাধনই লক্ষ্য হইতে পারে না—চাহিদার বিস্তার সাধনও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন আনা যায় যে মানুষের লোভাকাঙ্খার শেষ নাই, তাহাকে বৃদ্ধি করিলে উহা তো ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। আর ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঐ চাহিদার অনুপাতে কখনই বাড়িতে পারে না। তাহা হইলে তো মানুষের মধ্যে ভোগ্য বস্তু পাইবার অশুভ প্রতিযোগিতাই বাড়িবে ও পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, অশান্তি প্রভৃতিই বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমান মানব সমাজ ইতিমধ্যেই উক্ত অশুভ প্রবণতায় যথেষ্ট জর্জরিত। শিক্ষা বিস্তার দ্বারা, সভ্যতার চাহিদা বৃদ্ধি দ্বারা উহাকে আর বাড়িতে দেওয়া সম্ভব কি? এই প্রশ্ন অনেকের মনে দেখা দিয়াছে এবং বর্তমান শিক্ষা সভ্যতার একমুখী গতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটি সরাসরি বাতিল করা যায় না। যখন মাত্র বস্তু সাপেক্ষ ইন্দ্রিয় সুখকেই সুখ বলিয়া গণ্য করা হয় তখন সেই সুখলাভের চাহিদা অত্যধিক বাড়িলে অশুভ প্রতিযোগিতা দেখা দিবে ইহা স্বাভাবিক।

কিন্তু মানুষ শুধু বস্তু সাপেক্ষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগেরই অধিকারী নয়। তাহার জন্য চিন্তার ক্ষেত্র, জ্ঞানের ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে এবং ঐ ক্ষেত্রে অশুভ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু সেখানে সাফল্যের জন্য পরস্পর সহযোগিতা ও সম্প্রীতিই অত্যাবশ্যক। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রকে এই মহৎ প্রদেশে বিস্তৃত করা প্রয়োজন। সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান এই ক্ষেত্র প্রদান করে।

তবে শিক্ষা যদি জীবনের প্রাথমিক-প্রয়োজন-বিমুখ হইয়া কেবল চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেয় তবে তাহাও বিফলতা আনিবে, কারণ জীবনের প্রাথমিক চাহিদা না মিটিলে মানুষ উন্নত মানসিকতার স্তরে যাইতেই পারিবে না। Man is a rational animal. তাহার মধ্যে রহিয়াছে animality ও rationality. তাহার জান্তব সত্তার চাহিদা অপূর্ণ রাখিয়া তাহাকে rational

করা যাইবে না। সেক্ষেত্রে তাহার মোটামুটি তৃপ্তি বিধান করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার উদ্বৃত্ত প্রচেষ্টা মহৎ মানবীয় ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সুযোগ পাইবে, নতুবা নহে।

হিন্দু মনিষীগণ মানুষের জান্তব চাহিদাগুলি উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন নিবৃত্তির দ্বারা। ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা ঐহিক সুখ-ভোগের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা এই নিবৃত্তির প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন, কিন্তু বিফল হইয়াছেন। অপর পক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতা ঐহিক সুখকে অধিকতর গৌরব দিয়াছে—ইহাতে তাহারা জীবনের সাধারণ সুখ-সুবিধা ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত অগ্রগতি দেখাইয়াছে কিন্তু প্রতিযোগিতা ও তজ্জনিত হিংসাদ্বন্দ্ব কমে নাই—বাড়িয়াছে। এই দুই বিভিন্ন পন্থার মধ্যে সমতা সাধিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই সমতা সাধনের জন্য জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলিকে স্বীকার করিয়া তাহা প্রাপ্তির সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উচ্চ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটাইতে হইবে। এই দুইটি প্রক্রিয়াকে একই সাথে যুক্ত করিতে হইবে—একটিকে প্রথমে স্থান দিয়া অপরটিকে দ্বিতীয় করা ঠিক হইবে না। দৈহিক ও কর্মক্ষমতার বিকাশ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে। জ্ঞানান্বেষণ ও আনুভূতিক বিকাশ দ্বারা তাহার মানবীয় মহৎ সুখান্বেষণ ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটাইবে ও সমাজবোধ ও নীতিবোধ তাহার এই দুইমুখী বিকাশের সমতা আনিবে—তাহাকে সকলের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথিবে ও পূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্বের অধিকার দিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক

সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের শ্রেষ্ঠ পন্থা শিক্ষাকে জীবনকেন্দ্রী করা

মানুষের জীবনের বিভিন্নমুখী সার্থকতা অর্জনই যখন শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইল তখন ঐ বিভিন্নমুখী বিকাশের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা ভাল। তাই বর্তমানে ডিউই, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ শিক্ষাবিদগণ যে শিক্ষাকে জীবনকেন্দ্রী করার কথা বলিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত। এই আদর্শ অনুযায়ী শিশুরা বিদ্যালয়ে আসিয়া উন্নত ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইবে ও সেই অভ্যাসই তাহাদিগকে উন্নত জীবন যাপনের প্রেরণা যোগাইবে। উক্ত প্রেরণায় ও অভিজ্ঞ আচার্যগণের সাহায্যে তাহারা জীবনের বিভিন্নমুখী বিকাশ লাভ করিবে। তাই ডিউই-এর শিক্ষা সংক্রান্ত সংজ্ঞা "শিক্ষা জীবন যাপনের প্রস্তুতি নহে ; শিক্ষাই জীবন।" ইহা আধুনিক যুগের শিক্ষা সংজ্ঞা হিসাবে খুবই যোগ্য। কিন্তু "জীবন" কথাটি একটি সুস্পষ্ট অর্থ অনেক সময় বহন করেনা—এই বিষয়ে সচেতন হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। শুধু বস্তু সাপেক্ষ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকাই জীবন নহে, জ্ঞান ও চিন্তারাজ্যের অসীম বিস্তারে ডানা মেলিয়া দেওয়া ও মহৎ অনুভূতিসমূহ আস্বাদন করা মনুষ্য জীবনকে যে মহত্ত্ব দিয়াছে তাহা মানবীয় জীবনের কাম্য দিক—এই কথাটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ডিউই তাঁহার কর্ম-সমস্যা-পদ্ধতিতে জ্ঞান ও অনুভূতিকে ঠিক তেমন গুরুত্ব দেন নাই বলিয়া সমালোচিত হন। রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু শিক্ষার এই দিকটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। ডিউই জীবনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়াছেন বটে কিন্তু সামাজিক ন্যায় বোধকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। গান্ধীজী সামাজিক ন্যায় বিচারকে অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন। সামাজিক ন্যায় ব্যতীত ব্যক্তির জীবনে সঙ্গতি আশা করা যায় না; তাই জীবনকেন্দ্রী শিক্ষায় সামাজিক ন্যায়বোধ বিষয়েও সচেতন থাকা প্রয়োজন। এইগুলি মনে রাখিয়া উপরোক্ত তিন মনীষীর শিক্ষা-চিন্তার সহিত সঙ্গতিযুক্ত জীবনকেন্দ্রী শিক্ষা দ্বারা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়।

শিশু কেন্দ্রিকতা

শিক্ষার জীবনকেন্দ্রীকরণের সার্থকতা মানিয়া লইলে শৈশবের শিক্ষাকে শুধু ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে দেখা চলেনা; কারণ যে শিক্ষা শিশুর শৈশব কালের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে তাহা শিশুর শৈশব ছন্দকে ব্যাহত করে, তাহাকে নিরানন্দ করে। ফলে জীবনের একটি বিশিষ্ট পর্যায় উপেক্ষিত হয়। তাই জীবন-কেন্দ্রী-শিশু-শিক্ষাকে সঙ্গে সঙ্গে শিশুকেন্দ্রীও হইতে হইবে অর্থাৎ ঐ শিক্ষা শৈশবের চাহিদার অনুপূরক হইবে—তাহার বিরোধী হইবে না। কিছুকাল পূর্বেও শৈশবের চাঞ্চল্য, শিশুর বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে শিক্ষার অন্তরায় বলিয়া গণ্য করা হইত এবং প্রথম পাঁচটি বৎসর কাটিলেই তাহার শিশু-সুলভ কৌতূহল ও কর্মপ্রবণতাকে "তাড়না দ্বারা" স্তব্ধ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসিবে এমন সব জ্ঞান ও কলা-কৌশল আয়ত্বে লিপ্ত রাখার চেষ্টা হইত ও উহাকেই "শিক্ষা" বলা হইত।

ইহার বিরুদ্ধে কমিনিয়াস, রুশো প্রভৃতি শিক্ষাবিদ প্রথমে প্রতিবাদ করেন। তন্মধ্যে রুশোর প্রতিবাদই ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে রুশো ছিলেন "প্রকৃতিবাদী"। তিনি মনে করিতেন যে প্রকৃতি শিশুর পরিণতির একটি ছন্দ বাঁধিয়া দিয়াছে; সেই ছন্দ অনুযায়ীই শিশু বড় হয়। তাহার বিরুদ্ধে গেলে শিশু কৃত্রিম মানুষ হয়—ঠিক মানুষ হয় না। এই জন্য তিনি শৈশবে কিছু শিখাইবার বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী শিক্ষাবিদগণ রুশোর এই "নঞত্বক" শিক্ষামত পুরাপুরি গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু শিশু প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতাগুলির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দিয়া শিশুশিক্ষা পদ্ধতি রচনায় যত্নশীল হইয়াছেন। শিক্ষক শিশুকে শিখাইবেন, শিশু শান্ত সুবোধ হইয়া শিখিবে—পূর্বে ইহাই ছিল শিক্ষাদর্শ। কিন্তু পরে শিক্ষাবিদ-গণ এই সত্য উপলব্ধি করিলেন যে শিশু না শিখিলে তাহাকে শেখানো সম্ভব নয়—শিক্ষক মাত্র সহায়ক হইতে পারেন। সুতরাং শিশু যাহাতে শিখিতে উদ্বুদ্ধ হয় তাহার আয়োজন করিবার প্রয়োজন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তখন প্রশ্ন আসিল শিশু কি শিখিতে চায়, উহার কতটুকু তাহার পক্ষে শেখা সম্ভব ও কোন্ কৌশলে শিক্ষা দিলে সে ঐ শিক্ষাকার্যে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করিতে সক্ষম হইয়া শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে ইত্যাদি। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতিকে শিশুকেন্দ্রী করিবার চেষ্টা দেখা দিল। পেষ্টালৎসি, ফ্রয়েবল, মণ্টেসরী প্রভৃতি শিক্ষাবিদের শিক্ষা চিন্তায় ইহার প্রতিফলন দেখি।

কিন্তু শুধু শিশুর ভাল লাগে ও শিশু সহজে পারে—এই বিচারই একমাত্র বিচার হইতে পারে না। তাহার শৈশবের আনন্দও যেমন মূল্যবান শৈশব অতিক্রমনান্তে সার্থকভাবে কৈশোর ও

যৌবনে পদার্পনকালে সমাজের সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া সার্থক মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনও তেমনি মূল্যবান। এইজন্য শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবণতাগুলিকে ধীরে ধীরে এমন পথে বিকশিত করিতে হইবে যেন তাহা বয়স্ক মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ-কর্তব্যসমূহের উপযোগী হইয়া উঠে। শৈশবের খেলাধূলার মধ্যে শিশু যে স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে সেই শিশু যেন বড় হইয়া ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধি ও সমাজ-কর্তব্য সাধনের উপযোগী কাজ-কর্ম ও মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চারুকলা-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতিতেও তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে থাকা প্রয়োজন। ডিউই, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা এই শেষোক্ত দিকটিকে যথেষ্ট বিকশিত করিয়াছে।

সমাজ কেন্দ্রিকতা

সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির জীবন অসম্পূর্ণ, এমন কি অসম্ভব। মানুষ ছিল অথচ সমাজ ছিল না এইরূপ দৃষ্টান্ত এমন কি নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ হইতেও পাওয়া যায় না। রুশো তাঁহার Social contract theoryতে মানুষ দ্বারা সমাজ রচনার সচেতন প্রচেষ্টার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণের ধারণা মানুষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রবণতা হইতে অতি আদিম স্তরেই সমাজ বদ্ধ হইয়াছিল এবং সমাজবদ্ধতাই তাহাকে বিরূপ প্রতিবেশের সহিত দ্বন্দ্বে সাফল্য লাভ করিয়া টিকিয়া থাকিতে প্রধান সাহায্য দিয়াছে। তাহার পরে মানুষের যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে তাহারও প্রধান প্রেরণা সমাজ।

কিন্তু সমাজের একটা স্থিতিশীল প্রেরণা আছে যাহা দ্বারা অনেক সময় অগ্রগতি-সম্পন্ন-ব্যক্তিত্ব ব্যাহত হয়। তাই ব্যক্তিত্বের

সহিত সমাজের একটা দ্বন্দ্বের সম্পর্কও আছে। অনেক সময় সমাজের রীতিনীতির সহিত সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের অসঙ্গতি দেখা দেয় ও ঐরূপ সময়ে সমাজবিধির বৈশদৃশ্য ঘটে। তখন অসুবিধা-ভোগকারী শ্রেণী ঐ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী হইয়া উঠে ও সমাজ ব্যবস্থার ওলট-পালট ঘটায়। ঐরূপ সময়ে অনেকে সমাজের প্রতি বীতরাগী হইয়া উঠেন। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর ইউরোপে ব্যক্তি চেতনার সহিত তদানীন্তন গতানুগতিক সমাজ-রীতি-পদ্ধতির ঐরূপ তীব্র বিরোধ দেখা দেয় ও তাহারই ধুয়া ধরিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকার বোধ প্রাধান্য পায়। এই যুগের ধারণা হইতে শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি অত্যন্ত প্রাধান্য পায়। ফ্রয়েবল প্রভৃতি শিক্ষাবিদ তাই মনে করিতেন শিক্ষা হইবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ প্রক্রিয়া। প্রতিটি শিশু বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাই শিক্ষা হইবে ব্যক্তিকেন্দ্রী। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার চিন্তা প্রবল ছিল। কিন্তু ডিউইএর শিক্ষাচিন্তায় গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রাধান্য পাইয়াছে ও গান্ধীজীর শিক্ষাচিন্তায় সমাজকেন্দ্রিকতা আরও বিকশিত রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও তিনি সমাজ-কল্যাণ-বোধকে ত্যাগ করেন নাই। "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো" অথবা, "নিখিল জগৎ জনের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে" প্রভৃতি গানের কলিতেও তাঁহার এই চিন্তা দেখা যায়। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ব্যক্তিকে সমাজের সভ্য হিসাবে বিকশিত করিবার আরও সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। তাই ব্যক্তির স্ফুরণ ও অগ্রগতি উপেক্ষা করিলে সমাজ পঙ্গু হইয়া পড়িবে। ব্যক্তিত্বকে একেবারে

দাবাইয়া দিলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে, তাহা গতানুগতিক হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে সমাজ-কল্যাণ-বোধ যথাযথ ভাবে বিকশিত করা একান্ত প্রয়োজন নতুবা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রণহীন হইয়া পড়িবে ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং ভাল শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দুইটি দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এইরূপ সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এখানে শৈশব হইতেই শিশুদিগকে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। তাহারা নিজেদের খুশিতে যাহা সৃষ্টি করে তাহাই সমাজ-কল্যাণে নিযুক্ত করিতে চাহে এবং ধীরে ধীরে তাহারা সমাজ-কল্যাণ-কর্ম ও নিজেদের-খুশিমত-কর্ম—এই দুইটির একতা সাধন করিতে সক্ষম হয় অর্থাৎ যাহাতে সমাজ-কল্যাণ ঘটে সেইরূপ কর্ম সম্পাদন করিয়াই তাহারা আনন্দিত হয়। এইভাবে ব্যক্তিত্বের প্রবণতা ও সমাজ-কল্যাণের সামঞ্জস্য বিধান তাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও বৃহত্তর সমাজ

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকেই একটি আদর্শ সমাজ রূপে সংগঠিত করিতে হইবে। এই সমাজ ক্ষুদ্র এবং নিয়ন্ত্রিত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। এখানে শিশুরা পরস্পর মিলিতভাবে উন্নত যৌথ জীবন গঠন করিবে। খুব ছোট শিশুরা খেলাধূলা, হাসি, আনন্দ ও স্বাভাবিক কৌতূহল নিরসন প্রভৃতির প্রেরণাযুক্ত কাজ করিবে কিন্তু যত বড় হইবে ততই তাহাদের সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজনীয় কাজগুলিও সানন্দে যৌথভাবে করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। তাহাদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিটির সমান অধিকার, সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে তাহারা

শিখিবে ও সমাজগত ভাবে প্রত্যেকের সুবিধা-অসুবিধা, ঝোঁক, প্রবণতাগুলি যতদূর সম্ভব ও সঙ্গত, মান্য করিবে। তাহাদের সমাজ বিধি রচনায় তাহারা বৃহত্তর সমাজকে বিচার করিবে ও গ্রহনীয়গুলি অনুসরণ করিয়া বর্জনীয়গুলি বর্জন করিবে। এইভাবে তাহারা বুদ্ধিবিচার ও আচরণ উভয় দিকেই প্রচলিত বৃহত্তর সমাজ অপেক্ষা উন্নত সমাজ জীবন যাপনের মধ্য দিয়াই ভবিষ্যৎ উন্নত সমাজ রচনার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিবে। তাহারা তাহাদের উন্নত সমাজ দৃষ্টির আলোকে বৃহত্তর সমাজে যে দোষত্রুটি দেখিবে তাহাদের ক্ষুদ্র সামর্থ অনুসারে তাহার সংশোধন-প্রয়াসী হইবে। এই কার্যে তাহারা অবশ্যই তাহাদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিষয়েও সচেতন থাকিবে এবং যতদূর সম্ভব বিনয়ী হইবে—কিন্তু গতানুগতিক প্রথা হিসাবে কিছু মানিয়া না লইয়া বিচার বিবেচনা করিয়া তবে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করিবে। বৃহত্তর সমাজের দোষত্রুটির জন্য অহেতুক ক্রোধ ও উচ্চমন্যতার বশীভূত হইবে না—সবিনয়ে ও সপ্রেমে তাহা বিদূরণ প্রয়াসী হইবে। এইভাবেই বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজকে ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ করিবে ; কোনও doctrinare দ্বারা নহে। যুক্তি ও আচরণই হইবে ঐ পরিশোধনের ভিত্তি। ইহাই বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজ কেন্দ্রিকতা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই গান্ধীজী ইহাকে Silent Social Revolutionএর process বলিয়াছেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের জন্যই বুনিয়াদী-বিদ্যালয়-রূপ-সমাজের সহিত বৃহত্তর সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা দরকার। উভয়ের মধ্যে থাকিবে প্রেমের সম্পর্ক, পরস্পরের আদান প্রদানের সম্পর্ক, পরস্পরকে বোঝার সম্পর্ক, আবার সপ্রেম দ্বন্দ্বের সম্পর্কও বটে।

বৃহত্তর সমাজের ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়া পরিবর্জন করার মত বিচার-শীলতা ও চরিত্র-বলিষ্ঠতা অর্জন করিতে সাহায্য করাও তাই বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুগণ সমাজকে ভালবাসিবে ও যখনই সুযোগ সুবিধা পাইবে সেই সমাজের কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতে প্রয়াসী হইবে। আর ঐ কাজের মাধ্যমে তাহারা বৃহত্তর সমাজকে বুঝিতে ও বিচার করিতে শিখিবে। তাহারা বৃহত্তর সমাজের ব্যক্তিগণকে নানা ব্যাপারে বিদ্যালয়ে আহ্বান করিবে ও তাঁহাদের নিকট যে গুণ ও শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহা গ্রহণ করিবে। শিক্ষকগণ এই ব্যাপারে শিশুদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিবেন।

বিদ্যালয়ের উন্নত সমাজ জীবন রচনাতেও শিক্ষকগণকে আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। সেইজন্য তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখিবেন ও যৌথ দায়িত্ব প্রতিপালনের আদর্শ স্থাপন করিবেন। তাঁহারা দায়-দায়িত্ব বণ্টন করিয়া লইয়া সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ করনীয় সম্পাদন করিবেন ও অপরের কার্যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিবেন। অপরের ত্রুটি সংশোধন ব্যাপারে তাঁহারা সহনশীলতা ও ত্রুটি সংশোধনের প্রতি আগ্রহ এই উভয়ের সমতা প্রদর্শন করিবেন এবং বিদ্যালয়কে একটি ক্রম-অগ্রগতিশীল, সহানুভূতিময়, আনন্দময় সমাজের রূপ দিতে যত্নশীল হইবেন।

শিক্ষকগণকেও বৃহত্তর সমাজের সৎ নাগরিক হইতে হইবে ও বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ চিন্তায় ব্রতী হইতে হইবে। তাঁহারাও বৃহত্তর সমাজের দোষত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিমত চিন্তায় ও আচরণে প্রকাশ করিবেন কিন্তু দম্ভ প্রকাশ করিবেন না। তাঁহাদের আচরণের সামঞ্জস্যই শিশুদিগকে সহনশীল সমাজ-সংস্কারকের শিক্ষা লাভে সাহায্য করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

কর্মকেন্দ্রী শিশু-শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা :—

শিশুরা কর্মচঞ্চল। তাহারা খেলা করিতে যে ভালবাসে তাহাই তাহাদের কর্মচাঞ্চল্যের প্রমাণ। কিন্তু ইহাও দেখা যাইবে যে অপরের হুকুমদারীতে কাজ করিতে তাহারা তেমন পছন্দ করে না। শিশু কেন বয়স্কগণও তাহা করেন না। শিশুদের কাছে কাজ আর খেলার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ইহাই যে তাহারা নিজের ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই তাহাদের কাছে খেলা আর অপরের হুকুমদারীতে যাহা করে তাহা কাজ। যদি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রেরণা সঞ্চার করিবে এমন সুন্দর কর্ম-পরিবেশ রচনা করিতে পারা যায় তাহা হইলে শিশুরা স্বাভাবিক প্রেরণা বশেই ঐ কাজ করিবে ও উহা তাহাদের নিকট খেলার মতই আনন্দদায়ক হইবে। তাহারা ঐরূপ স্বাভাবিক প্রেরণাবশে কাজটি গ্রহণ করার পর ধীরে ধীরে কাজটির সমাজগত মূল্য ও অন্যান্য সুবিধাগুলি তাহাদের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের ঐ প্রাথমিক আকর্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করিবে। সাধারণতঃ শিল্প কাজগুলির সুসম্পাদনায় অনেক বেশী ধৈর্য, হিসাব-বোধ, সতর্কতা ও তৎপরতার প্রয়োজন হয়। শিশুর পক্ষে উহা তাই আয়ত্তসাধ্য হয় না ও তাহারা উহা অপছন্দ করিতে সুরু করে। যেমন সূতাকাটা। ইহার সহজ প্রক্রিয়াগুলিই শিশুকে প্রথমে দিতে হইবে। উদ্যান রচনাতেও ফুল-ফল চয়ন, আগাছা তোলা, জলসেচন প্রভৃতি সহজসাধ্য কাজ দিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম

নির্বাচনের সুযোগও সম্ভবমত দিতে হইবে এবং কর্ম সম্পাদনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমন হইবে যাহাতে কর্মগুলির সম্পাদনা সহজ হয়। তাহা ছাড়া বড়রা স্ফূর্তির সহিত ঐ কাজগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে দেখিলে শিশুরা উহা করিতে প্রেরণা পাইবে কারণ শিশুরা বড়দের অনুকরণ করিতে ভালবাসে।

ঐরূপ উৎপাদনাত্মক কর্ম শিশুর কর্মক্ষমতা, হিসাববোধ ও সামাজিকতার বিকাশ ঘটাইবার ব্যাপারে সাহায্য করিবে ও তাহার ধৈর্য, তৎপরতা প্রভৃতি কর্মীসুলভ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাইবে। কিন্তু ইহা ছাড়াও সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, খেলনা তৈরী, গৃহ-সজ্জার দ্রব্য তৈরী, অভিনয়-সজ্জা তৈরী প্রভৃতি সৃজনধর্মী কাজও দিতে হইবে—যেন তাহাদের সৌন্দর্য ও রুচিবোধ, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি প্রক্ষোভমূলক দিকগুলিও বিকাশের সুযোগ পায়। আবার কোনও একটি ধরণের কাজ অপেক্ষা অন্য ধরণের কাজকে যেন তাহারা অপছন্দ না করে সেইজন্য সৃজনধর্মী ও উৎপাদনধর্মী এই দুই রকম কাজের সংমিশ্রণ ব্যবস্থা রাখা হইবে সর্বোত্তম পথ। বাগান তৈয়ারীর কাজে বাগান তৈয়ারী করিয়া তাহাকে সুন্দর, সুদৃশ্য ও ফলপ্রদ করার ব্যাপারে শিশুকে আগ্রহী করিয়া তোলা; কাঠের দ্রব্য নির্মাণে ঐ দ্রব্যের উপর নক্সাদি অঙ্কন করা—এই রকম উৎপাদনধর্মী কাজের সহিত সৃজনধর্মী কাজের মিশ্রণ ঘটাইলে শিশু উহার সব প্রক্রিয়াগুলিতেই সমান আনন্দ পাইবে। শিশুরা চিত্রাঙ্কন করিবে ও তাহাদের চিত্রাঙ্কন করার খাতাটি নিজেরা বাঁধিয়া লইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিলে সুন্দরভাবে খাতা বাঁধানো ও মনোমত ছবি আঁকা এই উভয় প্রক্রিয়াতেই শিশু সমান আগ্রহ দেখাইবে। এইভাবে সৃজনাত্মক কাজ ও উৎপাদনধর্মী কাজের পার্থক্য অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইবে।

শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সহিত কর্মক্ষমতা, বিষয়বুদ্ধি, রুচি, প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে। তাহাদের কর্ম নির্বাচনে এই বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—যেন প্রক্রিয়াগুলি তাহাদের ক্রমবিকাশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তন করা যায়। এক-ঘেয়েমী কর্মের অনুরুক্তি ব্যাহত করে ও mechanical কাজ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সহায়ক হয় না। এইজন্য প্রক্রিয়াসমূহের ক্রম-পরিণতি ও পরিবর্তনশীলতা প্রয়োজন। শিশুরা কাজ করিতে গিয়া সব সময়েই যেন পরীক্ষা নিরীক্ষার মত মনোভাব বজায় রাখিতে পারে তাহা দেখা প্রয়োজন। বাগানের কাজে এই দিক হইতে শিল্পকাজ অপেক্ষা সুযোগ অনেক বেশী তবে শিল্পকাজেও শিক্ষক অবহিতি প্রদর্শন করিলে ইহার যথেষ্ট সুযোগ খুঁজিয়া পাইবেন। শিক্ষক নিজে এইরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার মনোভাব রাখিলে তাহা শিক্ষার্থীর মধ্যে সংক্রমিত করা সহজসাধ্য হইবে।

কর্ম সম্পাদনের সময় ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কাজগুলির সুসম্পাদন অবশ্যই গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবার যোগ্য কিন্তু ঐ কর্ম সম্পাদনায় শিশুর নানা দিকের বিকাশ তদপেক্ষা কম গুরুত্বসম্পন্ন নহে। কর্মের সুসম্পাদন করাই শিশুর অনেকগুলি গুণের বিকাশ ঘটায় সত্য কিন্তু সহযোগিতা, সামাজিকতা, বৌদ্ধিক বিকাশ প্রভৃতি দিকগুলির জন্য শিক্ষকের বিশেষ অবহিতি একান্ত প্রয়োজন।

কর্মের সহিত সম্বন্ধিত ভাবে বৌদ্ধিক শিক্ষা :—

কর্মের আচরণমূলক দিকটি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে কর্ম নির্বাচন ও সম্পাদন কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাহা ছাড়া বৌদ্ধিক বিকাশ দ্বারাই মানুষের যে কোনও পরিবেশে

অভিযোজন ক্ষমতা বিকশিত হয়। সুতরাং শিক্ষায় বৌদ্ধিক বিকাশের দিকটিকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। অনেকের ধারণা কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় বৌদ্ধিক বিকাশ উপেক্ষিত হয় এবং অনেক সময় শিক্ষকের অনবধানতাহেতু ইহা ঘটিতেও পারে। কিন্তু কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাদর্শে ইহাকে উপেক্ষা করার কথা চিন্তাও করা হয় নাই। কেবল বলা হইয়াছে যে আচরণ ব্যতীত বৌদ্ধিক বিকাশ বন্ধ্যা। উপরোক্ত বিচারে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় শিশুর আচরণের দিকটির সহিত বৌদ্ধিক বিকাশের দিকটিতেও যথেষ্ট অবহিতি প্রদর্শন করিতে হইবে।

তাই কাজ করিতে গিয়া কিভাবে বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটিবে তাহা শিক্ষকের ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

কোন কাজ সুসম্পাদনার জন্য (১) প্রথমে কাজটির প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। (২) তৎপরে উহা সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। (৩) তৎপরে উহা সুসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা, কুশলতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। (৪) সর্বশেষে সম্পাদিত কাজটি বিচার করিয়া উহার অপূর্ণতাসমূহ বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাই ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পাদনে অধিকতর বিচক্ষণতা লাভের সহায়ক হইবে। ইহার ১ম, ২য় ও ৪র্থ স্তর অনেকখানি বৌদ্ধিক বিকাশ প্রদান করিতে পারে। ১ম স্তরে কাজটির সহিত ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সম্পর্ক হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বৌদ্ধিক বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং ঐ উপলক্ষ্যে পুস্তক পাঠ ইত্যাদি দ্বারা ভাষা-জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় স্তরে গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করা সহজ হয়। তৃতীয় স্তরে স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অবহিতি বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ স্তরে

পুনরায় ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধির অবকাশ ঘটে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। বিদ্যালয়ের নিকটে একটি জঙ্গল আছে। ঐরূপ জঙ্গল থাকার সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে যদিও উদ্ভিদগণ সাধারণভাবে আমাদের উপকারই করে কিন্তু জঙ্গলটি অসৌন্দর্য, পোকামাকড়ের উৎপাত প্রভৃতি হেতু অধিক অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে। তখন পরিকল্পনা লওয়া হইল যে উহা কাটিয়া বাগানে পরিণত করা হইবে। এই জঙ্গল কাটিয়া বাগান করার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে শিশু সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অনেকখানি জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। তৎপরে স্থানটি পরিষ্কার করিয়া বাগান করিতে কতজন কত সময়ে উহা করিতে পারিবে, বাগানে কি গাছ থাকিবে, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের কি ব্যবস্থা হইবে এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে গিয়া শিশুরা গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিখিবে। উপরোক্ত ভাবে কাজের প্রয়োজনে বৌদ্ধিক শিক্ষাকেই সাধারণ ভাবে সম্বন্ধিত জ্ঞান (Correlated knowledge) বলে। উপরের উদাহরণটি একটি কর্ম সমস্যা (Project) ধরণের কাজ—যাহা ডিউই শিক্ষা-দর্শের অনুযায়ী কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাতেও যাহার স্থান আছে। শুধু কাজটির সম্পাদনার জন্যই যখন বৌদ্ধিক জ্ঞানকে সীমিত রাখা হয় তখন সেই সম্বন্ধিত জ্ঞানকে বলা হয় Integrated Knowledge বা সাঙ্গীকৃত জ্ঞান। কিন্তু ঐ কাজ করিতে গিয়া শিশু-মনে অনেক প্রশ্ন আসিতে পারে যাহা ঐ কাজটির সম্পাদনের সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কযুক্ত নহে কিন্তু যাহার সহিত কাজটির সম্পর্ক আছে বলিয়াই শিশুর জিজ্ঞাসার সীমানায় পড়ে। যেমন—"বাগানের গাছে বেড়া দিতে হয়;

জঙ্গলের জন্য বেড়া দিতে হয় না কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে শিশুরা হয়তো উদ্ভিদের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার কৌশল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিল। ইহা Integrated Knowledge নহে কিন্তু সম্বন্ধিত। বিনোবাজী Integrated Knowledgeকে "সমবায়" বলিয়াছেন।

উপরের দুই ধরনের শিক্ষার মধ্যে মূলগত পার্থক্য তেমন কিছু নাই—শিশুর জ্ঞান গ্রহণই হইবে প্রধান বিচার্য। Integrted Knowledge এ জ্ঞানাগ্রহ জন্মানো অনেক ক্ষেত্রে যতটা স্বাভাবিক Correlated Knowledgeএ ততটা নহে। যখন প্রসঙ্গটি স্বাভাবিক ভাবে আসে ও শিশুর আয়ত্তসাধ্য হয় তখন কিন্তু Correlated Knowledge কোনও ভাবেই Integrated Knowledge অপেক্ষা কম যোগ্যতাসম্পন্ন নহে। Correlated Knowledgeকে তাই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় (১) Co-lateral Correlation—যাহা Integrated Knowledgeএর সম পর্যায়ের অর্থাৎ যাহা কাজের সহিত ওতঃপ্রোত সম্পর্কযুক্ত। (২) Unilateral Correlation—ইহার সহিত কাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক না হইলেও উপরের উদাহরণটির মত জ্ঞানটির সহিত কাজের সম্পর্ক বেশ নিকট। (৩) Multilateral Correlation—এখানে কাজের সহিত যে সম্বন্ধিত জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অপর একটি নূতন জ্ঞানে পৌঁছান—এইভাবে ক্রমশঃ অগ্রগতি বুঝায়। উপরের উদাহরণে প্রথমে উদ্ভিদের আত্মরক্ষার কথা হইল ও উহা হইতে জীবের আত্মরক্ষার প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল ও তৎপরে উদ্ভিদ ও জীবের পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রশ্ন আনা হইল—এই ভাবে অনেক জ্ঞানের অবতারণা করা চলে। ইহা কিন্তু অনেক সময়েই শিশুর আগ্রহ-সৃষ্টি-সহায়ক হয় না এবং কাজটি

শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞানের উপলক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে কর্মকে বৌদ্ধিক শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে কাজের পরিকল্পনা রচনায় ও সম্পাদনে বেশ সচেতনতার প্রয়োজন। নতুবা শুধু যান্ত্রিক ভাবে কর্ম সম্পাদন হইবে। বৌদ্ধিক জ্ঞানের পরিবেশনের অবকাশ ঘটিবে না। তাই কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় কাজের ও সম্বন্ধিত পাঠের পূর্বপরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী।

নবম পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ ও কাজের পরিকল্পনা রচনা

পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :—

পরিকল্পিত কাজ যে অপরিকল্পিত কাজ অপেক্ষা সুসম্পাদিত হইবে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। বর্তমানে তাই কি ব্যক্তিগত কাজকর্ম, কি সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজকর্ম, পরিকল্পিতভাবে সম্পাদনের রীতি-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাপারে পরিকল্পনার সার্থকতা অনেক পূর্বেই স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। সাধারণ বিদ্যালয়সমূহেও মাসে অথবা Termএ কি কি বিষয়বস্তু শ্রেণীতে শেখান হইবে তাহা স্থিরীকৃত থাকে। তাহা ছাড়া ভাল শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠ-টীকা রচনা করেন। ঐরূপ পরিকল্পনাকালে শিক্ষক তাঁহার পাঠটি পূর্বাহ্নে ভাবিয়া লইয়া কোন্ কৌশলে উহা পরিবেশন করিলে শিশুর অনুধাবনের অসুবিধাগুলি দূর হইবে সে বিষয়ে তৎপর হইতে পারেন এবং নিজেও শিশুদের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নানা আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য জানিয়া লইয়া প্রস্তুত অবস্থায় শ্রেণীর সম্মুখীন হইবার সুযোগ পান। মানসিক প্রস্তুতি থাকা হেতু তাঁহার আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। ফলে তাঁহার পাঠদান অধিকতর প্রাঞ্জল হয়।

কিন্তু কর্মকেন্দ্রী বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিকল্পনার স্থান শুধু ঐটুকু দিয়াই বিচার করা যায় না। পুস্তককেন্দ্রী শিক্ষায় কোন্ বৌদ্ধিক বিষয়টি কোন্টির পরে শেখানো হইবে ও তাহার জন্য পূর্বের কোন্ কোন্ পাঠের সহায়তা লইতে হইবে তাহা প্রায় পূর্ব নির্ধারিত হইয়াই থাকে—তাই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞ শিক্ষক পাঠ

পরিকল্পনায় তেমন প্রয়োজন আর অনুভব করেন না। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মপ্রধান এবং পরিকল্পনা ব্যতীত কোনও সম্পাদ্য-কর্ম সুসম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। তাহা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বৌদ্ধিক বিষয়সমূহ পুস্তকে আছে বলিয়া শিখিতে হইবে এইভাবে শিশুদের নিকট উপস্থাপিত করা হয় না। কাজ অথবা জীবনের কোনও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে অথবা তাহা হইতে উদ্ভূত কৌতূহল নিবৃত্তির প্রেরণা দিয়া শিশুদিগকে পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহী করিয়া তোলা হয় ও সেই আগ্রহকে ভিত্তি করিয়াই পাঠ্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়।

সুতরাং কাজটির উপস্থাপন কৌশল, কাজটির অন্তর্নিহিত সমস্যা উদ্ঘাটন কৌশল এবং কোনও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ কৌশলের উপরই পাঠ্য বিষয়ের অবতারণা ও আগ্রহসৃষ্টি নির্ভর করিবে। এইজন্য শিক্ষকের পূর্বাহ্ণেই ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখা অর্থাৎ পরিকল্পনা করা ঐ কৌশলে পাঠদানের পক্ষে অর্থাৎ সম্বন্ধিত সাঙ্গীকৃত পাঠদানের পক্ষে অপরিহার্য।

অবশ্য উপরের আলোচনা হইতে এই কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে কাজটি হইতে নানা কৌশলে বৌদ্ধিক শিক্ষার অবতারণা করিয়া সম্বন্ধিত পাঠ দানই বুনিয়াদী শিক্ষায় "কাজ" রাখার প্রধান সার্থকতা। কাজকে ঐভাবে দেখা ঠিক নহে। কিন্তু কাজটিকে বৌদ্ধিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া শুধু যান্ত্রিক ভাবে কাজ করিলে কাজটির অগ্রগতি সুষ্ঠুভাবে হইবে না—তাই কাজটির সহিত সহজ-সম্বন্ধ-যুক্ত বৌদ্ধিক বিষয়সমূহের ঠিকমত অবতারণা কাজটি শিক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয়। শিশুরা খাতা বাঁধার জন্য আঠা তৈয়ারী করে। আঠা তৈয়ারী করার সময় ময়দার সঙ্গে কিছু তুঁতে মিশান হয়। শিশুদিগকে প্রথা হিসাবে ঐ তুঁতে মিশান শেখানো যায় অথবা

বিশেষভাবে তুঁতে দিবার সার্থকতা বলিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবর্তে যদি একটি পূর্বের বাঁধা কীটদষ্ট খাতা দেখাইয়া কেন উহা কীটদষ্ট হইয়াছে ও ঐ ত্রুটি বিদূরনের উপায় কি এই সমস্যা শিশুদের নিকট রাখিয়া তাহাদের আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া এমন কি তাহাদের সাহায্য লইয়া সমাধান হিসাবে তুঁতের প্রয়োগ বিষয়টি উপস্থাপিত হয়, তাহা শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ সহায়ক হইবে ও ঐ প্রসঙ্গে শিশুরা অন্যান্য বীজাণুনাশক ব্যবস্থার বিষয়েও সহজে আগ্রহী হইয়া অনেক বেশী জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে পারিবে। ঐভাবে কাজকে উপস্থাপিত করার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ঠ চিন্তা করিতে হয় ও তাঁহার পাঠের জন্য পূর্বপরিকল্পনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনশীলতা ও ছুটি প্রভৃতি অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া কোন্ সময়ে কোন্ কাজ করিতে হইবে, তাহার জন্য কি উপকরণ লাগিবে, কাজটির উদ্দেশ্য কি, উহা সম্পাদনের জন্য কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা লইতে হইবে ও সম্পাদনের জন্য কত সময় লাগিবে ইত্যাদি পূর্বাহ্ণে ঠিক করার প্রয়োজন তো রহিয়াছেই। সুতরাং কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ :—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ধরণের কাজগুলি শিশুরা করিবে :—(ক) দৈনন্দিন সম্পাদ্য কর্ম, (খ) বিশেষ বিশেষ সাময়িক কর্ম, (গ) উৎপাদনাত্মককর্ম ও শিল্পকর্ম ইত্যাদি।

(ক) দৈনন্দিন সম্পাদ্য কর্ম—সাফাই, শ্রেণী সজ্জা, আবহাওয়ার রিপোর্ট লইবার জন্য পর্যবেক্ষণাদি, সংবাদ পত্র হইতে সংবাদ লেখা বা পড়া, প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি রাখা ও উহা

ঝাড়া মোছার কাজ, পুস্তকাগারের পুস্তকাদি আদান প্রদানের কাজ, উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও বিক্রয়াদির কাজ, দৈনন্দিন বাগান সংরক্ষণের কাজ।

(খ) বিশেষ বিশেষ সাময়িক কর্ম—উৎসব পালনের প্রস্তুতি ও উৎসব পালন, বিশেষ ভাবে প্রদর্শনী সাজানোর কাজ, বিশেষ দিবস বা সপ্তাহ পালন হিসাবে সমাজ-সেবা-মূলক কাজ, বিদ্যালয়ের কোনও সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রোজেক্ট বা সমস্যা-সমাধান-মূলক কাজ।

(গ) উৎপাদনাত্মক কাজ ও শিল্প কাজ—বাগানের ফসল বসান ও তোলার কাজ, সূতাকাটা, কাঠের কাজ ইত্যাদি।

প্রথম ধরণের কাজ দৈনন্দিন সময়-পত্রিকা অনুসারে দলগত ভাবে সম্পন্ন করিবে এবং প্রতি মাসে দল বিভাগ ও পরিকল্পনা রচনা করিলেই চলিবে। এখানে কাজগুলির একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া যাউক।

সাফাই—ইহা বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজনীয় সুঅভ্যাস গঠনের জন্য। এই কাজের জন্য একজনকে এক মাসের বা সপ্তাহের ভার দেওয়া যায় ও তাহার পরিকল্পনাধীনে প্রতি শ্রেণীর একটি দলকে নিযুক্ত করা যায়। ভারপ্রাপ্ত শিশু মাসের কাজের পরিকল্পনা রচনা করিয়া শ্রেণীর সম্মুখে রাখিবে ও তাহার দায়িত্ব ভার সমাপ্তির দিন ঐ সময়ের কাজের বিবরণী দিবে। তাহার অভিজ্ঞতা হইতে বিভিন্ন বৌদ্ধিক ও প্রয়োগগত প্রশ্ন বৌদ্ধিক জ্ঞানের ভিত্তি হইতে পারিবে।

প্রার্থনা—ইহা শিশুদের একতাবোধ, উচ্চ আদর্শ-দ্যোতক মনোভাব সৃষ্টি, ছন্দবোধ প্রভৃতির উন্মেষ সহায়ক। ধর্মীয় প্রার্থনা

অপেক্ষা মানবতাবোধ ও দেশাত্মবোধ উন্মেষকারী সঙ্গীতাদি হওয়াই ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বাঞ্ছনীয় এবং সঙ্গীতগুলি শিশুদের বোধগম্য হয় এইদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। মহাপুরুষদের বাণীপাঠও উহার অঙ্গ হইতে পারে। শিক্ষক সঙ্গীত ও বাণী নির্বাচনে সহায়ক হইবেন ও একজন ভারপ্রাপ্ত শিশু ইহার পরিকল্পনা রচনা করিবে—শিক্ষক সাহায্য করিবেন।

প্রদর্শনী সাজান ইত্যাদি—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। উহাতে শিশুদের পাঠে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন প্রদীপণাদি থাকিবে, শিশুদের শিল্প কর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি থাকিবে, শিশুদের ও শিক্ষকদের সংগৃহীত দ্রব্যাদি থাকিবে। ঐ সব সংগ্রহের মধ্যে পরিবেশ হইতে নানা কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যাদি—যথা মৌমাছির বাসা, পাখীর বাসা, নূতন ধরণের ঘর প্রভৃতির মডেল, ডাকটিকিট, ছবি প্রভৃতি থাকিবে। একটি কোণে প্রতিদিন শিশুরা যাহা সংগ্রহ করিয়া আনিবে তাহা বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে রক্ষিত হইবে ও পরে তাহা সংগ্রহশালায় উপযুক্ত বিবরণ-পত্র-সহ রক্ষিত হইবে। যাহা রক্ষিত হইবার মত নহে অবশ্য ঐ কোণ হইতেই সরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা শিশুর জ্ঞানাগ্রহ ও পরিবেশ সচেতনা সৃষ্টির খুবই সহায়ক ব্যবস্থা। কয়েকজন শিশুকে প্রতিমাসে ঐ সংরক্ষণাদি কার্যের ভার দেওয়া যাইবে।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ—শিশুরা বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী আবহাওয়া বিষয়ে খোঁজখবর লিপিবদ্ধ রাখা ও ঐ জন্য উষ্ণতা মাপক যন্ত্রাদির মাপ রাখা দৈনন্দিন কার্য হিসাবে করিবে ও মাসিক রিপোর্ট রাখিবে। ইহাও কয়েকটি শিশুর দায়িত্বে প্রতি মাসে সম্পাদিত হইবে।

বাগান সংরক্ষণ—দৈনন্দিন কাজ হিসাবেই বাগানের জলসেচ প্রভৃতি কাজগুলিও একজন নেতার অধীনে রাখা ভাল।

খবর লেখা ও বলা—প্রার্থনার পরই খবর বলার ব্যবস্থা রাখা যায় ও তাহার জন্য কয়েকজনকে ভার দেওয়া যায়। তাহা ছাড়া তাহারা প্রতি সপ্তাহে বা মাসে দেওয়াল পত্রিকা রচনা করিবে।

উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও বিক্রয়—শিশুরা বিদ্যালয়ে নানারূপ দ্রব্য উৎপন্ন করিবে। ঐ দ্রব্যগুলি সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের ভার একজন বা কয়েকজন শিশুর উপর দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও শিশুদের ব্যবহার্য অন্যান্য ক্রীত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি মিলাইয়া একটি সমবায় বিপণী রাখা যায় ও উহার দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ও হিসাবপত্র রাখার ভার এক বা একাধিক শিশুকে দেওয়া যায়। ইহার ভার মাসে মাসে পরিবর্তিত করা যায় ও প্রতি মাসের ভারপ্রাপ্তগণ রিপোর্ট দিবে ও তাহাদের অভিজ্ঞতা শ্রেণীতে আলোচিত হইবে। এই ব্যবস্থা রাখিলে ইহা গণিত ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের সহায়ক হইতে পারিবে। ইহা বাণিজ্যিক ভূগোল শিক্ষার ভিত্তিও হইতে পারিবে।

পাঠাগারের কাজ-কর্ম—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য পাঠাগার থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে নানারূপ শিশু সাহিত্য তো থাকিবেই তদুপরি বাগানের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি কাজের বৌদ্ধিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান-লাভ-সহায়ক পুস্তকাদি থাকিবে, বিজ্ঞান ও ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক পুস্তক থাকিবে ও জল, বাতাস, যান-বাহন প্রভৃতি বিষয়ের উপর Topicপদ্ধতিতে লিখিত পুস্তকাদি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান, শিশুভারতী প্রভৃতি শিশু বিশ্বকোষ-জাতীয় পুস্তকাদি রাখিলে ভাল হয়। এই পাঠাগারের পুস্তকাদি

আদান-প্রদানের ভার উচ্চ শ্রেণীর শিশুদের কয়েকজনকে পর্যায়-ক্রমে দিলে ভাল হয়। শিশুরা পাঠাগারের পুস্তকসমূহের বিষয়-বস্তুর উপর প্রবন্ধাদি লেখা ও আলোচনা করার সুযোগ পাইলে তাহাদের পাঠাগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে এবং এইরূপ আলোচনা ও সাহিত্য সভার ব্যবস্থাও ভারপ্রাপ্ত শিশুদের দ্বারাই করান ভাল। এই কাজও একাধিক শিশুকে দিতে হইবে ও মাসে মাসে উহার পরিবর্তন করিতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে একটি নির্ধারিত সময়ে সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা রাখা যায়। তখন শিশুদের প্রবন্ধ পাঠ, গল্প বলা ও আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে।

২য় ও তৃতীয় ধরণের কাজগুলি দৈনন্দিন রুটিনভুক্ত করা যাইবে না। ইহার জন্য তাই বার্ষিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

বৎসরের প্রথমেই উৎসবানুষ্ঠান, শিল্পকাজ, ভ্রমণ, সমস্যা-সমাধান-মূলক কাজ প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল। ইহার বেশীর ভাগ শ্রেণীগতভাবে হইবে, কিন্তু কয়েকটি বিদ্যালয়গত ভাবেই হইবে। সমস্যামূলক কাজের সবগুলিই বার্ষিক পরিকল্পনাভুক্ত করা সম্ভব নহে তবে বিশেষ একটি সময়ে ঐ ধরণের কাজ করা হইবে—এইরূপ ঠিক করিয়া লওয়া যায়। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ—এইরূপ কাজগুলি বৎসরের প্রথমেই শ্রেণীগতভাবে ও সময় নির্ধারণপূর্বক বন্টন করা যায়। উৎসব বিষয়ক কাজগুলি বিদ্যালয়গতভাবে ও শ্রেণীগতভাবে বৎসরের প্রথমেই ভাগ করিয়া লওয়া যায়।

বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রতি মাসে কার্যদিন, সময় প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া মাসিক পরিকল্পনা রচনা করা যায়। একটি নমুনা এখানে দেওয়া হইল :—

মাসিক পরিকল্পনা :

মাস—ফেব্রুয়ারী শ্রেণী—৩য়।

কার্য দিন—২৪ কার্য সময়—২০ × ৪৷৹ + ৪ × ৩ = ১০২ ঘণ্টা

দৈনন্দিন কার্যসমূহ—২৪ ঘণ্টা
বৌদ্ধিক শ্রেণী— ৪৮ ঘণ্টা
ভ্রমণ— ৪ ঘণ্টা
আনন্দানুষ্ঠান— ৪ ঘণ্টা
খেলাধূলা— ৪ ঘণ্টা
শিল্প-কাজ— ১২ ঘণ্টা
সমস্যা-মূলক-কাজ— ৬ ঘণ্টা।

শিল্প-কাজ :—(১) কাতাই, (২) বই বাঁধাই, (৩) বাটিকের কাজ। প্রতিদিন দলগতভাবে এই কাজ করা হইবে—শ্রেণী ৩টি দলে বিভক্ত হইয়া সপ্তাহে ২ দিন করিয়া কাজগুলি করিবে।

সমস্যা-সমাধান-মূলক কাজ :—শিশুদের বাগানে কয়েকটি বসিবার বেঞ্চ তৈয়ারীর কাজটি গৃহীত হইবে ও দলগতভাবে বিভক্ত হইয়া কাজটি করিবে।

আনন্দানুষ্ঠান :—একদিন বনভোজন করান হইবে—বিদ্যালয়গতভাবে।

খেলাধূলা :—মাসের প্রথমদিকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইবে।

কাজের পরিকল্পনার মতই বৌদ্ধিক বিষয়গুলি শিখাইবার একটি মাসিক পরিকল্পনা রচনা করা হইলে ভাল হয়। উহার নমুনা দেওয়া গেল।

মোট বৌদ্ধিক শ্রেণী—৪৮ ঘণ্টা

সাহিত্য :— পুস্তকের পঠ্যাংশসমূহ শ্রেণীতে পাঠনা (যতদূর সম্ভব সম্বন্ধিতভাবে)—১২ দিন ৪০ মিঃ হিঃ=৮ ঘণ্টা

প্রবন্ধ পাঠ আলোচনাদি; সাহিত্যসভা মাধ্যমে—৪ × ১ঘঃ = ৪ ঘণ্টা

প্রবন্ধ লেখা— ৪ × ৪৫ মিঃ = ৩ ঘণ্টা

গণিত :— সমস্যামূলক কাজের হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে ১ দিন × ১ঘঃ = ১ ঘণ্টা

উহার সহিত সম্বন্ধিতভাবে মিটার, সেন্টিমিটার প্রভৃতি মাপের যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি } ৬ দিন × ৪০ মিঃ = ৪ ঘণ্টা

বনভোজন সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য ১ দিন ১ঘঃ = ১ ঘণ্টা

উহার সহিত সম্পর্কিতভাবে গ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতির সহজ হিসাব ৬ দিন × ৪০ মিঃ = ৪ ঘণ্টা

ইতিহাস :— উৎসবানুষ্ঠান করিতে গিয়া ছোটদের নাটক —"সিদ্ধার্থ ও আহত হংস" বিষয়ে আলোচনা ১ দিন = ১ ঘণ্টা

বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম ৩ দিন × ৩৫ মিঃ = ১ ঘঃ ৪৫ মিঃ

সম্রাট অশোক ২ দিন × ৩৫ মিঃ = ১ ঘঃ ১০ মিঃ

ভূগোল ও বিজ্ঞান—সূর্যের আয়ন গতি (পর্যবেক্ষণের মারফৎ) ২ দিন × ৩৫ মিঃ = ১ ঘঃ ১০ মিঃ

শীতের ফসল (বনভোজন উপলক্ষে) ২ দিন × ৩৫ মিঃ = ১ ঘণ্টা ১০ মিঃ

মাছ ও জলচর প্রাণী (ঐ) ২ দিন × ৩৫ মিঃ = ১ ঘঃ ১০ মিঃ

স্বাস্থ্যতত্ব—পানীয় জলের কথা (ঐ) ২ দিন × ৩৫ মিঃ = ১ ঘঃ ১০ মিঃ
রান্নায় পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা (ঐ) ১ দিন = ৩৫ মিঃ
ইত্যাদি।

সাপ্তাহিক পরিকল্পনা :—

একমাসের কাজের ও বৌদ্ধিক শ্রেণীর যে পরিকল্পনাটি রচিত হইবে তাহাকে ভিত্তি করিয়া প্রতি সপ্তাহের একটি কার্য ও শ্রেণী পাঠনার তালিকা রচনা করিয়া শ্রেণীকে সপ্তাহের শেষ দিনে জানাইয়া দেওয়া ভাল। উচ্চতর শ্রেণীতে সপ্তাহের শ্রেণী পরিকল্পনাটি শিশুদিগকে লইয়া করাই বাঞ্ছনীয়। উহাতে কাজের সময়-তালিকা ও বৌদ্ধিক বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে। ঐরূপ সপ্তাহের পরিকল্পনার একটি আনুমানিক নমুনা দেওয়া গেল।

২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী

২রা পৌষ	১১টা হইতে ১২টা	১২টা হইতে ১টা	১-১৫মি হইতে ২টা	২টা হইতে ২-৪০মি	২-৪০ হইতে ৩-২০ মি	৩-২০ মি হইতে ৪টা
সোম	সাফাই, শ্রেণীসজ্জা, প্রার্থনা, খবর বলা ও দলগত দৈনন্দিন কাজ	শিল্পকাজ, বাগানের কাজ, উৎসব প্রস্তুতি (দলগত ভাবে)	সাহিত্য (গদ্যাংশ) উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু	গণিত, নূতন মাসের হিসাব	ইতিহাস, বুদ্ধ দেবের কথা	খেলাধূলা
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ভূগোল, শীতের সব্‌জি পরিচয়	সঙ্গীত

ইত্যাদি

সপ্তাহের ঐ কার্যসূচীটি প্রতি সপ্তাহেই অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হইবে। কোনও প্রকল্প (সমস্যামূলক কাজ) গ্রহণ করিলে সেই সপ্তাহে বিষয়কেন্দ্রীভাবে শিক্ষাদান স্থগিত রাখিতে হইবে অথবা মাত্র গণিত প্রভৃতি দুই একটি বিষয়-শিক্ষা রাখা হইবে। সপ্তাহিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষক মহাশয় তাঁহার দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা রচনা করিবেন। দৈনিক-পাঠ-পরিকল্পনার কাজগুলি সম্পাদনকালে শিক্ষক কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন তাহার পরিকল্পনা রাখিবেন। কাজের পরিকল্পনা শিশুদের নায়কই পূর্বদিন করিয়া রাখিবে। বৌদ্ধিক শ্রেণী পরিচালনের পরিকল্পনায় শিক্ষক কিরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বৌদ্ধিক বিষয়টি উপস্থাপন করিবার উপযোগী আগ্রহ সৃষ্টি করিবেন, তাহার উল্লেখ রাখিবেন এবং উপস্থাপন করিবার কৌশলটিও সংক্ষেপে লিখিবেন। তাহা ছাড়া লব্ধজ্ঞান প্রয়োগের প্রশ্নের নমুনাও তাহাতে থাকিবে। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে হার্বাট পদ্ধতি অনুসৃত হইবে। কিন্তু সকল বিষয়-শিক্ষায় ইহা অনুসৃত নাও হইতে পারে। ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিশুরা কাজ করিতে করিতেই শেখে—যেমন মালা গাঁথার মধ্য দিয়াই গণনা শেখে তাই এখানে কাজের ও শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনাই করিতে হইবে। অনুরূপভাবে প্রকল্প কাজে অনেক সময় বিষয় বিভাগ সম্ভব হয় না। সেখানে কিভাবে কাজটিকে ও তাহার সহিত সম্বন্ধিত বৌদ্ধিক বিষয়সমূহকে আগাইয়া লওয়া হইবে তাহার পরিকল্পনাই পাঠটীকায় থাকিবে।

একটি পাঠ পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া গেল।

দৈনিক পরিকল্পনা শ্রেণী—তৃতীয়

সময়	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালন পরিকল্পনা	মন্তব্য
১১টা হইতে ১২টা	সাফাই ও শ্রেণীসজ্জা	পরিচ্ছন্নতা-বোধ ও যৌথ কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস সৃষ্টি	ঝাঁটা, ঝুড়ি প্রভৃতি	সাফাই নায়কের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইবে	
	প্রার্থনা	ছন্দ বোধ, সংঘ বোধ, আদর্শ বোধ	ধূপ, ফুল ইত্যাদি	সংস্কৃতি নায়কের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইবে	
	দলগত কাজ	সুঅভ্যাস গঠন ও পূর্ব উদ্দেশ্য সমূহ	বিভিন্ন কাজের যোগ্য উপকরণ-সমূহ	প্রতিদিন নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবে	
১২টা হইতে ১টা	কাতাই, ১ম দল বাগানের কাজ, ২য় দল বন-ভোজনের জন্য প্রস্তুতি মূলক কাজ	কর্ম ক্ষমতা ও যৌথ কর্মের শিক্ষা	উপযুক্ত উপ-করণাদি	বিভিন্ন দলের নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইবে	
১টা হইতে ১-১৫মি	বিশ্রাম				

সময়	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালন পরিকল্পনা	মন্তব্য
১-১৫মি হইতে ২টা	উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ	ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি ও পরিবেশ-সচেতনা বৃদ্ধি	চার্ট ও বাস্তব প্রদীপন সমূহ	শিশুরা বাগানে কাজ করার সময় দেখিয়াছে যে তাহাদের বাগানের কয়েকটি গাছ মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের ঐ অভিজ্ঞতা হইতে আগ্রহ সৃষ্টি করা হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করিব— (১ তোমাদের বাগানের গাছগুলি ঐরূপ ঝিমাইয়া পড়িয়াছে কেন ? (২) তাহা হইলে উদ্ভিদের মৃত্যু আছে তাই না ? (৩) জীবের মৃত্যু আছে কি ? ইত্যাদি। তৎপরে আমি কিশলয়ে উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু শীর্ষক নিবন্ধটির প্রথমাংশ পাঠ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিজে উহা একবার পড়িয়া দিব ও শিশুদিগকে পড়িতে দিব।	

সময়	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালন পরিকল্পনা	মন্তব্য:
				পাঠান্তে পঠিতাংশটি সহজ ভাষায় বলিতে বলা হইবে ও আনুসঙ্গিক প্রশ্ন করা হইবে। প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হউক। তৎপরে শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বোর্ডে লেখা হইবে। তৎপরে শিশুদিগকে পঠিতাংশ হইতে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্ন লিখিতে দিব। নমুনা ইত্যাদি।	

শ্রেণী লইবার পর ডানপার্শ্বে নিজ শ্রেণী বিষয়ে শিক্ষক মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন। কোনও নূতন প্রসঙ্গ উঠিলে তাহা ঐস্থানে লিখিয়া রাখিবেন ও পরবর্তী পাঠে তাহা কাজে লাগাইবেন।

দশম অধ্যায়

কর্মকেন্দ্রী বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ও অগ্রগতি নির্ধারণ

পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা :—কোন কাজ করিলেই তাহার উৎকর্ষতা-অপকর্ষতা বিচারের আগ্রহ আসা স্বাভাবিক। আর ঐরূপ বিচার দ্বারাই কাজটি সম্পাদন ব্যাপারে অধিকতর উপযোগিতা অর্জন করা যায়। শিক্ষক শিশুদের শিক্ষাদান ব্যাপারে তাই ফল সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। এই জন্যই শিশুর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহা দ্বারা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজ সকলেই উপকৃত হন।

শিক্ষকের দিক হইতে বিচার করিলে তিনি পরীক্ষা করিয়া অগ্রগতি নির্ধারণদ্বারা (১) তাঁহার ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও অন্যান্য দিকের গ্রহণ ক্ষমতার পরিমাপ পান ও তাহার ফলে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বাস্তবাশ্রয়ী করিবার সুযোগ পান। (২) তিনি বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ পান ও ভ্রান্ত পদ্ধতির সংশোধনে প্রেরণা পান। (৩) পাঠ্যক্রমকেও বাস্তবাশ্রয়ী ও শিশু-উপযোগী করিতে পারেন।

শিক্ষার্থীর দিক হইতে বিচার করিলে (১) তাহারা পরীক্ষার ফল-দ্বারা শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি অধিক আগ্রহী হইবার সুযোগ পায়। (২) ফল খারাপ হইলে সংশোধনের সুযোগ পায়। (৩) শিক্ষনীয় বিষয়ে অবহিতি বাড়ে। অভিভাবকগণও নিজ শিশুর অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার ও ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পান।

বৃহত্তর সমাজ বিভিন্ন কার্যে উপযুক্ত লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অথবা পাবলিক পরীক্ষার ফল হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লইবার সুযোগ লাভ করে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল পরীক্ষা দ্বারা অগ্রগতি নির্ধারণ খুবই প্রয়োজনীয় ব্যপার। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের ত্রুটির দিকও কম নহে। ঐ ত্রুটিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) "পরীক্ষা" এই প্রক্রিয়াটিরই অন্তর্নিহিত ত্রুটি। (২) বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতির অপূর্ণতা জনিত ত্রুটি।

প্রথম ত্রুটিটির বিষয়ে ইহাই বলা যায় যে যে কোনও শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইল শিখিয়াই তৃপ্তি লাভ করা, ক্ষমতা দেখাইয়া অপরের প্রশংসা পাওয়া নহে। কিন্তু পরীক্ষার ফল শিক্ষার্থীকে বাহিরের নিন্দা-প্রশংসার সম্মুখীন করে ও সে তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। ফলে শিক্ষার অন্তর্নিহিত তৃপ্তি অপেক্ষা পরীক্ষায় ভাল বলিয়া প্রমাণিত হওয়া অনেক সময়েই শিক্ষার্থীর মনে প্রাধান্য বিস্তার করে ও তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা ও প্রশংসালোলুপতা সৃষ্ট হয়।

প্রথম ধরণের ঐ ত্রুটিটি দ্বিতীয় ধরণের ত্রুটির সহিত যুক্ত হইয়া অনেক সময়েই প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় ভাল করার দিকে টানিয়া আনে ও শিক্ষাকার্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দ্বিতীয় ধরণের ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ—(ক) শিক্ষার কয়েকটি দিক। (১) কর্ম সম্পাদনের দিক, (২) বৌদ্ধিক দিক, (৩) শারীরিক বিকাশের দিক, (৪) মনোভাবের দিক, (৫) অপরের সহিত ভাব ও আচরণগত সম্পর্কের দিক। ইহার প্রথম তিনটির পরিমাপ কিছুটা সম্ভব হইলেও অপর দুইটির পরিমাপ সহজ নহে—বোধহয় অসম্ভব। পরীক্ষা দ্বারা শেষোক্তদ্বয় ধরা

পরে না এবং ঐদিকে গুরুত্বও তাই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু ইহারা প্রথম দুইটি অপেক্ষা কম গুরুত্বের নহে। তাই শিক্ষা ক্রমেই একদিক-ঘেঁসা হইয়া পরে। (খ) কর্ম সম্পাদনের দিকটির বিচার বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় অধিক নাই। কিন্তু ইহা থাকা প্রয়োজন। শারীরিক বিচারের দিকটিও তাই। (গ) বর্তমানে বৌদ্ধিক অগ্রগতি পরিমাপের যে ব্যবস্থা আছে তাহা ত্রুটিপূর্ণ।

শেষোক্ত ত্রুটিগুলি বিচার করিলে দেখা যাইবে—

(১) প্রশ্নের ধরণের ত্রুটি—বর্তমানে প্রশ্নগুলির উত্তরে শিক্ষার্থীকে বেশ অনেকটা ভাষার ব্যবহার করিতে হয়। তাই ঐরূপ উত্তর লেখার কৌশলের উপর প্রশ্নটির নম্বর পাওয়া অনেকখানি নির্ভর করে; বিষয় বস্তুর জ্ঞান থাকিলেই চলে না। যে সুকৌশলে উত্তর দিতে জানে সে তাহার অজ্ঞতা ঢাকিয়া কৌশলে উত্তর লিখিতে পারে ও ভাল নম্বর পায়।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নের উত্তর দান সময় সাপেক্ষ বলিয়া সমগ্র পঠিতাংশের মাত্র কয়েকটি অংশ হইতেই প্রশ্ন আসে। এইজন্য পরীক্ষার্থীগণ অনেকে পাঠ্যাংশ হইতে কতকগুলি প্রশ্ন বাছিয়া লইয়া মাত্র তাহার উত্তর করিতে শেখে ও ঐভাবে শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি নির্বাচিত বিষয়ই আয়ত্ব করে। অনেক সময় ঐ বিষয়টিও ভালভাবে শেখে না, উত্তরটি মুখস্থ করে ও উহাতেই ভাল নম্বর পায়। পক্ষান্তরে যে শিক্ষার্থী সমগ্র পাঠ্যাংশ পড়িয়া নিজ চেষ্টায় প্রশ্নের উত্তর করে সে তুলনায় কম নম্বর পায়।

তৃতীয়তঃ প্রশ্নের উত্তর দেখিয়া নম্বর দানের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিমিতি থাকে না, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ভাল লাগার উপর ইহার অনেকখানি নির্ভর করে। উত্তরের ধরণ এমনকি হস্তাক্ষর প্রভৃতিও পরীক্ষকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে দেখা গিয়াছে একই

প্রশ্নোত্তরে বিভিন্ন পরীক্ষক বিভিন্ন মাত্রায় নম্বর দিয়াছেন ও তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

তাহা ছাড়া নম্বর দিয়া পরিমাপ করার কৌশলটি খানিকটা অর্থহীন। যে শিক্ষার্থী অঙ্কে ০ পাইল সে কি কিছুই অঙ্ক জানেনা? অথবা যে ১০০-এর মধ্যে ১০০ পাইল সে কি গণিতে চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে? এইভাবে নম্বর জিনিসটাই অনেকটা অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বৌদ্ধিক বিষয়ের উপরোক্ত ধরণের অগ্রগতি নির্ধারক পরীক্ষার পরিবর্তে দুইটি সংশোধন বর্তমানে চালু হইয়াছে। (১) বাস্তবমুখী প্রশ্নাবলী (objective tests), (২) প্রাপ্ত নম্বরের সমতা-সাধক কৌশল।

বাস্তবমুখী প্রশ্নাবলী :—

এই ধরণের প্রশ্নাবলীর উত্তরে হাঁ, না অথবা 'X', '√' চিহ্ন দিয়া উত্তর দিতে হয় অথবা অনেকগুলি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় কিংবা মাত্র একটি শব্দ বা বাক্য দ্বারা উত্তর দিতে হয়। এইজন্য এইরূপ অনেক প্রশ্নের উত্তর অল্প সময়ে দেওয়া যায় ও তাই সমগ্র পাঠ্যাংশ হইতে অনেক প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব হয়—বাছিয়া পড়ার সুযোগ থাকে কম। কিন্তু ইহার নিম্নলিখিত ত্রুটি দেখা যায় (১) প্রশ্নগুলি মাত্র তথ্যমূলক বা informative —ইহাতে চিন্তামূলক প্রশ্ন কম দেখা যায়—থাকিলেও পরীক্ষার্থী নিজের ভাষায় তাহার উত্তর দেয় না, ভাষা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরেই দেওয়া থাকে। (২) পরীক্ষার্থীর প্রকাশভঙ্গী ইহাতে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে অথচ প্রকাশ ভঙ্গীও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। (৩) আন্দাজে

প্রশ্নোত্তর দিবার ঝোঁক দেখা যায় কারণ হাঁ, বা না অথবা দাগ দেওয়া অনেক সময় আন্দাজ করিয়া দিলেও কয়েকটি সঠিক উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শেষোক্ত ত্রুটিটির সংশোধনের জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব হইতে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সঠিক

উত্তরে যদি ১ নং দেওয়া হয় ভুল উত্তরেব জন্য $\frac{১}{\text{সম্ভাব্য উত্তর সংখ্যা-১}}$

এই হারে নম্বর বিয়োগ করা হইবে। অর্থাৎ একটি প্রশ্নে যদি ৫টি-উত্তরের মধ্য হইতে সঠিক উত্তর বাহির করিতে গিয়া ভুল করা হয় তবে তাহার জন্য—$\frac{১}{৫-১}=\frac{১}{৪}$ ধরা হইবে, অর্থাৎ $\frac{১}{৪}$ নম্বর কাটা হইবে। ইহাতে আন্দাজে উত্তর দেওয়ার প্রবণতা কমিবে। প্রকাশ-ভঙ্গী নির্ধারণের জন্য পৃথক ভাবে কিছু রচনামূলক প্রশ্ন করিলে অথবা শিক্ষার্থীর চিন্তামূলক রচনা পরীক্ষা করিলে ঐ ত্রুটি আংশিক ভাবে দূর হইতে পারে। গণিত ও বিজ্ঞানের প্রশ্ন অবশ্য objective ধরণেরই কিন্তু এখানে একটি প্রশ্নোত্তরে অনেকগুলি প্রক্রিয়া ও প্রশ্নের সংমিশ্রণ থাকে। উহার একটিতে ভুল হইলে সমগ্র উত্তর ভুল বলিয়া গণ্য হয়। এইজন্য ছোট ছোট প্রশ্নে উহা ভাঙিয়া দিলে ভাল। কিন্তু শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে objective type এর প্রশ্ন গঠন সহজ হইলেও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা তেমন সুবিধাজনক মনে হয় না।

প্রাপ্ত নম্বরকে অর্থদ্যোতক করার জন্য অনেকগুলি পরীক্ষার্থীর গড় নম্বরের সহিত প্রতি ব্যক্তির প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করিয়া সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ঐ নম্বরগুলিকে একটি নির্ধারিত span বা বিস্তৃতির মধ্যে আনিবার নানা কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে ও ব্যবহৃত হইতেছে।

কিন্তু পরীক্ষা সম্বন্ধে আরও বড় ত্রুটি এই যে মাত্র বৎসরে এক বা দুইবার পরীক্ষা লওয়া হয় ও ঐ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই পরীক্ষার্থীর অগ্রগতির নিয়ামক হয়। এইজন্য পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় পূর্বে যেমন শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হয়, সমগ্র বৎসরে তাহা হয় না এবং পরীক্ষায় যে ত্রুটি ধরা পরে তাহা সংশোধনের সুযোগ তাহাকে দেওয়া হয় না। ইহার জন্য সারা বৎসরে পরীক্ষাকে ছড়াইয়া দেওয়া, একটি পাঠের উপর পরীক্ষা লইয়া তাহাতে বুৎপত্তি প্রদর্শিত হইলে তবেই পরবর্তী পাঠের অবতারণা করা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে পরীক্ষা মাত্র পাশ-ফেল নির্ধারক না হইয়া পরীক্ষার্থীর আত্ম-সংশোধন-সহায়ক হইবে এবং পরীক্ষার্থী সারা বৎসরেই শিক্ষনীয় বিষয়ে যত্নশীল হইবে।

কিন্তু মনোভাবগত ও আচরণগত দিক দুইটিসহ শিক্ষার্থীর অন্যান্য দিকগুলি যাহাতে উপেক্ষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা কি?

উহা নির্ধারণের জন্য শিশুর প্রত্যহের জীবন ও কাজ কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষককে শিশুর অগ্রগতি-সূচী বা cumulative record card রাখিতে বলা হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ঐ কার্ডে (১) শিশুর স্বাস্থ্যের দিক, (২) কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা ও কুশলতার দিক, (৩) কাজের ও সমাজের ব্যক্তিবর্গের প্রতি মনোভাব ও আচরণের দিক, (৪) মন ও মননশীলতার দিক, (৫) বৌদ্ধিক অগ্রগতির দিক, (৬) অভ্যাসসমূহ, এবং (৭) প্রক্ষোভসমূহ বিচার্য হইবে ও প্রতি বৎসরে কয়েকবার করিয়া বিচারের ফল কার্ডে চিহ্নিত থাকিবে। শিক্ষক শিশুদের আচার-আচরণ, সাফল্য-অসাফল্য তাঁহাদের নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া রাখিবেন ও সকলে সমবেত ভাবে প্রতি শিশুকে ঐরূপ

সাময়িক বিচারের সময় বিচার করিয়া কার্ডে তাহাদের অগ্রগতি-সূচক চিহ্নগুলি বসাইবেন।

চিহ্ন হিসাবে A = অতি উত্তম, B = উত্তম, C = মধ্যম, D = চলন-সই, E = অযোগ্য, F = অত্যন্ত অযোগ্য—এইভাবে চিহ্ন দেওয়া যায় এবং A ও B এর মাঝামাঝি হইলে B +—এইরূপ চিহ্ন দেওয়া যায়। ঐভাবে বিচার অনেক বেশী অর্থদ্যোতক হইবে।

উপরোক্ত ভাবে cumulative record রাখিলে ও সারা বৎসরের কাজকর্ম ও বৌদ্ধিক বিষয়ের ছোট ছোট পরীক্ষা, শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত বৌদ্ধিক কাজকর্ম বিচার করা ইত্যাদি হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সাময়িক অগ্রগতির গড় লইলে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত ত্রুটিহীন হইবে মনে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা শুধু নির্ণয়ণের ব্যাপার বলিয়া গণ্য না করিয়া পরীক্ষার যে ত্রুটি ধরা পড়িল তাহার সংশোধন ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে, তাহা হইলে পরীক্ষা সত্যই কল্যাণ-ধর্মী হইবে, শিক্ষার্থীকে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া কৌশলে নম্বর পাওয়ার ঝোঁকের প্রতি আকৃষ্ট করিবে না।

অগ্রগতি পরিমাপক বিবরণীর নমুনা

১। বিদ্যালয়ের নাম

২। ছাত্রের নাম শ্রেণী— সন—

৩। অভিভাবকের নাম

৪। অভিভাবকের পেশা

৫। গৃহ-পরিবেশ :—(ক) অর্থ নৈতিক অবস্থা

(খ) সাংস্কৃতিক অবস্থা

(গ) শিশুর প্রতি মনোভাব

৬। শিশুর শারীরিক বিকাশ :—

(ক) ওজন (খ) দৈর্ঘ

(গ) বুকের ছাতির মাপ (ঘ) শ্বাস প্রশ্বাস

(ঙ) সাধারণ স্বাস্থ্য

৭। কর্মক্ষমতার বিকাশ :—

(ক) কর্মাগ্রহ

(গ) কর্মের উৎকর্ষতা

(খ) কর্মকুশলতা

৮। সামাজিক বিকাশ :—

(ক) সহযোগিতা

(খ) সহানুভূতি

(গ) ভদ্রতা

৯। আনুভূতিক বিকাশ :—

(ক) আনন্দ লাভ ক্ষমতা

(খ) আনন্দ প্রদান ক্ষমতা

(গ) সৃজনশীলতা

(/০) ভাষা, সাহিত্য (√০) সঙ্গীত

(৶০) চিত্রকলা (।০) অভিনয়

১০। বৌদ্ধিক বিকাশ :—

(অ) বিষয়গত (ক) ভাষা ও সাহিত্য

(খ) গণিত

(গ) ইতিহাস

(ঘ) ভূগোল

(ঙ) বিজ্ঞান

(চ) সমাজ বিজ্ঞান

(আ) প্রয়োগগত (ক) সমস্যা সমাধান ক্ষমতা
(খ) তৎপরতা

১১। খেলাধূলা ও দৈহিক সামর্থ্য বিষয়ক বিকাশ :—

(ক) কোন্ খেলায় কুশলতা দেখা যায়

(খ) ক্রীড়া কৌশলের বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলে তাহার বিবরণ

১২। শিশুটির বৈশিষ্ট্য সমূহ :—

পরীক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা

পরীক্ষাকে শিক্ষার্থীর আত্ম-সংশোধনাত্মক, প্রেরণা-সঞ্চারক-রূপে ব্যবহার :—

আমরা পরীক্ষার প্রয়োজনীতা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্ম সংশোধনের প্রেরণা যোগায়। কিন্তু বৎসরের শেষে পরীক্ষা লইয়া যদি তাহার দ্বারা উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করা ও না করার জন্যই পরীক্ষাকে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে তো পরীক্ষার্থী আত্ম-সংশোধনের সুযোগ বিশেষ পাইতে পারে না। ইহা সত্য যে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার ভয়ে শিক্ষার্থী পাঠে মনোনিবেশ করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী তাহার দুর্বলতা কোথায় তাহা পূর্বাহ্নে বুঝিতে পারিলে সে তাহার প্রচেষ্টাকে সঠিক খাতে নিযুক্ত করিয়া সংশোধনের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য উপায় বাহির করিতে পারিত—এক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষাকে ছড়াইয়া দিলে শিক্ষার্থী ঐরূপভাবে আত্ম-সংশোধনের অধিক সুযোগ পাইবে। ইহা অপেক্ষাও ভাল ফল পাওয়া যায় যদি বিভিন্ন বিষয়ের একটি

স্তর শেষ করিয়া পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্বে শিক্ষার্থীকে Exercise ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। যেমন, শিশুরা গুণন প্রক্রিয়া শিখিবার পর ভাগ প্রক্রিয়া শিখিবার পূর্বে গুণন বিষয়ে একটি ছোটখাট পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। যদি দেখা যায় যে কোনও শিশু গুণন প্রক্রিয়াটি ঠিকমত শিখিতে পারে নাই তবে তাহাকে উহা শিখিয়া লইবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে ও তাহার পরে ভাগের প্রক্রিয়া শেখানো হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে শিক্ষার্থীগণের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে কাঁচা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা কমিবে। অবশ্য শ্রেণীগত পাঠনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সহজসাধ্য নহে। ইহাতে অগ্রগতিশীল শিক্ষার্থীগণ অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিশুদের জন্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু যেহেতু মুষ্টিমেয় অধিক মেধাসম্পন্ন শিশুর দ্রুত অগ্রগতি অপেক্ষা সাধারণ শিশুদের অগ্রগতির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া অধিকতর সঙ্গত তাই এইরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা ভাল বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য অধিক

Exercise এর সার্থকতা

মেধা-সম্পন্ন শিশুদের মেধাকে অন্যভাবে অধিক স্ফূরণ ঘটাইবার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য হইবে। তাহাদিগকে অধিকতর জটীল গুণন অঙ্ক কষিতে শিখাইলে অথবা কম অগ্রসরশীল শিশুকে গুণন বুঝিতে সাহায্য করার কাজে নিয়োগ করিলে তাহারা ঐরূপ সুযোগ পাইবে। যদিও ঐ শিশু যখন অপর শিশুকে গুণ শিখাইবে তখন সে নূতন গণিত পদ্ধতি শিখিবে না কিন্তু সে ঐ প্রক্রিয়াটির আরও খুঁটিনাটি দিক লক্ষ্য করিতে শিখিবে—তাহার সাহায্যকারীটির অসুবিধাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিবে এবং তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিবে।

অধিক আগ্রহশীল শিশুর জন্য ব্যবস্থা

শ্রেণীতে অনেকগুলি শিশু থাকে। সুতরাং কোনও বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ ও প্রক্রিয়ায় পিছাইয়া পরা ও তজ্জন্য কোনও বিশেষ বিষয়ে সাধারণ অগ্রগতি অপেক্ষা কাঁচা হইয়া পরা সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব না হইতে পারে। যে শিশু অল্প মেধাযুক্ত তাহার ক্ষেত্রে এক বৎসরের মধ্যে এক বৎসরের পাঠ্যক্রম শেষ করা সম্ভব হইবে না। মেধা খুব কম হইলে তাহার জন্য অল্প মেধাযুক্ত শিশুদের পৃথক ধরণের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঐরূপ বিদ্যালয় এখনও যথেষ্ট নহে। ঐরূপ বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা কম থাকে এবং অধিকতর বাস্তব অভিজ্ঞতা সহায়ে পাঠাদানের ব্যবস্থা থাকে।

অল্প মেধাযুক্ত শিশুর জন্য ব্যবস্থা

গড়পরতা মেধা অপেক্ষা ঈষৎ কম মেধাযুক্ত শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িলে দুই তিন বৎসর পরে পরে এক বৎসর এক শ্রেণীতে আটকাইয়া থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। তবে তাহারা সকল পাঠ্য বিষয়েই এইরূপ ক্রমাবনতি দেখাইবে এইরূপ প্রত্যাশা করা যায়। যদি কোনও শিশু একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়েই ক্রমাবনতি দেখায় তবে বুঝিতে হইবে ঐ শিশুটি ঐ বিষয়ে কম মনোযোগী হইতেছে অথবা ঐ বিষয়টির পাঠদানে এমন কিছু অসুবিধা রহিয়াছে যাহা শিশুর উপযুক্ত অগ্রগতি লাভের সহায়ক নহে। সেক্ষেত্রে ঐ বিষয়টিতে শিশুর ঐ অনগ্রসরতা দূর করার ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন ঐ বিষয়টির জন্য তাহার ঐ শ্রেণী হইতে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার বাধা না আসে। এইরূপ করার জন্য উচিত হইবে প্রমোশনের বেশ কিছু আগেই শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা। ঐ পরীক্ষায় শিশুরা যে যে বিষয়ে অনগ্রসরশীলতা দেখাইবে তাহাকে

একটি বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসরশীলতা ঘটিলে করণীয় কি?

সেই বিষয়টিতে বুৎপত্তি লাভের সুযোগ দিয়া পুনরায় বিষয়টির পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা রাখা উচিত। বর্তমান কম্পার্টমেন্ট্যাল পরীক্ষাগুলি এই নীতিতেই গৃহীত হইতেছে। শ্রেণী পরীক্ষাতেও ইহার প্রয়োগ ঘটানো উচিত। কিন্তু শুধু ঐরূপ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাহাতে শিশুরা ঐ সকল বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসরশীলতা কাটাইয়া উঠিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে।

ডাল্টন পদ্ধতির পরিচয়

ডাল্টন প্ল্যান নামক একটি বিশেষ প্রণালীর শিক্ষা ব্যবস্থা এই জন্য শেষ পরীক্ষার পর দুই এক মাস বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োগ করা যায়—বিশেষতঃ উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে। ঐ প্লানে শ্রেণী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে না। প্রতি মাসে শিশুরা শিক্ষকের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে কতখানি শিখিবে তাহার পরিকল্পনা বা চুক্তি করে। তাহারা ঐ শিক্ষাক্রমটি শিক্ষকগণের আবশ্যক মত সাহায্য লইয়া সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। বিষয়টিতে উপযুক্ত বুৎপত্তি পাইয়াছে মনে করিলে বিষয়টির পাঠ্যাংশগুলিতে তাহারা পরীক্ষা দেয়। কৃতকার্য হইলে পরবর্তী পাঠ্যাংশগুলি লইয়া আবার আর একটি পরিকল্পনা বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এইভাবে শিশুরা নিজ দায়িত্বেই শিক্ষা লাভ করে—শিক্ষক সহায়ক হন মাত্র।, সুব্যবস্থাযুক্ত বিদ্যালয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে এই প্রণালীতে শিক্ষাদান বেশ ফলপ্রসূ হয়।

শেষ পরীক্ষার ডাল্টল পদ্ধতির প্রয়োগ

সাধারণ বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে শেষ পরীক্ষার পরে এক দুই মাস যে শিশু যে বিষয়ে অনগ্রসরশীল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাকে এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে সাহায্য করার ব্যবস্থা রাখা ভাল। অর্থাৎ ঐ সময়ে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষাদান বন্ধ রাখিয়া বিভিন্ন

শিক্ষক তাঁহার নিজ বিষয়ে যে শিশু যে অংশে সাহায্য লাভের প্রয়োজন বুঝিবে সেই অংশে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করিবেন এইরূপ ব্যক্তিগত পাঠদানের ব্যবস্থা রাখা সুফলপ্রসূ হইবে মনে হয়। বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ পরীক্ষায় যে ছাত্র যে বিষয়ে পিছাইয়া পড়িবে তাহাকে সেই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করার ব্যবস্থা থাকা সুফলপ্রসূ হইবে। এইরূপ করিলে শিক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রতি ভীতি ও বিরূপতা কমিবে এবং পরীক্ষাকে এড়াইয়া যাওয়া, পরীক্ষককে ঠকাইবার চেষ্টা করা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত প্রক্রিয়াগুলি কমিয়া যাইবে। প্রতি বিষয়ের একটি বিশেষ পাঠের পর Exercise ধরণের পরীক্ষা রাখা ভাল। ঐ পরীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন ধরণের হওয়া উচিত যেন শিক্ষক বুঝিতে পারেন শিক্ষনীয় বিষয়ের ঠিক কোন্ পর্যায়ের কি ধরণের অসুবিধা শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ব্যহত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, শিশুকে বিয়োগ শিখিবার পরে শিক্ষক এমন কতকগুলি প্রশ্ন দিবেন যাহার প্রতিটিতে বিয়োগের অঙ্কের বিভিন্ন বিধিগুলির প্রয়োগ আছে। যদি দেখা যায় কোনও শিশু সেই বিয়োগগুলিতে ভুল করিয়াছে যাহাতে উপরের সংখ্যার অঙ্কটি নিম্নের সংখ্যার অঙ্ক অপেক্ষা ছোট তাহা হইলে শিক্ষক বুঝিতে পারিবেন যে শিশুটি "ধার করার প্রক্রিয়াটি" ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। তখন তিনি তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিয়া ঐ প্রক্রিয়াটি বুঝিতে সাহায্য করিতে পারেন ও ঐ শিশু বিয়োগ অঙ্কটি যথার্থভাবে শিখিতে পারে। ব্যাকরণের নিয়ম প্রভৃতি যে কোন কৌশলগত বিষয়ে Exercise সহায় ঐ ভাবে শিশুর সঠিক অসুবিধাটি বাহির করা যায় ও ব্যক্তিগত সহায়তা দ্বারা অসুবিধাটি দূর করা যায়।

Exercise এর প্রশ্নের ধরণ কিরূপ হইবে?

উপরের আলোচনা হইতে ইহাই সুস্পষ্ট হইবে যে শিশুকে অগ্রগতিতে অনুপ্রেরণা প্রদান ও অগ্রগতির বাধা অপসারণে সহায়তা প্রদানকেই পরীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ধরিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, শিক্ষক পাঠদান পদ্ধতির সাফল্য বিচার করিবার জন্যও পরীক্ষাকে ব্যবহার করিতে পারেন। ব্যালার্ড শিশুকে সংখ্যা-গণিত শিক্ষাদানের সার্থক পদ্ধতি বিচারে পরীক্ষাকে ঐভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ৫৭ – ২৯ —এই অঙ্কটি দুইটি প্রক্রিয়ায় করা যায়। (১) সংশ্লেষণ পদ্ধতি, যথা ৫৭ – ২৯ = (৫০ + ৭) – (২০ + ৯) = (৪০ + ১০ + ৭) – (২০ + ৯) = (৪০ + ১৭) – (২০ + ৯) = (৪০ – ২০) + (১৭ – ৯) = ২০ + ৮ = ২৮। (২) সমান যুক্তকরণ পদ্ধতি (Equal addition method) যথা, ৫৭ – ২৯ = (৫০ + ৭) – (২০ + ৯) = (৫০ + ৭ + ১০) – (২০ + ৯ + ১০) = (৫০ + ১৭) – (৩০ + ৯) = (৫০ – ৩০) + (১৭ – ৯) = ২০ + ৮ = ২৮। প্রক্রিয়া হিসাবে প্রথমটিতে বিয়োগের উপরের সংখ্যাটির এক দশক কমাইয়া এককের অঙ্কটিতে দশ যোগ করিতে হয় এবং দ্বিতীয়টিতে উপরের সংখ্যার এককের অঙ্কে দশ যোগ করিয়া নিম্নের সংখ্যার দশকের অঙ্কটিতে এক যোগ করিতে হয়। ইহার কোন্‌টি শিশুরা সহজে প্রয়োগ করিতে পারিবে তাহা নির্ণয়ের জন্য ব্যালার্ড অনেক সংখ্যক প্রথম শিক্ষার্থীকে প্রথম প্রক্রিয়াটি শিখাইয়া Exercise দ্বারা তাহারা কতখানি সাফল্যলাভ করিল তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। পরে অনুরূপ সংখ্যক ও প্রায় অনুরূপ মেধাযুক্ত আর একদল প্রথম শিক্ষার্থী শিশুকে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াতে অনুরূপ সময় ব্যয় করিয়া বিয়োগ শিক্ষা দিয়া তাহার সাফল্য Exercise সাহায্যে নির্ণয়

Exerciseকে পদ্ধতির সার্থকতা বিচারে ব্যবহার

করিয়াছেন। এইভাবে প্রয়োগের পরে তিনি দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে অধিকতর উপযোগী বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। যে কোনও পদ্ধতির উপযোগিতা বিচারে ঐরূপ পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক হইবে।

পরীক্ষার ফলাফলকে বর্তমানে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ধারণ, সাধারণ বুদ্ধির সহিত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানলাভের ক্ষমতার সম্বন্ধ নির্ধারণ প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যদি দেখা যায় অধিকাংশ শিশু একই সঙ্গে গণিত ও সাহিত্যে ভাল অথবা মন্দ ফল দেখাইয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে একটিতে ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য যেরূপ মেধার প্রয়োজন হয় অপরটিতেও সেইরূপ মেধার প্রয়োজন হয়। বুদ্ধির সংগ হিসাবে পূর্বে মনে করা হইত যে ইহা এমন একটি মানসিক শক্তি যাহা বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির মাত্রা সূচিত করে। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ শিশুর বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার ফল বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধির ঐ "সর্বব্যাপ্তি"-মূলক প্রভাবের সঙ্গেই প্রকাশ করা হইতেছে ও বুদ্ধির যথার্থ স্বরূপ লইয়া নূতন নূতন তত্ত্ব জন্মলাভ করিতেছে। বলা বাহুল্য মানুষের মনের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে এই সব তত্ত্ব ক্রমশঃ অগ্রগতি প্রদান করিতেছে। এইজন্য শিক্ষাগত সংখ্যাতত্ত্ব (Educational Statistics) নামক একটি বিশেষ জ্ঞানের শাখাই জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাও পরীক্ষার আর একটি বিশিষ্ট ব্যবহার সন্দেহ নাই।

বুদ্ধির স্বরূপ নির্ধারণ পরীক্ষার ব্যবহার

পরীক্ষাকে যেমন মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যাদির উদ্ভাবন কার্যে ব্যবহার করা হইতেছে তেমনি পরীক্ষাকে আরও সঠিক নির্ণয়ক

আরও মনোবিজ্ঞানসম্মত করার প্রচেষ্টা ক্রমাগত চলিতেছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। একটি শিশু গণিতে

পরীক্ষাকে ক্রমশঃ বিজ্ঞান-সম্মত করা

৬০ পাইলে তাহাকে যে মর্যাদা দেওয়া হয় সে যদি ভাষায় ৬০ পায় তাহাকে অনেক বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা হইলে ৬০ সখ্যাটিকে একটি স্থির পরিমাপকরূপে দেখা যাইতেছে না। এইজন্য প্রাপ্ত মান-নির্ণয়ক সংখ্যা (Number)কে নানা হিসাব নিকাশের মধ্য দিয়া অধিকতর নিশ্চয়াত্মক পরিমাণ-জ্ঞাপক করিবার কৌশল আবিষ্কার হইয়াছে ও তাহাও ক্রমশঃ পরিশোধিত হইতেছে।

এইভাবে বৌদ্ধিক বিষয়ের পরীক্ষাকে যেমন সংশোধিত করার নানা প্রচেষ্টা চলিয়াছে তেমনি শিক্ষার্থীর মনোভাব, আচরণ, দক্ষতা

প্রগতি পঞ্জীর ক্রমশঃ বিকাশ সাধন

প্রভৃতি নির্ধারণের জন্যও ক্রমান্বয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছে। শিশুর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও প্রবণতা-সমূহ নির্ধারণের জন্য নূতন নূতন Cumulative Record Card সমূহ উদ্ভাবিত হইতেছে। ঐ বিষয়ে নির্ণয়াত্মক নানা যান্ত্রিক কৌশলসমূহও উদ্ভাবিত ও প্রযুক্ত হইতেছে। অর্থাৎ পরীক্ষাই বর্ত্তমানে একটি বিশেষ বিষয়রূপে গণ্য হইবার অধিকার অর্জন করিয়াছে।

এখানে বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক রচিত একটি প্রগতি পঞ্জী বা Cumulative Record Card এর নমুনা প্রদত্ত হইল।

গোপনীয়

আরম্ভের তারিখ……… উচ্চ/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়…………

প্রগতি পঞ্জী

নাম ________________________________

জন্ম তারিখ ______ দিন ______ মাস ______ বৎসর ______

ঠিকানা ________________________________

____

____

পরিবারে শিশুর স্থান +

১	২	৩	৪	৫	৬	৭

নির্দ্দেশ—

মান লেখা থাকলে 'ক' (খুব বেশী), 'খ' (বেশী), 'গ' (সাধারণ), 'ঘ' (কম), ও 'ঙ' (খুব কম) ধরে নিয়ে লিখতে হবে ; অন্যান্য স্থানে সংখ্যায় বা সংক্ষিপ্ত ভাষায় ফরম্ পূরণ করতে হবে।

+ সংখ্যার নীচে যথাস্থানে 'ভাই' অথবা 'বোন', লিখতে হবে। যাহার প্রগতিপঞ্জী তাহার স্থানে (।/) চিহ্ন দিতে হবে।

† মৃত হলে কেবল মৃত্যুর তারিখ লিখতে হবে।

* শিক্ষার মান—'ক'=স্নাতকোত্তর শিক্ষা, 'খ'=মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা, 'গ'=উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা, 'ঘ'=প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা, 'ঙ'=অশিক্ষা।

১। সমাজ ও গৃহ পরিবেশ

সম্বন্ধ ও নাম।	জীবিত বা মৃত*	পেশা	শিক্ষা সংস্কৃতি (মান) *	সামাজিক স্থান (মান)	স্নেহ (মান)	আর্থিক অবস্থা (মান)	গৃহের শাসন (মান)	অভিভাবকের ঠিকানা ও গৃহের পরিপার্শ্ব।
পিতা শ্রী…… …… ………………								
মাতা শ্রী · ………… ………………								
……(অভিভাবক) শ্রী…………… ………………								

২। বিদ্যালয়

বৎসর	বিদ্যালয়ের নাম	ভর্তি বইয়ের ক্রমিক নং	ভর্তির তারিখ	শ্রেণী	উপস্থিতি (শতকরা)	দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির কারণ	বিদ্যালয় ত্যাগের তারিখ	ত্যাগের কারণ	নূতন বিদ্যালয়

৩। শারীরিক বিকাশ

বৎসর	মাস	উচ্চতা	ওজন	বুকের মাপ	কঠিন অসুখ বা অঙ্গবৈকল্য	সাধারণ স্বাস্থ্য (মান)	বাচনশক্তি (মান)	কর্মক্ষমতা (মান)	খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ (মান)	মন্তব্য
১৯.........	এপ্রিল									
	আগষ্ট									
	ডিসেম্বর									
১৯.........	এপ্রিল									
	আগষ্ট									
	ডিসেম্বর									
১৯.........	এপ্রিল									
	আগষ্ট									
	ডিসেম্বর									

৪। শিল্প সামর্থ্য

শিল্প কাজ	পরিমাণ	উৎকর্ষতা	কৃত কর্মের গতি	কৃত কর্মের মনোভাব (attitude)	আয়	মন্তব্য
কাতাই						
কৃষি						
সঙ্গীত						
চিত্রাঙ্কন						
কাঠের কাজ						
সৃজনাত্মক কাজ						

৫। পাঠ্যবিষয়ক ক্ষমতার বিকাশ

বৎসর / বিষয়	শতকরা নম্বর			মান	শতকরা নম্বর			মান	মন্তব্য
	১	২	শ্রেণীর বা বাড়ীর কাজ		১	২	শ্রেণীর বা বাড়ীর কাজ		
ভাষা ও সাহিত্য									
গণিত									
প্রকৃতি বিজ্ঞান									
ইতিহাস									
ভূগোল									
স্বাস্থ্য									
নাগরিক শিক্ষা									
লিখন									

৬। বিশেষ নৈপুণ্য ও অসামর্থ্য

বৎসর	নৈপুণ্য	অসামর্থ্য	মন্তব্য
১৯............			
১৯............			
১৯............			

* বৎসরে দু'টি পরীক্ষা হবে, তার নম্বর যথাক্রমে ১ ও ২ এর ঘরে লিখতে হবে; বাড়ীর ও শ্রেণীর কাজেরও নম্বর দিতে হবে। এই সমস্ত নম্বরের গড় নিয়ে মান নির্ধারণ করতে হবে।

'ঙ'=১—১৯, 'ঘ'=২০—৩৯, 'গ'=৪০—৫৯, 'খ'=৬০—৭৯, 'ক'=৮০—১০০।

৭। পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ

(মান)

	১৯............			১৯............			মন্তব্য
বিষয়	১	২	৩	১	২	৩	
সাফাই							
প্রার্থনা							
আলোচনা							
বক্তৃতা							
অভিনয়							
আবৃত্তি							
নৃত্য							
রচনা							
সমাজসেবা							
উৎসবানুষ্ঠান							
শিক্ষামূলক ভ্রমণ							
প্রদর্শনী							
গৃহস্থালীর কাজ							
অন্যান্য কাজ							

৮। আগ্রহ

বিষয়	১৯............			১৯............			মন্তব্য
	১	২	৩	১	২	৩	
ভাষা							
গণিত							
প্রকৃতি বিজ্ঞান							
ইতিহাস							
ভূগোল							
নাগরিক শিক্ষা							
স্বাস্থ্য							
দারুশিল্প							
কাতাই							
কৃষি							
সূচীশিল্প							
মাটীর কাজ							
চিত্রাঙ্কন							
সঙ্গীত							

৯। ব্যক্তিত্বের বিকাশ

(মান)

দিক	গুণাবলী	১৯			১৯..........			মন্তব্য
		১	২	৩	১	২	৩	
শারীরিক	শ্রমশীলতা							
	পরিচ্ছন্নতা							
	তৎপরতা							
সামাজিক	সঙ্গপ্রিয়তা							
	সহযোগিতা							
	দায়িত্ববোধ							
	শৃঙ্খলাবোধ							
	অপরিচিতের প্রতি আচরণ							
	রুচিবোধ							
বৌদ্ধিক	অধ্যবসায়							
	সাধারণ বুদ্ধি							
	বিচার শক্তি							
	আত্মবিশ্বাস							
	স্মৃতি							
	ঔৎসুক্য							

৯ নং ছকের সংলগ্ন ছক :—

দিক	গুণাবলী	১	.....		১৯............			মন্তব্য
		১	২	৩	১	২	৩	
	সততা							
	নিয়মানুবর্তিতা							
	নেতৃত্ব							
	আনুগত্য							
	সত্যবাদিতা							
	দুস্থের সেবা							
	স্নেহপ্রবণতা							
	দয়া							
ব্যক্তিত্ব	ন্যায়ের প্রতি দৃঢ়তা							
	স্থৈর্য							
	সাহসিকতা							
	নীতিবোধ							
	ধৈর্য							
	সখ							

১০। দিনলিপি (বিদ্যার্থীদের)

(মান)

বৎসর	সম্পূর্ণতা		নির্ভুলতা (accuracy)		নিয়মানুবর্তিতা		ক্রম (orderlyness)		পরিচ্ছন্নতা		মন্তব্য
	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	
১৯............											
১৯........											
১৯...... ...											

১১। সমস্যামূলক বা অসামাজিক আচরণ

বৎসর	আচরণ	অবলম্বনীয় ব্যবস্থা
১৯............		
১৯............		
১৯......... ...		

১২। কোন শিক্ষা বা বৃত্তি অবলম্বন শ্রেয় *

মতামত দাতা	শিক্ষা	বৃত্তি	স্বাক্ষর
ছাত্র/ছাত্রী			
অভিভাবক			
শ্রেণী শিক্ষক			
প্রধান শিক্ষক			

১৯.......... ১৯.. ...... ১৯...... ..

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর।

* অন্য শিক্ষা বা বৃত্তি গ্রহণ কালে এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি স্তরের শেষে এই অংশ পূরনীয়।

স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগ দ্বারা রচিত ও প্রকাশিত।

বৃত্তি নিরূপণে সহায়তা প্রদান কার্যে প্রগতি পঞ্জীর ব্যবহার।

পরীক্ষা ও প্রগতি পঞ্জী সংরক্ষণের আর একটি আধুনিক সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষাকে শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ মনে করা হয় না; শিক্ষার্থীর জীবনের সর্বাত্মক বিকাশকেই শিক্ষা মনে করা হয়। বুদ্ধি সম্বন্ধেও পূর্বের সর্বাত্মক ধারণার পরিবর্তে এক্ষনে মনে করা হয় বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে পারে এবং যে শিশু একটি বা একাধিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখাইতে পারিতেছে না সেই শিশুও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বেশ সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এইজন্য কিছুটা সাধারণ শিক্ষা অর্জনের পরই শিশুর বুদ্ধি, কর্ম-ক্ষমতা, প্রবণতা প্রভৃতি বিচার করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযুক্ত বৃত্তিটি খুঁজিয়া দেওয়াও বর্তমানে বিদ্যালয়ের কর্তব্যকর্মরূপে গণ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্তমানে বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে উহাই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠিত রূপ বলিয়া গণ্য হইবে। বহুমুখী বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষাধারাটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করার উপরই ঐরূপ বিদ্যালয়ের যথার্থ সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। এইজন্য শিক্ষকগণ বৃত্তি নিরূপণ করার ক্ষমতালাভের শিক্ষণ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এই কার্যে তখনই সাফল্য দেখাইতে পারিবেন যখন তাঁহারা শিশুর অতীতের শিক্ষাগত ইতিহাস ঠিকমত জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন। ইহা না হইলে মাত্র সাময়িক যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা কখনই সাফল্য দেখাইতে পারিবেন না। অপর পক্ষে নিশ্চয়াত্মক-ভাবে শিশুর প্রবণতা ও ক্ষমতা নির্ধারণের উপযুক্ত পরীক্ষা বা যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আমাদের দেশের পক্ষে নানা মূল্যবান যন্ত্রাদির ব্যবহারও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে মনে হয়

না। এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর হইতে শিশুর প্রগতি পঞ্জী সঠিকভাবে রক্ষিত হইলে উহার সাহায্যে বৃত্তি নিরূপণের কাজ অনেক বেশী প্রশস্ত হইবে। সুতরাং প্রগতি পঞ্জী রক্ষার বিষয়টি আজ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে ও ইহার সম্বন্ধে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বিশেষ অবহিতি প্রয়োজন।

একাদশ অধ্যায়

একটি প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিবেশ রচনা

আমরা পূর্বে শিক্ষার সংজ্ঞা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বলা চলে যে শিক্ষার দুইটি দিক রহিয়াছে—একটি Formative বা চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, অভ্যাস প্রভৃতি গঠনের দিক ও আর একটি Informative বা জ্ঞানের দিক। যে কোনও প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে এই দুইটি দিকের বিকাশ-আয়োজন রাখা বিধেয়। বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগে কারণ বর্তমানে সমাজ ও গৃহপরিবেশে শিশুদের Formative দিকটির সুষ্ঠু বিকাশ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর। কর্মব্যস্ত নরনারী আপনাপন সন্তান-সন্ততিদের আচার-আচরণ ব্যাপারে তাদৃশ অবহিতি প্রদান করিতে পারেন না এবং পুরাতন যৌথ পরিবার প্রথা বিলুপ্তির পথে ক্রম অগ্রসর হওয়ায় শিশুরা পরিবারে সামাজিক আবহাওয়া খুব কমই পায়। তাহা ছাড়া, সমাজও আজ দ্রুত পরিবর্তনের মুখে আসিয়াছে বলিয়া সামাজিক প্রথাগুলিও তেমন বলিষ্ঠতা হারাইয়াছে—শিশুগণ উহার দ্বারা সুপ্রভাব লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না।

আবার, শিক্ষার Informative দিকও শুধু শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তক সাহায্যেই সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা প্রদান করা যায় না। কারণ পুস্তক হইতে আমরা যাহা শিখি তাহা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সহায়েই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রচুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার না থাকিলে শুধু শ্রেণীতে শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া যে information পাওয়া যায় তাহার

আত্মীকরণ ঘটিবে না। বর্তমান যুগে তাই শিক্ষাবিদগণ জ্ঞানার্জনের দুইটি পদ্ধতির কথা বলেন—একটি Formal ও আর একটি Informal. শ্রেণীপাঠনা ও পাঠ্যপুস্তকাদি সাহায্যে আমরা Formal পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু গল্প করিয়া, আলাপ করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, অভিনয় দেখিয়া, ভ্রমণকালে আমরা আমাদের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও শিক্ষকের পাঠনা ব্যতীতই অনেক কিছু শিখি। ইহাই শিক্ষার Informal পদ্ধতি। "অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগনন!" কতজনের কাছে কতভাবেই না আমরা শিখি। শুধু তাহাই নহে ঐসব টুকরা টুকরা জ্ঞানকেই Formal শিক্ষা দ্বারা গ্রথিত করা হয়—ঐগুলি না থাকিলে Formal শিক্ষাদান কদাচ সার্থক হইতে পারে না।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিব যে বিদ্যালয়ে শুধু ছাত্র, শিক্ষক, পুঁথি ও শ্রেণীকার্যের কয়েকটি আনুসঙ্গিক মাত্র আছে, তাহা এমনকি বৌদ্ধিক শিক্ষার আয়োজনের দিক হইতেও অত্যন্ত অপূর্ণ।

তাই আমরা ভাল বিদ্যালয়ে formative শিক্ষা ও informal knowledge এর পুষ্টির জন্য কি কি ধরণের আয়োজন রাখিতে পারি এখানে তাহার আলোচনা করিব।

(ক) স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা :—ইহার বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। শিশুদের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়িয়া তোলায় ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) খেলাধূলা প্রভৃতির সুব্যবস্থা :—সুস্থ শরীর না হইলে সব শিক্ষায়োজনই উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে। শিক্ষার্থীর শরীরের গঠনের জন্য শারীরশিক্ষার উপযুক্ত আয়োজন তাই যে কোনও ভাল

বিদ্যালয়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক। শুধু তাহাই নহে ইহা শিশুদিগকে সামাজিক শিক্ষাও প্রদান করে।

(গ) শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রতিবিধান ব্যবস্থা :—উপরোক্ত কারণেই ইহার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্র হইতেই ইহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(ঘ) জলযোগের ব্যবস্থা :—ইহাও উপরোক্ত কারণে প্রয়োজনীয়। শুধু তাহাই নহে ইহা পরিচ্ছন্নতাবোধ, সুরুচিবোধ, সমাজবোধ প্রভৃতির বিকাশে সুযোগ প্রদান করে। শিশুদিগের দ্বারা ইহার সংগঠনাদির ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে একটি উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে কর্ম প্রদান করাও সম্ভব হইবে।

(ঙ) সামাজিকভাবে অনুষ্ঠানাদি পালন :—বিভিন্ন মহাপুরুষের স্মরণোৎসব, ঋতু উৎসব, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস, বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা প্রভৃতি উৎসব পালনের মধ্য দিয়া শিশুরা সামাজিকতা, সদাচার প্রভৃতি শিখিয়া তাহাদের সাংস্কৃতিক দিকটির বিকাশের সুযোগ পায়। উৎসবানুষ্ঠানকে project হিসাবে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধিক বিকাশের সুযোগ প্রদান করা সম্ভব।

(চ) বিদ্যালয়ের পাঠাগার :—যে কোনও ভাল বিদ্যালয়ের পাঠাগার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ইহা শুধু শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সহায়ক নহে—শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ক্ষুধা সৃষ্টি করা ও পড়ার সুঅভ্যাস গঠন করার জন্যও ইহা প্রয়োজন। অপরপক্ষে, পাঠাগার শিক্ষার্থীকে সংগঠন সুপরিচালনের হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগও প্রদান করে। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-ছাত্র বৌদ্ধিকভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়।

পাঠাগারের পুস্তক কিরূপ হইবে তাহা অনেকাংশে বিদ্যালয়ের মানের উপর নির্ভর করে। নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোটদের উপযোগী পুস্তকাদিই বেশী থাকিবে। তেমনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোর বয়স্কদের পুস্তক বেশী থাকিবে। কিন্তু প্রামাণ্যপুস্তকও যথেষ্ঠ থাকা প্রয়োজন। উহা হইতে শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন এবং মাঝে মাঝে শ্রেণীতে উহার উপযুক্ত অংশ পড়িয়া শুনাইতে পারেন। ইহাতে ছোটরা ঐসব পুস্তকের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবে ও উত্তর জীবনে ঐগুলি পড়িতে আগ্রহী হইবে। শিক্ষকগণকে জ্ঞানাগ্রহী হইতে হইবে, তবেই তাঁহারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানাগ্রহ জাগাইতে পারিবেন, নতুবা নহে। রবীন্দ্রনাথের কথায় "প্রজ্বলনশীল দীপশিখাই অপর দীপে শিখা সংযোগ করিতে পারে।" তাই শিক্ষকগণকেও আগ্রহশীল পাঠক হইতে হইবে এবং এইজন্য বিদ্যালয়ের পাঠাগারে তাঁহাদের উপযুক্ত বইও থাকা উচিত। ঐরূপ পুস্তক যথেষ্ট থাকিলে শিক্ষকগণ অভিভাবকগণকেও বই যোগাইতে পারেন। ইহার দ্বারা বিদ্যালয়ের সহিত অভিভাবক-বর্গের আত্মিকযোগ বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যালয় একটি সমাজ-কেন্দ্রের রূপ পাইতে থাকিবে।

বিদ্যালয়ের জন্য দুইরূপ পাঠাগার রাখা যায়—(১) সাধারণ পাঠাগার ও (২) শ্রেণী পাঠাগার। এই উভয় রকম পাঠাগারই বিদ্যালয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ পাঠাগারটি একটি পৃথক ঘরে অথবা অফিস ঘরে শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকা ভাল। ইহাতে বড়দের উপযুক্ত বই, শিক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই, প্রামাণ্য পুস্তকাদি (Reference books) ও বিভিন্ন শাখার জ্ঞান বিষয়ক বই থাকিবে। ছাত্রদিগকেও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ইহার পুস্তক

দেওয়া যায় ; কিন্তু শিক্ষক বিচার করিয়াই তাহা দিবেন। সাধারণ পাঠাগারের সহিত বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়। শ্রেণী পাঠাগার প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রগণের দ্বারা নির্বাচিত ভারপ্রাপ্ত ছাত্রের বা ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। শিক্ষক ইহার পুস্তক নির্বাচন করিয়া দিবেন। শ্রেণী শিক্ষক ঐ পাঠাগার পরিচালনের ব্যবস্থায় সাহায্য প্রদান করিবেন। বিশেষ বিশেষ দিনে ও সময়ে শ্রেণীগতভাবে এই পাঠাগারের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা রাখা যায় ও ছাত্রদিগকে ইহার বইগুলি বাড়ীতে লইয়া পড়িবার সুযোগ দিতে হইবে। পাঠাগারগুলিতে বই থাকিলেই শিক্ষার্থীর বইগুলি পড়ার আগ্রহ জাগিবে এমন নহে। তাই শিক্ষককে বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে যে জ্ঞানের কথা, যে গল্প ইত্যাদি রহিয়াছে তাহার কিছু কিছু বিবরণ মাঝে মাঝে দিয়া আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। রচনা প্রতিযোগিতা, তর্ক প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা প্রভৃতি সহায়ে এই আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। "প্রশ্নের বাক্স" রাখিয়া ছাত্রদের নিকট হইতে প্রশ্ন আহ্বান করিয়া ও ছাত্রদিগকে ঐসব প্রশ্নের উত্তর যোগাইতে আহ্বান করিয়া পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। শিক্ষকগণও শিশুদের সাহিত্য সভাগুলিতে যোগদান করিয়া বড় বড় লেখকের গল্প-সিদ্ধান্তাদি শিশু উপযোগী সহজ ভাষায় বলিতে পারেন। অভিভাবকদের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত ও জ্ঞান-চর্চা করেন তাঁহাদিগকেও ঐসব সভায় আহ্বান করিয়া ছাত্রগণকে তাহাদের জ্ঞান ও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ দেওয়া ভাল।

(ছ) প্রদর্শনী গৃহ (Exhibition Room) :—ভাল বিদ্যালয়ে একটি করিয়া প্রদর্শনী গৃহ থাকা উচিত। গৃহের অভাব থাকিলে অফিস ঘরে অথবা শ্রেণী ঘরেও ইহার স্থান

করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে চিত্র, চার্ট, পোষ্টার, নিদর্শনাদি সহায়ে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের বাস্তব ধারণা শিশুরা পাইতে পারিবে। শিশুদের ও শিক্ষকদের সংগ্রহ করা প্রদর্শন উপযোগী দ্রব্যাদি ও হাতের কাজ প্রভৃতি প্রদর্শনী গৃহে এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন শিশুরা উহা দেখিতে ও উহার তাৎপর্য সহজে বুঝিতে পারে। বিদ্যালয়ের মান অনুসারে প্রদর্শনীগৃহের সংরক্ষিত দ্রব্যের মান হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাহাড়, পর্বত প্রভৃতির মডেল, কীট, পতঙ্গের দেহ ও আবাস গৃহ, সহরের কারখানার চিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনীতে রাখিবার উপযুক্ত; উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৎপরিবর্তে মানচিত্র, ঐতিহাসিক চিত্রাদি, নানা সাংকেতিক চার্ট প্রভৃতিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া যায়। যদি বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষাদানের উপযোগী যন্ত্র ও সম্পাদ্য কর্মাদির জন্য পৃথক গৃহের ব্যবস্থা না থাকে তবে উহাও প্রদর্শনী গৃহেই রাখা যায়। প্রদর্শনী গৃহসজ্জা ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপর ভার দিলে তাহারা উহার সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেন প্রদর্শনী দেখার যথেষ্ট সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

বিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানে প্রদর্শনী গৃহটিকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা যায় ও উহার দ্বার সর্ব-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা যায়। এইজন্য একটি বিশেষ দিকে বা মঞ্চে ঐ উৎসবের সহিত সঙ্গতিযুক্ত বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা যায়; যেমন, ঋতু উৎসবগুলিতে বিশেষ ঋতুর ফুল, ফল প্রভৃতি; রবীন্দ্র স্মরণোৎসবে কবির বিভিন্ন বাণী, কর্ম সাধনার চিত্র প্রভৃতি।

শিশুরা কোনও ঐতিহাসিক বা ভৌগলিক গুরুত্বযুক্ত স্থানে বেড়াইতে গেলে তাহাদিগকে ঐ স্থানের ভ্রমণ কাহিনী ও সংগ্রহ করা নিদর্শনাদি প্রদর্শনীতে রাখিতে আগ্রহী করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা ঐরূপ ভ্রমণের মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য ইত্যাদির প্রতি অধিকতর অবহিত হইবে ও অন্য শিশু তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে শিখিবার অধিকতর সুযোগ পাইবে। বিদ্যালয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিলে ঐ কার্যে সংগ্রহ করা নিদর্শন ও তথ্যাদি প্রদর্শনীতে রাখা ভাল। ইহাতে শিশুরা কাজে উৎসাহ পাইবে। বিদ্যালয়ে বাগানের কাজ, শিল্প কাজ প্রভৃতি থাকিলে শ্রেষ্ঠ উৎপাদন-সমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা দ্বারা ঐ কাজে আগ্রহ সঞ্চার করা সহজ হইবে। পাঠদানে ব্যবহৃত শিক্ষা সরঞ্জামগুলি পাঠদানের পরে কিছুদিন প্রদর্শনীতে রাখিয়া শিশুদিগকে বার বার দেখার সুযোগ দেওয়া ভাল।

(জ) প্রকৃতি-কোণ (Nature Corner) :—পূর্বে বলা হইয়াছে যে শিশুদের সংগ্রহীত দ্রব্যগুলি প্রদর্শনীতে রাখার সুযোগ পাইলে তাহাদের সংগ্রহের দিকে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। বিভিন্ন জিনিষ সংগ্রহের শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। শিক্ষক যদি তাহাদের সংগ্রহ করা জিনিষটিকে সমাদর করেন তবে তাহাদের ঐ কার্যে আগ্রহ বাড়িবে। শিক্ষক যেইরূপ জিনিষের সমাদর দেখাইবেন তাহারাও সেইরূপ জিনিষ সংগ্রহ করিতে অধিকতর আগ্রহী হইবে। এইভাবে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত নিদর্শনাদি, মৃত্তিকা প্রস্তরাদি, ঐতিহাসিক চিত্রাদি শিশুরাই সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু শিশুদের সংগ্রহ করা এমন অনেক নিদর্শন থাকিবে যাহা দীর্ঘকাল

প্রদর্শনীতে রাখা যায় না—এক দুই দিন পরেই যাহা পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য। ঐরূপ সংগ্রহ সাধারণতঃ প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সংগ্রহ—যেমন ফুল, ফল, জীবজন্তু, পাতা প্রভৃতি। ঐগুলির প্রদর্শন জন্য শ্রেণীঘরের বা বিদ্যালয় গৃহের একটি কোণে একটি অস্থায়ী প্রদর্শনী রাখা যায়। উহাই প্রকৃতি-কোণ। এখানে যে সংগ্রহগুলি থাকিবে শিশুদিগকে সেই দিন বা তাহার পরের দুই তিন দিন ঐগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে। উহাতে যে দ্রব্য-গুলি শিশুরা রাখিবে তাহার মধ্যে যেগুলি দীর্ঘকাল সংরক্ষণযোগ্য সেইগুলিকেই মাত্র পরে প্রদর্শনীতে রাখা হইবে। অন্যগুলি ফেলিয়া দেওয়া হইবে। শিশুদের উদ্ভিদ ও জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষাদিও প্রকৃতি-কোণে রাখা যায়। যেমন, একটি পাতা কাগজে ঢাকা দেওয়ায় তাহা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে—শিশুদের এইরূপ পরীক্ষা বর্ণনাসহ প্রকৃতি-কোণে রাখা যায়। সম্ভব হইলে প্রতি শ্রেণীর জন্যই একটি করিয়া প্রকৃতি-কোণ রাখা ভাল। কোনও শ্রেণীর প্রকৃতি-কোণে বিশেষ কোনও দ্রষ্টব্য সংগ্রহীত হইলে উহা দেখাই-বার জন্য সকল শ্রেণীকে বলা যাইতে পারে। ইহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে।

(ঝ) হস্তলিখিত পত্রিকা, প্রাচীর পত্রিকা প্রভৃতি ঃ—শিশুরা পাঠাগারে যে সব পুস্তক পড়ে, ভ্রমণে গিয়া যে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে, উৎসবানুষ্ঠানে যে সব জ্ঞান লাভ করে সেইগুলি তাহারা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারিলে আনন্দ পায়। উহাতে তাহাদের প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ে ও তাহারা যে বিষয়টি দেখিয়াছে ও জানিয়াছে তাহা আরও গভীরভাবে ভাবিতে ও বুঝিতে পারে। তাহাদের লেখা

হইতে অপর শিশুও শিখিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। এইজন্য শিশুদের নিজেদের লেখা পত্রিকা, প্রাচীর পত্র প্রভৃতির প্রচলন বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষা সহায়ক হইবে। ছোটদের পত্র-পত্রিকাকে সম্ভবমত চিত্র সুশোভিত করা ভাল। শিশুদের এই সব কাজে শিক্ষকগণ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিবেন। এইরূপ পত্রিকাদি শ্রেণীগতভাবে ও বিদ্যালয়গতভাবে—এই উভয় প্রকারের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ কাজে যেন সকলেই পর্যায়ক্রমে সুযোগ পায় তাহা দেখা বাঞ্ছনীয়।

(ঞ) শিক্ষামূলক ভ্রমণ :—ভ্রমণ শিক্ষার যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মাধ্যম তাহা অতি প্রাচীন যুগ হইতেই সুপরিচিত। ভারতীয় সমাজে তীর্থ-ভ্রমণ, সন্ন্যাসীদের প্রবজ্যা প্রভৃতি মাধ্যমে শিক্ষার এই উপায়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে Excursion, Heiking প্রভৃতি মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহাকে গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। কোনও ঐতিহাসিক, ভৌগলিক অথবা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গিয়া শিক্ষার্থী বাস্তবভাবে ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান আহরণের সুযোগ তো পায়ই অধিকন্তু তাহারা ভ্রমণসংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বহু ব্যক্তির ও পরিবেশের সংস্পর্শে আসিয়া বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সামাজিকতা, ভদ্রতাবোধ ও লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগ পায় ও তাহাদের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটে। ইহার ফলে শিশুদের সংঘচেতনা, সহযোগিতা, পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা, হিসাববোধ, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণেরও বিকাশ ঘটে।

ভ্রমণ মানেই যে দূর দেশ ভ্রমণ তাহা ভাবিলে ভুল হইবে। ছোট শিশুরা দল বাঁধিয়া গ্রামের নিকটে নদীতটে, মাঠে, হাটে, বাজারে

ভ্রমণ করিতে গেলেও অনেক আনন্দ পায়—অনেক কিছু জানিতেও শিখিতে পারে। পোষ্ট-অফিস, রেল ষ্টেশন প্রভৃতি স্থানে গিয়া অথবা কাঠের কারখানা, খামার বাড়ী প্রভৃতি উৎপাদন স্থানে গিয়া তাহারা দ্রব্যাদি কিভাবে উৎপন্ন হয় জানিতে ও বুঝিতে পারে। সাঁওতাল পল্লীতে গিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া আসিতে পারে।

কোনও স্থানে ভ্রমণের পূর্বে শিক্ষক শিশুদের সহোয্যে ভ্রমণের পরিকল্পনা রচনা করিবেন। ঐ পরিকল্পনায় তাহারা কেন কোথায় যাইতেছে, কি দেখিবে ইত্যাদি যেমন সুস্পষ্ট করা হইবে, যাইবার ব্যবস্থা, সময় ইত্যাদি বিষয়ও উহাতে আলোচিত হইবে। তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। ভ্রমণের সময় শিক্ষক মহাশয় সঙ্গে থাকিয়া বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া রাখিবেন। ভ্রমণের পরে তাহাদের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণীগতভাবে আলোচিত হইবে ও তাহাদের জ্ঞাতব্যসমূহের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর তাহারা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিবে। ভ্রমণ-কালে তাহাদের সংগ্রহীত দ্রব্যাদিসহ তাহাদের ভ্রমণ বিবরণ তাহারা বিদ্যালয়ের সকলকে সভা ডাকিয়া শুনাইতে পারে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং অপরে শিখিবে ও উদ্বুদ্ধ হইবে।

(ট) শিশুদের বিভিন্ন সংঘ গঠনে উৎসাহ প্রদান:—বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা শিশুদিগকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টা সহায়ে শিখিতে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান—জোর করিয়া শিক্ষণীয় বিষয় গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য না করা। এইজন্য মাত্র শ্রেণী পাঠনাতেই শিক্ষাকে আবদ্ধ না রাখিয়া তাহারা নানাভাবে শিখিবার সুযোগ যাহাতে পায়

তাহার ব্যবস্থা করাই প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতির নীতি। শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রবণতা রহিয়াছে। ঐসব প্রবণতার ভিত্তিতেই তাহারা সংঘবদ্ধভাবে নানা কাজ ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইবে—শিক্ষক ঐসব কাজ ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষায় পর্যবসিত করিতে চেষ্টা করিবেন। এইখানে শিশুদের উপযোগী ঐরূপ কয়েকটি সংঘের ইঙ্গিতও দেওয়া হইতেছে।

(১) কৃষি বন্ধুর দল :—ইহারা কৃষকদের জীবন, তাহাদের সমস্যা, বিভিন্ন রকমের ফসলের কাজ, তাহার বাধা-বিপত্তি ও লাভ-লোকসান, কৃষির উপযোগী মাটি, আবহাওয়া প্রভৃতি, প্রতি বৎসরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সুবিধা অসুবিধা, কৃষি কার্যের দৃষ্টিতে আবহাওয়ার সংবাদাদি সংগ্রহ করিবে ও প্রচার করিবে।

(২) আবহাওয়া পর্যবেক্ষক দল :—ইহারা দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক আবহাওয়ার সংবাদাদি সংগ্রহ করিবে ও প্রচার করিবে।

(৩) স্বাস্থ্য সংরক্ষণ দল :—তাহারা নিজ পল্লীর স্বাস্থ্যবিষয়ক খবর সংগ্রহ করিবে ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য করণীয় বিষয়সমূহ প্রচার করিবে। স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়ত্বসাধ্য কাজগুলিও তাহারা করিবে—যেমন বর্ষার সময় কূপগুলির জল শোধিত করা, গ্রামে কলেরা প্রভৃতির টিকা গ্রহণ ব্যবস্থায় সাহায্য করা ইত্যাদি।

(৪) বিজ্ঞানী সংঘ :—তাহারা বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন আহ্বান করিয়া উত্তর সংগ্রহ ও জ্ঞাপন করিবে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে ও তাহার জন্য নানা পরীক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আলোচনাদির ব্যবস্থাও তাহারা করিবে।

(৫) সাহিত্যিক সংঘ :—ইহারা পত্রিকা রচনা, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি কাজ করিবে।

বিদ্যালয় ও পল্লীর সমস্যামূলক কাজ কর্ম :—

আমরা ডিউই-এর Project Method বিষয়ে পূর্বেই জানিয়াছি। ধারাবাহিকভাবে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের অসুবিধা থাকিলেও প্রতি বৎসর কয়েকটি করিয়া শ্রেণী উপযোগী Project লইলে শিশুদিগকে প্রয়োগশীল শিক্ষা দিবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায় ও তাহারা বৌদ্ধিক শিক্ষা আহরণে উৎসাহী হয়। এইখানে কয়েকটি শিশু উপযোগী Project-এর বিষয়ে বলা হইতেছে যাহা শুধু বৌদ্ধিক ও কর্ম-ক্ষমতার বিকাশ সহায়কই হইবে না তাহাদের সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধও জাগ্রত হইবে।

(১) বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে ভ্রমণোদ্যানে পরিণত করা।

(২) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত প্রস্রাবাগার নির্মাণ।

(৩) খেলার মাঠে গ্রীষ্ম-বর্ষার উপযোগী আশ্রয়স্থান নির্মাণ।

(৪) ছায়াশীতল বৃক্ষতলে বিশ্রামবেদী নির্মাণ।

(৫) পায়ে চলা পথের জন্য ছোট-খাট পুল নির্মাণ।

(৬) স্নানের ঘাট নির্মাণ।

(৭) বিদ্যালয়ের বা পল্লীর জন্য মুক্ত প্রাঙ্গনে অভিনয়-মঞ্চ নির্মাণ।

(৮) গ্রামের জন্য সংবাদ পরিবেশক ফলক নির্মাণ।

(৯) গ্রামের বার্ষিক তথ্য সংগ্রহ।

(১০) প্রতি বৎসরের গ্রামের ফসলের পরিমাণ ও নমুনা সংগ্রহ।

(১১) গ্রামের ফল ও পুষ্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

(১২) গ্রামের শরীর-চর্চা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

ইহা ব্যতিত বিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে শিল্পকাজ করান হইলে তাহার একঘেয়েমী ঘুচাইবার জন্য ঐ সংক্রান্ত Project ও

লওয়া যায়; যেমন, শিশুরা পূজার পূর্বে ঠিক করিতে পারে তাহারা সূতা কাটিয়া গ্রামের দুঃস্থা বৃদ্ধাটিকে কাপড় তৈয়ারী করিয়া দিবে ইত্যাদি।

কাজ-কর্মের অভিজ্ঞতা ও বৌদ্ধিক শিক্ষা :—

আমাদের জীবনে জ্ঞানের যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে কাজ করিবার শক্তিরও তেমনি প্রয়োজন রহিয়াছে। যে মানুষ নেহাৎ যান্ত্রিকভাবে কোনও একটি কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে কিন্তু জ্ঞানের প্রতি যাহার আগ্রহ নাই সেই মানুষ যেমন অপূর্ণ তেমনি, যে অনেক কিছুর জ্ঞান রাখে কিন্তু জীবনের কোনও বাস্তব সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না সেও অপূর্ণ মানুষ। আবার এই জানা ও করার দাবী মিটিলেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। জীবনে আনন্দের প্রয়োজনও ঐ দুইটির মধ্যে। বর্তমান শিক্ষকরা তাই কর্ম, জ্ঞান ও আনন্দ—এই তিনটিতে সমতা সাধন করার প্রচেষ্টা করিতেছেন দেখা যায়। কিন্তু এই তিনটিকে একই শিক্ষা প্রচেষ্টায় মিশাইতে পারিলে তবেই মানুষের বিকাশ ধারায়—তাহার জীবন ধারায় উহারা সমতা পায়; নতুবা একটি গুরুত্ব পাইয়া অন্য দুইটির উপেক্ষিত হইবার সুযোগ থাকিয়া যায়। আমরা বিদ্যালয়ে যে সমস্ত আয়োজন রাখিবার কথা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ঐ তিনটির উপকরণ প্রচুর আছে। কিন্তু কি কৌশলে ঐ তিনটির মিলন ঘটান যায় তাহাও বিষদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ডিউইএর Project পদ্ধতি ও গান্ধীজীর সমবায় পদ্ধতির মূল কথা—শিশুরা কাজের প্রয়োজনে বৌদ্ধিক জ্ঞান লাভ করিবে। যেহেতু কাজই শিশুর নিকট বাস্তব তাই তাহাদের ব্যক্তিগত ও

সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজন অথবা সমাজ কর্তব্য হিসাবে বিভিন্ন কাজের অবতারণা করিতে হইবে। তৎপরে ঐ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন বুঝিয়া শিশুরা যে জ্ঞানলাভের আগ্রহী হইবে তাহাই তাহাদিগকে যোগাইতে হইবে। বড়দের বিচারে জানা প্রয়োজন—এই দৃষ্টিতে শিশুকে কোনও পাঠ্য বিষয়ের সম্মুখীন করা হইবে না। আবার কোনও কাজ করিতে গেলে অনেকগুলি পাঠ্যসূচীভুক্ত বৌদ্ধিক বিষয়ের অবতারণা সহজ হয়—এইজন্য ঐ কাজটি নির্বাচিত করা হইবে না। কাজটিরই নিজস্ব প্রয়োজন বা সমাজমূল্য থাকিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে যদিও বৌদ্ধিক বিষয়ের প্রতি অবহেলা করা হয় নাই তবুও কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নিছক কাজের প্রয়োজনে যে বৌদ্ধিক বিষয় আসে তাহা কর্ম সম্পাদনের অন্তর্নিহিত তাগিদে শিখিবার এই ব্যবস্থাকে সাঙ্গীকৃত বৌদ্ধিক শিক্ষা বলা হয়। বিনোবা ভাবে ইহাকেই সমবায় বলিয়াছেন। এখানে জ্ঞান কর্মের সহায়ক হয় —যাহা জানা গেল তাহা কর্মে প্রযুক্ত হইবার সুযোগ থাকে। তাই এইক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম পৃথক করা যায় না—দুইই একে অপরকে সম্পৃক্ত করে। আদর্শ হিসাবে ইহা খুবই ভাল সন্দেহ নাই কিন্তু বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত কঠিন। শিশুরা এইরূপ কাজের মধ্য দিয়াই প্রচুর বৌদ্ধিক জ্ঞান অর্জন করিবে এমন কাজের প্রচুর ব্যবস্থা রাখা বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতে সম্ভব হইতেছে না, অথচ যথেষ্ট বৌদ্ধিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। বৌদ্ধিক জ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে ইহা মানুষকে নূতন নূতন পরিবেশের সহিত নিজেকে অভিযোজিত করার ক্ষমতা যোগায়। অপর পক্ষে, বৌদ্ধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য একটা ধারাবাহিকতার প্রয়োজন আছে। তাই বৌদ্ধিক জ্ঞানকে কাজের প্রয়োজনের

উপর একেবারে নির্ভরশীল করিয়া রাখিতে শিক্ষাব্রতীগণ ভরসা পাইতেছেন না এবং এই জন্যই গান্ধীজী বা ডিউই কাহারও শিক্ষামত পুরাপুরি অনুসৃত হইতেছে না।

ইহার পরেই কাজের উল্লিখিত গুরুত্ব বজায় রাখিয়া বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রতি অধিকতর অবহিতির প্রকাশ দেখা যায় সম্বন্ধিত শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে। এইক্ষেত্রে যে বৌদ্ধিক জ্ঞানটুকু কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তাহাতেই বৌদ্ধিক শিক্ষাকে আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ কাজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বৌদ্ধিক বিষয়সমূহের অবতারণা করা হয়। যেমন, শিশুরা চরকায় সূতা কাটিতেছে কিন্তু তাহারই সহিত সম্বন্ধিতভাবে (প্রসঙ্গ ক্রমে) বর্তমান বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে জানিতেছে, বিভিন্ন দেশের প্রধান উৎপাদনের কথা জানিতেছে ইত্যাদি। এই পদ্ধতির ত্রুটি এই যে এইক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বিষয়গুলির অবতারণার জন্য ব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার জন্য অনেক ক্ষেত্রে কাজটির সহিত বৌদ্ধিক বিষয়ের সংযোগ এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে কাজের সহিত ঐ বৌদ্ধিক বিষয়টির সংযোগ স্থাপনে শিক্ষকের কৌশলগত বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করিলেও মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠদান-পদ্ধতি হিসাবে উহার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, এক্ষেত্রেও বৌদ্ধিক বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয় ও অনেক সময় তাহার প্রয়োজনে নূতন নূতন কাজের আমদানী করিতে হয়। সুতরাং তখন কাজটির বাস্তব চাহিদা অপেক্ষা বৌদ্ধিক শিক্ষাদানে ঐ কাজটির উপযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করে ও পরিশেষে কাজ বৌদ্ধিক শিক্ষার উপলক্ষ মাত্র, এইরূপ দাঁড়ায়। এইক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ হইবে শিক্ষা কার্যে বিশেষতঃ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় কাজের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া বিদ্যালয়ে নানা কাজের ব্যবস্থা রাখা কিন্তু কাজের সহিত

সাঙ্গীকৃত বৌদ্ধিক শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে পৃথকভাবে বৌদ্ধিক শিক্ষা প্রদানের আয়োজনও রাখা। বর্তমানে এই মিশ্র-পদ্ধতি অধিকাংশ শিক্ষাবিদ অনুসরণ করিতেছেন।

উপরোক্ত মতানুসারে প্রথম শিক্ষার্থী শিশুদের ক্ষেত্রে তাহা-দিগকে নানা কাজকর্ম, গল্প, ভ্রমণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও আনন্দ-দায়ক অভিজ্ঞতার সহিত সাঙ্গীকৃত ভাবেই লেখা পড়া, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতির শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বৌদ্ধিক বিষয়ে জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকিবে। উচ্চতর শ্রেণীতে তাহারা আনন্দের সহিত শিল্প কাজ, বাগানের কাজ, ভ্রমণ, আনন্দানুষ্ঠান, সমাজসেবামূলক কাজ প্রভৃতি করিবে ও তাহার সহিত সাঙ্গীকৃত বৌদ্ধিক শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু ইহার সাথে সাথে ধারাবাহিকভাবে বৌদ্ধিক শিক্ষার আয়োজনও থাকিবে। ঐ বৌদ্ধিক শিক্ষার শ্রেণীতে তাহাদের পুঁথিগত জ্ঞানকে, তাহাদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও সাঙ্গীকৃত জ্ঞানের সাহায্যে জীবন্ত ও সুপ্রযুক্ত করার চেষ্টা করা হইবে। ইহার ফলে কাজ ও সাঙ্গীকৃত শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস না করিয়াই বৌদ্ধিক শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে।

বৌদ্ধিক শিক্ষালাভের কয়েকটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি :—

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে ডিউই শিক্ষায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। এই পদ্ধতির মূল কথা শিক্ষাকার্যে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা লইবেন না তৎপরিবর্তে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাকার্যে সক্রিয় অংশ লইবে। দৈনন্দিন শিক্ষাকার্যে আংশিক পরিমাণে শিক্ষার্থীগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বা পাঠ্যাংশ উপস্থাপিত হইবার পর উহার প্রয়োগ মাধ্যমে বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সক্রিয়

ভূমিকা, কিছু সক্রিয় অংশ পায় বটে কিন্তু শিক্ষকের প্রাধান্য থাকিয়াই যায়। বৌদ্ধিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে অধিকতর সক্রিয় অংশ দিবার জন্য বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ে সুযোগ সুবিধা অনুসারে ইহার কিছু কিছু অনুসরণ করিতে পারি। এখানে ঐরূপ কয়েকটি পদ্ধতি আলোচিত হইল।

ওয়ার্কশপ পদ্ধতি (Workshop Method)

ইহাতে শিক্ষার্থীগণ মিলিতভাবে কোনও বৌদ্ধিক কর্মে নিযুক্ত হইয়া কোনও একটি বিষয় সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশুরা রবীন্দ্র-শত-বার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত পরিচয় প্রদানকারী একটি পুস্তিকা প্রকাশের দায়িত্ব লইল। তাহারা কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া ও রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, তাঁহার সমাজ সেবামূলক কর্ম-প্রচেষ্টা, তাঁহার শিক্ষামূলক কর্ম-প্রচেষ্টা, তাঁহার দেশ বিদেশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, তাঁহার শিশু সাহিত্যে অবদান, তাঁহার সঙ্গীতের অবদান, তাঁহার চিত্রশিল্পে অবদান, তাঁহার প্রবন্ধাবলী, তাঁহার ছোট গল্প, তাঁহার নাটক, তাঁহার উপন্যাস, তাঁহার পত্রসাহিত্য, তাঁহার নাট্য-শিল্পে অবদান প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দল পৃথক ভাবে কাজ ভাগ করিয়া লইল। দলগুলি নিজ নিজ দলের ন্যস্ত অংশ সম্পাদনের জন্য যৌথভাবে পুস্তক পাঠ ও আলোচনাদি করিয়া উহার ভিত্তিতে বিবরণাদি রচনা করিবে ও কবিকৃতি হইতে অংশসমূহ নির্বাচন করিবে। বিভিন্ন দলের কাজ আবার সমবেতভাবে আলোচিত হইবে ও প্রয়োজনীয় সংশোধনাদির পরে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা সকলের দ্বারা রচিত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকেই সক্রিয় অংশ লইবার সুযোগ পায় ও প্রচুর

পাঠাগ্রহের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ব ও গণতান্ত্রিক মনোভাব বিষয়ে ইহা সহায়ক হয়।

সেমিনার পদ্ধতি (Seminar Method)

এই পদ্ধতির সহিত পূর্বোক্ত Workshop পদ্ধতির মিল রহিয়াছে। এক্ষেত্রে কোন বৌদ্ধিক বিষয় সৃষ্টির মত লক্ষ্য থাকে না, তৎপরিবর্তে কোনও বুদ্ধিপ্রধান সমস্যার সমাধানই এই পদ্ধতির লক্ষ্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায় একটি গ্রামের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব এই প্রশ্নটি এই পদ্ধতিতে আলোচিত হইবে। প্রথমে সাধারণ আলোচনায় সমস্যাটিকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হইবে ; যথা গ্রামের রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নতিবিধান, গ্রামের জল সরবরাহের উন্নতিসাধন, গ্রামের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন, গ্রামের স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন প্রভৃতি। প্রতিদিন তাহাদের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে সেই দিন মিলিত ভাবে অথবা সাধারণ সভা মিলিত ভাবে ঐ দলের আলোচ্য বিষয়কে কতকগুলি প্রশ্নের আকারে সাজাইবে। তৎপরে দলের যোগদানকারীগণের কাজ হইবে আলাপ আলোচনা, প্রামাণ্য পুস্তক ও দলিলের সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি সহায় উক্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা উপযোগী উত্তরটি নির্ধারণ করা। যেমন, গ্রামের জল সরবরাহের উন্নতি লইয়া যে দল আলোচনা করিতেছে তাহাদের কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা—(১) গ্রামে জল সরবরাহের বর্তমান ব্যবস্থা কি কি রহিয়াছে? (২) পুকুরগুলি হইতে যে জল পাওয়া যায় তাহা কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহৃত হইতেছে ? (৩) ঐরূপ ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত কি ?

(৪) পানীয় হিসাবে পুকুরের জল কাহারা ব্যবহার করেন? (৫) তাঁহারা কেন ঐরূপ দূষিত জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করেন? ইত্যাদি

বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণের জন্য যোগদানকারীগণ যতদূর সম্ভব বাস্তব তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান করিবে এবং ঐ বিষয়ে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজন তাহাও সংগ্রহ করিবে। এই জন্য যোগদানকারীগণকে ব্যক্তিগতভাবে এক এক ধরণের তথ্য সংগ্রহের ভার প্রতিদল হইতে দিতে পারা যায়। এইভাবে প্রতি ব্যক্তিই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাইতে পারে। মাঝে মাঝে সাধারণ আলোচনার ব্যবস্থা রাখিয়া তাহাতে বিভিন্ন দলের আলোচনার অগ্রগতি জানাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে ব্যক্তিগত জ্ঞান দলগত জ্ঞানে ও দলগত জ্ঞান যৌথ জ্ঞানে পরিণত হইতে থাকে। বর্তমানে সেমিনর পদ্ধতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রযুক্ত হইতেছে। অবশ্য এই পদ্ধতি নিম্ন-বুনিয়াদী শ্রেণীর বিশেষ উপযোগী নহে, কারণ ইহার জন্য বেশী বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

সিণ্ডিকেট স্টাডি (Syndicate Study)

এই পদ্ধতিও সেমিনর পদ্ধতির অনুরূপ কিন্তু ইহার আলোচ্য বিষয় সেমিনরের আলোচ্য বিষয়ের মত বিশেষ সমস্যা নহে, অনেকটা তাত্ত্বিক ও সাধারণ ধরণের সমস্যা। এইজন্য ইহাতে কোনও একটি সমস্যার পর্যালোচনার জন্য যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অপেক্ষা পুস্তকাদির সাহায্য বেশী প্রয়োজনীয়। ইহাতে পড়াশুনার প্রয়োজন অধিক হয় ও উচ্চতর শ্রেণীর ক্ষেত্রেই ইহা উপযোগী হইতে পারে। মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের শেষের শ্রেণীতে ইহার প্রয়োগ চলিতে পারে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাস্তরেই ইহা উপযোগী হইবে।

উদাহরণ দিয়া বুঝিবার জন্য একটি সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়ের নাম করা যাউক: "শিল্পোন্নতির বর্তমান ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের গ্রামগুলির ভবিষ্যৎরূপ কিরূপ হইবে?"

এক্ষেত্রে আমরা বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিতে পারি। (১) অতীতের ভারতীয় গ্রামগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো কিরূপ ছিল? (২) ইংরাজ রাজত্বকালে বিদেশী শিল্প সম্পদ আমদানীর প্রভাবে ইহা কি রূপ পাইয়াছিল? (৩) এইদেশীয় রাজনৈতিক নেতাগণ স্বাধীনতার পূর্বযুগে ভারতীয় গ্রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপ চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন? (৪) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে গ্রামগুলির পরিবর্তন ধারা ঐসব নেতাদের মধ্যে কাহাদের পূর্বাভাস সমর্থন করিতেছে? (৫) বর্তমান সমাজবিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন?

উপরের আলোচনায় দেখা যাইবে এই পদ্ধতি কোনও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপেক্ষা তাত্ত্বিক বিষয়ের ব্যাপক ও পর পর সম্পর্কযুক্ত জ্ঞানাহরণের সুযোগ অধিক পাওয়া যায়?

আমরা যে কয়েকটি গণতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার্জন পদ্ধতির নাম করিলাম তাহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীগণই শিক্ষাকার্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য উপদেষ্টা হিসাবে শিক্ষক ও অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনারত দলগুলির সহিত থাকিবেন ও তাঁহাদের উপস্থিতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারাই আলোচনা অভীষ্ট খাতে চলিবে সুতরাং তাঁহারা গৌণ নহেন। এই পদ্ধতিগুলির আর একটি বিশেষ সুবিধা—ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় অধিকতর

বাস্তবভিত্তিক হয় এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলির কৃত্রিম ব্যবধান লোপ পায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভ সময়সাপেক্ষ। তথাপি বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীতে বিশেষতঃ কিশোরবয়স্কদের শিক্ষার পদ্ধতিগুলি সুফলপ্রসূ হইবে মনে হয়। ডিবেট বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিষয় বস্তুর আলোচনাগুলি যেমন একদিক ঘেঁসা হয় এখানে তাহা না হইয়া অধিকতর সমতাধর্মী হয়—সুতরাং ইহা বিতর্ক প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সুফলপ্রসূ হইবে মনে.হয়। তাহা ছাড়া বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অধীত জ্ঞানের প্রয়োগ ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ থাকিলেও বিতর্ককালে পুস্তকাদি পাঠের তেমন সুযোগ থাকে না। কিন্তু উল্লেখিত পদ্ধতিতে পুস্তকের সাহায্য লওয়ার অধিকতর সুযোগ থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পাঠদান সহায়ক উপকরণাদি (Aids to teaching)

বৌদ্ধিক বিষয়ে শিক্ষাদানে সাফল্য লাভের জন্য সুশিক্ষক যে নীতিগুলি সর্বদাই স্মরণে রাখেন তাহার মধ্যে এই তিনটি প্রধান— (১) বাস্তব হইতে কল্পনা, (২) সহজ হইতে কঠিন, (৩) নিকটবর্তী হইতে দূরবর্তী ।

(১) শিক্ষাকার্যে কল্পনার প্রয়োজন অত্যধিক এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কি কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যাইতে হয়—অমূর্ত চিন্তনের ক্ষেত্রে পৌঁছাইতে হয়—যেমন উচ্চতর গণিতের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রথমে বাস্তব লইয়াই শিক্ষাকার্য সুরু করিতে হইবে কারণ কল্পনা বাস্তব অভিজ্ঞতা সহায়েই জন্মলাভ করে। যে শিশু পাখী অথবা ঘোড়া দেখে নাই বা তাহার সদৃশ কিছু দেখে নাই তাহার পক্ষে "পক্ষীরাজ ঘোড়া" কল্পনা করা সম্ভব হইবে না। তাই সুশিক্ষক কোন কল্পিত বিষয় সম্বন্ধে শিশুকে ধারণা দিতে হইলে তাহার সহায়ক হিসাবে নানা বাস্তব নিদর্শন বা উদাহরণ ব্যবহার করিবেন। (২) শিশুরা প্রথমেই জটিল বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না সেইজন্য প্রথমে সহজ বিষয়ের অবতারণা করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ কঠিন পাঠ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাতে শিশুরা সহজ পাঠটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারায় যে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিল তাহা অপেক্ষাকৃত কঠিন পাঠ হৃদয়ঙ্গমে সাহস প্রদান করে—অপর পক্ষে তাহার কঠিনতর পাঠের অনেকাংশ জানা থাকায় অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশগুলিতে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতে পারে। (৩) নিকটের বস্তুর প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে কিন্তু

যাহা তাহার জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সংযুক্ত নহে তেমন বিষয়ে সে তেমন আগ্রহ অনুভব করে না। এইজন্য সুশিক্ষক তাহার শিক্ষাদান কার্য শিশুর প্রত্যক্ষ পরিবেশ হইতে সুরু করিবেন ও ক্রমশঃ দূরবর্তী ঘটনা বা বস্তুর প্রতি আগ্রহী করিয়া তুলিবেন।

বৌদ্ধিক শিক্ষাদান কার্যে উপরোক্ত নীতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীতে যে নানা উপকরণাদি ব্যবহৃত হয় তাহাই পাঠদান সহায়ক উপকরণ বলিয়া পরিচিত। উপকরণগুলির কতকগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া, ওজন করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়; কতকগুলি শুধু দেখিতে ও শুনিতে পায়। শেষোক্তগুলিকে শ্রবণ-ইক্ষণ সহায়ক উপকরণ (Audio Visual Aids) বলা হয়।

এই সব শিক্ষাদান সহায়ক উপকরণ শিক্ষাদান কার্যে নিম্নলিখিত ভাবে সহায়তা প্রদান করে :—

(১) শিক্ষার্থীর মনোযোগ শিক্ষণীয় বিষয়ে আকৃষ্ট করে। সচিত্র পুস্তক দেখিলে শিশু পড়িতে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রেণীতে কোনও বিশেষ শিক্ষোপকরণ লইয়া গেলে শিশু উহার সম্বন্ধে আগ্রহী হইয়া উঠে ও পাঠে মনোযোগী হয়।

(২) ইহা শিক্ষাকার্যকে বাস্তবাশ্রয়ী করে :—বিভিন্ন পত্রের আকার বিষয়ে পাঠ দিবার সময় শিশুরা পত্রগুলি সাক্ষাতভাবে দেখিলে অধিকতর ধারণা লাভ করিতে পারে। যদি তাহারা নিজ হাতে শ্রেণী বিভাগ করিতে পারে তবে পাঠটি আরও সুস্পষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় বিষয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। শিক্ষাকার্যে যতগুলি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যাইবে শিক্ষণীয় বিষয় ততই শিশুর নিকট বেশী আয়ত্ত-সাধ্য হইয়া উঠিবে।

(৩) শিক্ষাকে প্রয়োগধর্মী করে :—বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিলে শিশুরা যাহা শিখিবে তাহা জীবনে প্রয়োগ

করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে ইহা স্বাভাবিক। ইহার ফলে তাহারা জীবনে সচেতন হইয়া উঠিবে; অর্থাৎ জীবনে তাহারা যে সব বাস্তব ঘটনাবলীর সম্মুখীন হইবে সেইগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমে তৎপর হইবে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাদের জ্ঞানের প্রয়োগেও তৎপর হইবে।

(৪) শিক্ষায় আনন্দ-লাভ করে ও শিক্ষার প্রতি তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মৌখিক বর্ণনা শুনিয়া শিখিতে শিশুরা তেমন আনন্দ পায় না তাই শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হয় না। শিক্ষণীয় বিষয়কে তাহারা কঠোর কর্তব্যরূপেই গ্রহণ করে ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয় শিখিতে বা বিদ্যালয়টির পাঠ চুকাইবার পরে নিজ অন্তরের তাগিদে শিখিতে চাহে না। শিক্ষোপকরণাদির সহায়ে শিক্ষাকার্যকে আকর্ষণীয় করিলে শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিবে ও জ্ঞানার্জনের আগ্রহে নানা বিষয় শিখিতে চাহিবে। বিদ্যালয় জীবন শেষ হইলেও তাহারা নিজ প্রচেষ্টায় সারা জীবন শিখিবে।

(৫) উপকরণগুলি বিশেষ পাঠের স্মারক হিসাবে শিক্ষার্থীর মনে সংযুক্ত হওয়ায় বিষয়বস্তু তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকে।

শিক্ষোপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার :—

শিক্ষোপকরণের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল কিন্তু এই বিষয়ে আর একটি সতর্কতার কথাও মনে রাখিতে হইবে। যে কোন ভাল জিনিষের মতই ইহার ব্যবহার বিষয়েও মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। অত্যধিক উপকরণ ব্যবহার করিলে শিক্ষার্থী অনেক সময় পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সমস্ত মনোযোগ উপকরণের দিকেই ব্যয় করে। এইজন্য মাত্র সেই সব

উপকরণই বিশেষ কোন পাঠের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত যাহারা ঐ পাঠকে মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল করে। অপরপক্ষে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার বিকাশ-সাধনও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণ বিষয়গুলিও কল্পনা সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা মানসিক ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। তাই শিশু যতই পরিণতির পথে অগ্রসর হইবে ততই সাধারণ বাস্তব দ্রব্যসমূহের ব্যবহার শিক্ষাদান কার্যে কমাইতে হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে গল্প বলার উপকরণ হিসাবে ঐসব গল্পের চিত্র ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু ১২।১৩ বৎসরের শিশুকে সহজ গল্প বলিবার জন্য ঐরূপ চিত্রের ব্যবহার করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে শিশুগণের কল্পনাশক্তি বিকাশলাভ করে নাই। সাহিত্য শব্দ দিয়াই চিত্র অংকন করে। সুতরাং শুধু মৌখিক বর্ণনা শুনিয়া মানসচিত্র অংকন করার ক্ষমতার বিকাশ সাহিত্য শিক্ষার অন্যতম দিক। এইজন্য যখন শিশু সাহিত্য অনুধাবন। করিতে সক্ষম হয় তখন তাহাদিগকে চিত্র দেখাইয়া সাহিত্য পড়াইবার প্রয়োজন নাই বরং উহা সাহিত্য আস্বাদন ক্ষমতা বিকাশের পরিপন্থী হইবে। সুতরাং শিক্ষোপকরণ ব্যবহারে সংযম থাকা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য বুঝিয়া ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন বুঝিয়া শিক্ষোপকরণ নির্বাচন করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষোপকরণ :

১। বাস্তব নিদর্শনসমূহ (Specimens) যথা, সামুদ্রিক জীব-জন্তুর দেহাবশেষ, কেঁচো, শামুক প্রভৃতি জীবজন্তু, বিভিন্ন ফুল-ফল, পাখীর বাসা, পাখীর পালক, কীটপতঙ্গ বা তাহাদের দেহাবশেষ,

তাহাদের বাসা, মৎস্যাদি প্রাণী, তাহাদের দেহাংশ, উদ্ভিদের দেহাংশ, কঙ্কাল ইত্যাদি।

২। মডেল (Model) যথা, হৃদয়, ফুসফুস প্রভৃতি দেহযন্ত্রের মডেল ; ইঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্রের মডেল ; তাজমহল প্রভৃতি ঐতিহাসিক ইমারতের মডেল ; নদী-পর্বতাদির মডেল ইত্যাদি। বাস্তব নিদর্শন অপেক্ষা মডেল সাধারণতঃ কম বাস্তবজ্ঞান প্রদান করিলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহার সাহায্যে বস্তুটির বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবনে বাস্তব নিদর্শনের অপেক্ষাও অধিকতর সহায়ক হয় ; যেমন, বাস্তবভাবে কোনও জীবের হৃৎপিণ্ড দেখিলেও উহার ক্রিয়া ঠিকমত অনুধাবন করা যায় না, কিন্তু মডেল হইতে উহা ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। এইজন্য ইহা একটি মূল্যবান শিক্ষোপকরণ।

৩। চিত্র :—ফটোগ্রাফ, পোষ্টার, চার্ট, রেখাচিত্র প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। কোনও বাস্তব জিনিষের ধারণা প্রদানের জন্য ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র অত্যন্ত উপযোগী। জীবজন্তুদের স্বাভাবিক পরিবেশে অবস্থিতির ফটোগ্রাফ ঐসব জীবজন্তু সম্বন্ধে এমন কি বাস্তব অপেক্ষাও ভালরূপ ধারণা প্রদান করিতে পারে কারণ ঐসব জীবজন্তুকে চিড়িয়াখানায় বাস্তবভাবে দেখিতে পাইলেও তাহাদের স্বাভাবিক পরিবেশে দেখা ঘটে না। ফটোগ্রাফ ছাড়াও অনুকৃতি বা অঙ্কিত বাস্তব চিত্র সাহায্যেও বস্তুটির বাস্তবাশ্রিত ধারণা লাভ করা যায়। চার্টের চিত্রে চিত্রের সহিত বস্তুটির বিবরণাদি থাকে। পোষ্টারে বিবরণটিকে চিত্র সাহায্যে বুঝান হয়। রেখাচিত্র সাহায্যে বস্তুটর কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝান হয়। ফ্লাসকার্ড মাঝারি আকারের চিত্র। কোনও বিষয় পড়াইবার সময় যখন অনেকগুলি ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপিত

করিতে হয় তখন শিক্ষক উহা নিজের সম্মুখে ধরিয়া সকলকে দেখান। ব্যাঙএর ক্রমবিকাশ, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম অথবা কোনও গল্পের ঘটনা পরম্পরায় চিত্র এইভাবে দেখাইলে শিশুরা ভাল অনুধাবন করিতে পারে। ইহাতে শিশুরা একটি চিত্র একবার দেখার পরে উহার পরের চিত্রটি দেখে, তখন পূর্ব চিত্রটি দেখিতে পায় না। এই অসুবিধা থাকে না ফ্লানেলোগ্রাফে। একখণ্ড ফ্লানেল একটি কাঠের বা পিজবোর্ডের উপর আটকাইয়া ফ্লানেলোগ্রাফের বোর্ড নির্মিত হয়। চিত্রগুলির পিছনের কোণে শিরিষ কাগজ আটকান থাকে। ঐ চিত্রগুলি উক্ত ফ্লানেল মোড়া বোর্ডে চাপিয়া ধরিলেই আটকাইয়া থাকে আবার টান দিলে সহজে খুলিয়া আসে। গল্পের অথবা কোন পাঠের ধারাবাহিক চিত্রগুলি এইভাবে পর পর আটকাইয়া দিলে শিশুরা পাঠটি ভাল অনুসরণ করিতে পারে। যেমন, টিউবওয়েলের পিষ্টন নাড়াইলে কিভাবে জল উঠে তাহা বুঝাইবার ক্ষেত্রে পিষ্টনের বিভিন্ন অবস্থানে জলের অবস্থার চিত্র ফ্লানেলোগ্রাফে পর পর দেখাইলে শিশুরা সহজে পাঠটি অনুসরণ করিতে পারে।

৪। নক্সা :—কোনও স্থানের অথবা যন্ত্রের রেখাচিত্র বা নক্সা-স্থানটি বা যন্ত্রটি সম্বন্ধে ধারণালাভের সহায়ক হয়। পোষ্টারে এইরূপ নক্সা অঙ্কন করা যায় অথবা পুস্তকাদিতেও এইরূপ নক্সা থাকিতে পারে। ইহাও উত্তম শিক্ষোপকরণ।

৫। এপিডায়স্কোপ :—ইহা অপেক্ষাকৃত মূল্যবান যন্ত্র। ইহার সাহায্যে যে কোনও চিত্রকে বড় করিয়া পর্দার উপরে ফেলা যায়। সাধারণতঃ ইহার জন্য বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন, তবে কেরোসিনের তীব্র আলোক সাহায্যেও ইহা চালাইবার ব্যবস্থা থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা একটি উত্তম শিক্ষোপকরণ।

৬। চলচ্চিত্র ও সবাক-চলচ্চিত্র ঃ—বর্তমানে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের ও সহজ বহনক্ষম চলচ্চিত্র ও সবাক-চলচ্চিত্র যন্ত্র ও নানা শিক্ষা সহায়ক ফিল্ম শিক্ষোপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থী ঘটনাবলীর ক্রমপরিণতি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তাই ইহা মূল্যবান শিক্ষোপকরণ। কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে ইহা ব্যবহারের সুযোগ বিশেষ নাই। বর্তমানে সমাজ শিক্ষা বিভাগ ইহার কিছু কিছু সুব্যবস্থা করিতেছেন।

৭। ভৌগলিক জ্ঞানদানের জন্য বিশেষ শিক্ষোপকরণ ঃ—মানচিত্র, গ্লোব, চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান ও আবর্তন বুঝাইবার যন্ত্র; বিভিন্ন প্রকার প্রস্তর, খনিজ পদার্থ, শস্য প্রভৃতির নমুনা; বাষ্প প্রভৃতি। ভূগোল শিক্ষার জন্য ম্যাপ, গ্লোব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। ইতিহাস শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রেও মানচিত্র প্রয়োজনীয় উপকরণ।

৮। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের উপকরণাদি ঃ—বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতামাপক যন্ত্র, বায়ুচাপ পরিমাপক যন্ত্র, আদ্রতামাপক যন্ত্র, সূর্যঘড়ি প্রভৃতি। শিশুরা আবহাওয়ার তথ্য রাখিয়া ঐ কাজের মাধ্যমে আবহাওয়ার পরিবর্তনশীলতা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানলাভ করিলে ঐ জ্ঞান সুস্পষ্ট ও প্রয়োগ-শীল হয়। তাই এই উপকরণগুলিকেও প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ বলিতে হইবে।

৯। বিভিন্ন সম্পাদ্য শিক্ষা কাজের উপযোগী আসবাব ও যন্ত্রপাতি ঃ—কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় কর্মই বৌদ্ধিক শিক্ষা আহরণ করার বিশেষ উপায় বলিয়া গণ্য। তাই শিক্ষা কাজের জন্য হাতিয়ার, কাঁচামাল প্রভৃতিও শিক্ষোপকরণ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য।

১০। বাগানের কাজ করিবার হাতিয়ার ও উপকরণ:— যেহেতু বাগানের কাজ শিশুর বৌদ্ধিক শিক্ষালাভের একটি উত্তম উৎস তাই এই কাজের হাতিয়ার ও উপকরণগুলি প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। শিশুরা বাগানে কাজ করিতে গিয়া উদ্ভিদ, জীব ও আবহাওয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে ও শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতাকে বৌদ্ধিক শিক্ষাপ্রদান কার্যে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন।

১১। ব্ল্যাকবোর্ড (Black Board) :—ইহা একটি অত্যন্ত পরিচিত শিক্ষোপকরণ। কিন্তু ইহা অতি সাধারণ শিক্ষোপকরণ হইলেও ইহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। তাই শিক্ষককে ইহার সুব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হইতে হইবে। বোর্ডে শিক্ষার্থীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য বিষয়াবলী সংক্ষিপ্ত ভাষায় ও সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া দিলে তাহাদের পাঠ সহজবোধ্য হয়। বোর্ডের লেখা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল হওয়া চাই। যখন যে বিষয়টি লেখা হইবে তখন সেই বিষয় ছাড়া অন্য কোনও লেখা বোর্ডে থাকা ঠিক নহে। এইজন্য বোর্ড মুছিয়া ফেলার অভ্যাস গঠন করা প্রয়োজন। শ্রেণীতে পাঠদানের সময় শিক্ষক যখন বোর্ড ব্যবহার করিবেন তখন তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতিও সাথে সাথে অবহিত থাকিতে পারেন এবং শিশুরা যেন বোর্ডের লেখা ঠিকমত দেখিবার সুযোগ পায় এমনভাবে বোর্ডের নিকট দাঁড়াইয়া লেখার অভ্যাস করেন তৎপ্রতি শিক্ষকের অবহিতি প্রয়োজন। এইজন্য শিক্ষকের পাঠদানের সার্থকতা বিচারে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজে সাফল্য একটি বিশেষ বিষয়রূপে গণ্য।

১২। গণিত শিক্ষাদানের উপকরণ:—স্কেল, বাটখারা, মুদ্রা, জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কন সহায়ক যন্ত্রপাতি (Geometrical Instru-

ments), শিশুদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দিবার জন্য মন্টেসরী আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি, এবাকাস প্রভৃতি। গণিত শিক্ষায় শিশুরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিলে বিষয়টি সহজসাধ্য হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে গাণিতিক বিষয়গুলির বাস্তব ধারণা লাভের উপযোগী উপকরণাদি রাখা খুবই প্রয়োজনীয়।

১৩। সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি :—বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য প্রতি শিশুবিদ্যালয়ে ছোটখাট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার থাকা বাঞ্ছনীয়। নিম্ন শ্রেণীতে খুব বেশী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে না, ইহার অনেক যন্ত্র শিশুরা শিক্ষকের সাহায্যে ভাঙা টিনের কৌটা, কাঁচের পাত্র, রবারের নল, বোতলের ছিপি প্রভৃতি অকেজো জিনিষ হইতেই তৈয়ারী করিতে পারিবে। ঐরূপ ভাবে নিজেদের পরীক্ষার যন্ত্রপাতি নিজেরা করিয়া লইতে গিয়া তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আরও বিকাশ লাভ করিবে। এই কাজে "বিজ্ঞান সংঘ"—যাহার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে—যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে।

১৪। শরীর শিক্ষার সরঞ্জামাদি :—বাঁশি, বল, স্কিপিং দড়ি প্রভৃতি। যেহেতু শরীর শিক্ষা শিশুর বিকাশের একটি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ দিক তাই এই শিক্ষার যন্ত্রপাতিগুলিও শিক্ষাদানের জরুরী উপকরণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

১৫। স্বাস্থ্য শিক্ষার উপকরণাদি :—ওজন লইবার যন্ত্র, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চার্ট, পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক উপকরণাদি। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি হাতে কলমে শিখাইতে হইবে ও উহার বৌদ্ধিক দিকটিকেও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে তবেই

এই শিক্ষা পূর্ণতা পাইবে। তাই এই উপকরণগুলিও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষোপকরণ।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে বর্তমানে শিক্ষাকার্য শুধু শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ নহে; শিশুরা বাগানে কাজ করিতে করিতে, খেলার মাঠে খেলিতে খেলিতে অনেক শিক্ষালাভ সহায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিক্ষক তাহাদের সেই সব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বৌদ্ধিক শিক্ষাদানের ব্যাপারে ব্যবহার করিলে ঐ শিক্ষা প্রাণবন্ত হয়। এইজন্য ঐসব কাজের উপকরণ-গুলিও শিক্ষোপকরণ রূপে গণ্য হইয়াছে। ইহার সবগুলিকে বৌদ্ধিক শিক্ষার শ্রেণীতে লইয়া আসিতে হইবে এমন নহে। পাঠের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিই মাত্র বৌদ্ধিক শ্রেণীতে ব্যবহৃত হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষকের বিবেচনা ও মাত্রাবোধ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয়ে ঐগুলি থাকার প্রয়োজন আছে—যেন শিশুরা ঐগুলি হইতে নানা শিক্ষাসহায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কয়েকটি শিক্ষাদানের পরিকল্পনা

আমরা পূর্বেই শিক্ষাদান কার্যের পরিকল্পনার উপযোগিতা ও পরিকল্পনা রচনার কিছু কিছু উদাহরণ দেখিয়াছি। এখানে কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হইল। পরিকল্পনাগুলি বাস্তব ভিত্তিতে রচিত তাই এইগুলি শিক্ষকদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পরিকল্পনা রচনার সহায়ক হইবে আশা করা যায়।

ছোটদের প্রজেক্ট-এর পরিকল্পনা [ক্রীড়াভিত্তিক প্রজেক্ট Play Project।]

"পুতুলের সংসার" ১ম শ্রেণী ।

স্চনা :—ডিউই-এর মতে বাস্তব অবস্থা হইতে উদ্ভূত কোনও সমস্যামূলক কাজের সমাধানের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা হয় তাহাই 'প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা' আখ্যা লাভের যোগ্য। অবশ্য ঐ বাস্তব সমস্যা বড়দের দৃষ্টিতেই যে বিচার করিতে হইবে তাহা নহে; শিক্ষার্থী শিশুর দৃষ্টিতে উহা যদি সমস্যারূপে পায় তাহা হইলেও উহা শিক্ষা সহায়ক সমস্যা (Problem) বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। ৬-৭ বছরের শিশুর কাছে "পুতুল খেলা" জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক রূপে গণ্য হয় যদিও বড়দের কাছে উহা খেলা মাত্র। তাই "পুতুলের বিয়ে" ঐ বয়সের শিশুদের উপযোগী একটি project-রূপে গণ্য হইতে পারে। শিক্ষক এইরূপ project লইবার সময় শিশুদের স্তরে নিজেকে নামাইয়া তাহাদের একজন বয়স্ক সঙ্গীরূপে

তাহাদের সহিত মিশিবেন। তাহার পর তাহাদের নিকট ঐরূপ একটি খেলার প্রস্তাব আনিবেন। দেখা যাইবে শিক্ষকের সামান্য মাত্র ইঙ্গিত শিশুদিগকে ঐরূপ একটি খেলায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তৎপরে শিক্ষক তাহাদিগকে লইয়া নিম্নলিখিত পরিকল্পিত কাজটি গ্রহণ করিবেন :—"আমরা আমাদের পুতুলের বিয়ে দেব। আমরাই সব বিয়ের জোগাড় করব।"

দল গঠন :—তাহার পর শিশুদের সহিত আলোচনা করিয়া পুতুলের বিয়ের জন্য করণীয় কাজগুলির তালিকা তৈয়ারী করা হইবে। যথা—পুতুল তৈয়ারী করা ও রং দেওয়া, পুতুলের কাপড় ও সাজ-পোষাক তৈয়ারী করা, পাল্কী তৈয়ারী করা, বিবাহ মণ্ডপ তৈয়ারী করা, ভোজের জন্য খাদ্যাদি তৈয়ারী করা, নিমন্ত্রণ পত্র লেখা, বিবাহ বাসরের জন্য গান প্রভৃতি শেখা ইত্যাদি। ঐ কাজগুলি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। যথা :—

ক দল :—পুতুল তৈয়ারী করা ও রং দেওয়া।

খ দল :—পুতুলের জন্য কাপড়, পোষাক ইত্যাদি তৈয়ারী করা।

গ দল :—পাল্কী ও মঞ্চ নির্মাণ।

ঘ দল :—খাদ্যাদি ও পরিবেশন পাত্রাদির ব্যবস্থা করা, আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাদি করা।

ঙ দল :—বিবাহ বাসরে অভিনয়াদির সাজ-সজ্জা রচনা ও তাহার জন্য প্রস্তুতি।

সকল দলে মিলিতভাবে হিসাবপত্র লেখা।

প্রতিদিন কাজের পর শিশুরা কে কতখানি কাজ করিল, তাহার বিবরণ মৌখিকভাবে বলিবে ও দলগত বিবরণ হিসাবে নিজ

নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। বিবরণ ৬ বৎসরের শিশুর মতই সংক্ষেপ হইবে। শিক্ষক সাহায্য করিবেন। বিবরণের উদাহরণ ঃ— "আমাদের পুতুলের বিবাহ হইবে। আমরা ক-দল পুতুল তৈরি করছি। আজ ১৫টা পুতুল হয়েছে।" ইত্যাদি।

এই প্রোজেক্টটি ৩ দিনে শেষ করা সম্ভব। প্রোজেক্ট-এর শেষে শিশুরা একটি সভাতে মৌখিকভাবে নিজ নিজ মনোভাব বলিবে। তাহার পরে শিক্ষক তাহাদের সাহায্য লইয়া একটি শিশু উপযোগী ভাষায় বিবরণ প্রস্তুত করিবেন। উহা একটি দেওয়ালপত্র হিসাবে শিশুরা বাহির করিবে। ঐ বিবরণের জন্য শিশুরা কাজটিতে কয়ঘণ্টা শ্রম দিয়াছে ও কি অর্থ ব্যয় করিয়াছে তাহার হিসাবও করিবে। এই হিসাব করিতে গিয়া তাহারা সময় ও পরস্পরে হিসাব শিখিতে আগ্রহী হইয়া উঠিবে।

পোষ্ট অফিস খেলা—তৃতীয় শ্রেণী (বয়স ৮-৯ বছর)

সূচনা ঃ—এই বয়সের শিশুরা বয়স্কদের মত কাজ কর্ম করিতে ইচ্ছুক অথচ তাহারা তখনও কাল্পনিক কাজ করিতে যায়। তাই এই বয়সের শিশুদের পক্ষে এই ক্রীড়াভিত্তিক প্রোজেক্টটি শিক্ষা সহায়ক হইবে। ইহা শিশুদিগকে পোষ্ট অফিসের কাজকর্ম ভাল ভাবে বুঝিতে সহায়তা প্রদান করিবে এবং গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বৌদ্ধিক নিয়মাবলী সম্বন্ধিতভাবে শিখিতে আগ্রহী করিবে। কাজের প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনা রচনা ঃ—

ইহার জন্য শিশুকে বিধি বিষয়ে আগ্রহী করিয়া তুলিতে হইবে ও তৎপরে স্থানীয় পোষ্ট অফিস দেখাইয়া আনিতে হইবে। তৎপরে তাহারা, ঐ খেলাটির প্রস্তাব গ্রহণ করিবে ও তাহার জন্য কাজের তালিকা ও দল ভাল করিয়া পরিকল্পিতভাবে কাজগুলি করিবে।

দলভাগের নমুনা ঃ

ক দল ঃ—লেটার বাক্স তৈয়ারী করিবে।

খ দল ঃ—খাম, পোষ্টকার্ড, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি তৈয়ারী করিবে।

গ দল ঃ—পিওন ও রাণারের পোষাক তৈয়ারী করিবে।

ঘ দল ঃ—কৃত্রিম টাকা, পয়সা কাগজ কাটিয়া তৈয়ারী করিবে।

তাহাদের কাজগুলি হইয়া গেলে কৃত্রিমভাবে খাম পোষ্টকার্ড বিক্রয়, চিঠি Sorting করা, রাণারের ডাক বহন ইত্যাদি কাজগুলি করিবে।

ঠিকানা লেখা প্রসঙ্গে সহজ ভূগোল, খাম পোষ্টকার্ড বিক্রয় প্রসঙ্গে গণিত, রাণার পিওন প্রভৃতির কাজ প্রসঙ্গে সমাজবন্ধুদের কথা ও বিবরণ লেখা প্রসঙ্গে সাহিত্য পাঠ প্রদত্ত হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য খাতা বাঁধাই, পাপোষ তৈয়ারী প্রভৃতি ছোট ছোট শিল্প কাজও প্রোজেক্ট হিসাবে লওয়া যায়।

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য অপেক্ষাকৃত বাস্তব প্রোজেক্ট লওয়া যায় যেমন, বনভোজন। পঞ্চম শ্রেণীতে বৃক্ষ রোপণ উৎসব, শারদীয় পত্রিকা রচনা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রোজেক্ট লওয়া যায়।

এখানে প্রোজেক্টগুলির আগ্রহে বৌদ্ধিক শ্রেণী গ্রহণের অনেকগুলি নমুনা প্রদত্ত হইল।

প্রজেক্ট ছাড়া দৈনন্দিন কর্তব্যকর্ম যথা, বাগানের কাজ ইত্যাদি এবং কোনও সামাজিক অথবা প্রাকৃতিক ঘটনার অভিজ্ঞতাকে ও বৌদ্ধিক পাঠের আগ্রহ হিসাবে গ্রহণ করিয়া সম্বন্ধিত বৌদ্ধিক পাঠ ভালভাবেই প্রদত্ত হইতে পারে। তবে ঐ পাঠ-গুলিকে যতদূর সম্ভব কর্মাশ্রিত করিলে বেশী আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এইখানে সেইরূপ বৌদ্ধিক পাঠেরও কিছু কিছু নমুনা প্রদত্ত হইল।

সাধারণ কাজকেও প্রোজেক্টএর রূপ দেওয়া যায়, যেমন দৈনন্দিন সাফাই কাজ ছাড়া প্রতি সপ্তাহের জন্য যদি বিশেষ একটি কাজ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে সাফাই রূপ নিত্যনৈমিত্তিক কাজটি প্রোজেক্টএর রূপ পাইবে। মনে করুন শিশুরা একটি সপ্তাহের মধ্যে বাগানের একটি বেড়া ও গেট তৈয়ারীর পরিকল্পনা লইল; তাহা হইলে দৈনন্দিন বাগানের কাজটি একটি প্রজেক্ট বা প্রকল্পের রূপ পাইল। এইভাবে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও সময়-সীমা রাখিয়া কাজ করিতে গেলে বেশী সচেতনা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। তাই নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পাদন অপেক্ষা এইরূপ কাজে আগ্রহ ও বৌদ্ধিক চর্যার সুযোগ বেশী পাওয়া যায়। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনাত্মক ও সমাজসেবামূলক কাজকে সাধরণতঃ প্রজেক্টরূপ দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা মূলতঃ ডিউইএর প্রজেক্টগুলি হইতে স্বতন্ত্রধর্মী। গান্ধীজীর জন্মতিথিতে দিবার জন্য যখন শ্রেণীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতা উৎপাদন করার পরিকল্পনা লওয়া হয় তখন ঐ দৈনন্দিন কাজটিই কিছুটা প্রজেক্টধর্মী হইয়া যায়। এখানে ঐরূপ প্রকল্পেরই অধিক উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

১নং পাঠ পরিকল্পনা

১ম শ্রেণী

নাটক অভিনয় আগ্রহ সহায়ে সাহিত্য পাঠ

[শিশুরা রামধনুর অভিজ্ঞতাকে নাটকে রূপ দিয়াছিল]

সময়-বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিচালিত হইবে	মন্তব্য
১১-৪৫—১২-৩০ মি.	সাহিত্য—বিশেষ পাঠ—আমন্ত্রণ পত্র লেখা।	প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ, আমন্ত্রণ পত্র লিখিতে ও পড়িতে শেখান।	চক্, বোর্ড, ডাষ্টার, আমন্ত্রণপত্রের নিদর্শন এবং প্রদীপণ।	শিশুরা রামধনু দেখিয়া আনন্দিত হওয়ায় রামধনু দিয়া একটি ছোট গীতি-নাট্য অভিনয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদিগকে তাহাদের নাটক দেখিবার জন্য লোক-দিগকে আমন্ত্রণলিপি লিখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া নিমন্ত্রণপত্র লেখান হইবে। আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নের সাহায্যে অগ্রসর হইব।	

(১) তোমরা আজ কি অভিনয় করবে ?

(২) তোমাদের অভিনয় কেমন হবে আশা করছ ?

(৩) তোমাদের অভিনয়টি লোকে দেখুক এটা তোমরা পছন্দ কর তো ?

(৪) তোমরা যাদের নিমন্ত্রণ করনি তারা দেখতে এলে তোমরা কি করবে ?

(৫) যদি অনেক লোক এসে পড়ে তবে কি করবে ?

(৬) তোমরা যদি টিকিট কর তাহলে নিমন্ত্রিতরা ও যারা টিকিট কিনেছে তারাই শুধু আসবে—এই ব্যবস্থা ভাল নয় কি ?

তারপর শিশুদের নিয়ে ১ নঃ পঃ দশটি, ২ নঃ পঃ দশটি, ৩ নঃ পঃ দশটি টিকিট করান হবে।

টিকিটে লেখা থাকবে

টিকিট ১ নয়া পয়সা

ইত্যাদি

যে ছেলেরা মাত্র সংখ্যা লিখতে ও গুণতে জানে তারা ১ নঃ পঃ-এর টিকিট করবে। এইভাবে যারা আরও কিছুটা জানে তারা ২ নঃ পঃ-এর টিকিট করবে এবং অগ্রগামীরা ৩ নঃ পঃ এর টিকিট করবে। টিকিট করা হলে তাদের দিয়ে কত টিকিট হ'ল তা কৃত্রিম নয়া পয়সা সাহায্যে হিসেব করান হবে। যেমন :—

দশটি ১ নঃ পঃ টিকিট=১০ নঃ পঃ
দশটি ২ নঃ পঃ „ =১০×২=২০ নঃ পঃ
দশটি ৩ „ „ „ =১০×৩=৩০ নঃ পঃ

এই হিসাব প্রসঙ্গে ২ ও ৩ এর ঘরের নামতা শেখান হবে যথা—২টি ২ নঃ পঃ টিকিট=৪ নঃ পঃ, ৩টি ২ নঃ পঃ =৬ নঃ পঃ ইত্যাদি ; তারপর টিকিট বিক্রয় করতে পাঠাব।

তারপর শিশুদের দিয়ে তাদের মঞ্চসজ্জা করিয়ে ফেলা হবে। সূর্যের প্রতীকটি মঞ্চের পশ্চাতপটে রাখা হবে ও সবাইকে পূর্বের নির্দেশমত যথাযথভাবে সাজতে ও দাঁড়াতে সাহায্য করা হবে। কয়েকজন শিশু আমন্ত্রিতগণকে ডেকে আনবে। যাদের টিকিট দিয়ে এসেছে তাদেরও ডেকে আনবে। তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করে তাতে সাহায্য করব—ভুল হ'লে সংশোধন করতে সাহায্য করব। অভিনয়ের শেষে জিনিষপত্র গুছিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে ছুটি দেব।

৩নং পাঠ পরিকল্পনা

১ম শ্রেণী

পাঠ পরিচয় :—"ছড়ার" মাধ্যমে সাহিত্য পাঠ

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিচালনা করা হইবে	মন্তব্য
৭-২০ হইতে ৭-৫৫	ছড়া "ছাদনা তলায় আজকে হবে পুতুল মণির বিয়ে, তাইতো অনেক লোক জুটেছে বিয়ের জিনিষ নিয়ে। পাল্কী চড়ে বর এলো যে টোপর মাথায় দিয়ে, মিনু এলো বর দেখতে নোলক নাকে দিয়ে। ওরে, পুতুল মণির বিয়ে।	শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, প্রকাশভঙ্গীর উন্নতি, ভাবগ্রহণের ক্ষমতা লাভ, মৌখিক আত্ম-প্রকাশ ও ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, লজ্জা ও জড়তা নাশ, মর্মগ্রহণের ক্ষমতা লাভ।	প্রদীপণ, চক্, বোর্ড।	প্রথম শ্রেণীর শিশুরা কয়েক দিন হইতে মাটি, কাগজ ও পেষ্টবোর্ড প্রভৃতি দ্বারা পুতুলের সংসার ও পুতুলের বিয়ের জিনিষপত্র তৈয়ারী করিয়াছে। শ্রেণীতে উপস্থাপিত কাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া আজ শ্রেণীতে "পুতুল মণির বিয়ে" নামক ছড়াটি শিখাইব।	

এই উদ্দেশ্যে শিশুদের আগ্রহী করিবার জন্য শ্রেণীর হাতের কাজের উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিব ঃ—(ক) পুতুলের বিয়ে কবে ? (খ) পুতুলের বিয়ে দেবার জন্য তোমরা কি কি কাজ করেছ? বিয়ের সভাতে বিয়ের সম্বন্ধে আমরা আজ একটি কবিতা শিখব।

এইভাবে শিশুদের পাঠে আগ্রহী করিয়া তাহাদের নিকট "পুতুল মণির বিয়ে" ছড়াটি প্রদীপণ সহ উপস্থাপন করিব। প্রদীপণের ছবি দেখাইয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিব—(ক) ছবিতে কি দেখছ ? (খ) কার বিয়ে হচ্ছে ? (গ) পুতুলমণি কিসের উপর বসে আছে ? ইত্যাদি। পরে সর্বপ্রথম আমি ছড়াটি সুন্দরভাবে তাল ও ছন্দ সহকারে আবৃত্তি করিব। পরে শিশুদের দ্বারা সমবেতভাবে ও এককভাবে আবৃত্তি করাইব। প্রয়োজন মত উচ্চারণের ভুল সংশোধন করিয়া দিব।

ছড়াটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার জন্য কোথায় কিরূপ অঙ্গভঙ্গী করা দরকার তাহা শিশুদের দ্বারা স্থির করিয়া লইব।

শিশুদের সহযোগিতায় নিম্নানুরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছড়াটির বিষয়বস্তু শিশুদের উপযোগী করিয়া বুঝাইয়া দিব। (ক) ছাদনা তলায় কি হবে ? (খ) পুতুল মণির কার সঙ্গে বিয়ে ? (গ) বর কিসে করে এল ? (ঘ) তোমরা পালকী দেখেছ ? পালকী কারা নিয়ে আসে ? (ঙ) বরের মাথায় কি থাকে ? (চ) কনের মাথায়ই বা কি থাকে ? ইত্যাদি।

শিশুদের সহযোগিতায় ছড়াটির দুই একটি শব্দের অর্থ শিশুদের উপযোগী করিয়া বুঝাইয়া দিব। যেমন— ছাদনাতলা, জুটেছে, নোলক ইত্যাদি।

• সম্পূর্ণ ছড়াটির অর্থ শিশুরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ছড়াটির উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিব ঃ—(ক) পুতুল মনির বিয়ে কোথায় হচ্ছে ? (খ) লোকেরা কি এনেছে ? (গ) বর কিসে করে এলো ? (ঘ) বরের মাথায় কি আছে ? ইহার উত্তরগুলি বিভিন্ন কার্ডে লেখা থাকিবে। শিশুদের এক এক জন আসিয়া ঐ উত্তর লিখিত কার্ডগুলি হইতে বিশেষ উত্তরটি বাছিয়া দেখাইবে। পরে শিশুদের কয়েকটি দলে ভাগ করিয়া প্রত্যেক দলকে একটি করিয়া ছড়া লিখিত কাগজ ও ছড়াটির শব্দ অনুয়ায়ী একটি করিয়া শব্দথলি দিব। শিশুরা ছড়াটি দেখিয়া শব্দগুলি পর পর সাজাইবে। এই কাজে উৎসাহ দিবার জন্য যে দল তাড়াতাড়ি পারিবে ও নির্ভুল করিবে তাহারা খেলায় জয়ী হইবে বলিয়া ঘোষণা করিব।

আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিব ও প্রয়োজন মত শিশুদের সাহায্য করিব।

৪নং পাঠ পরিকল্পনা

১ম শ্রেণী

পাঠ পরিচয় ঃ—লটারীর খেলা মাধ্যমে গণিতের পাঠ

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিকল্পনা করা হইবে	মন্তব্য
১-১৫ মিঃ হইতে ২-২৫ মিঃ	গণিত—যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধে ধারণা	হিসাব বোধ	চক্, বোর্ড, ঝাড়ন, খেলার উপকরণাদি ও খেলার চার্ট, বিভিন্ন দলের প্রতীক, পুরস্কার বিতরণের দ্রব্যাদি	শিশুরা এতদিন পুতুলের মেলার জন্য বিভিন্ন প্রকার জিনিষ তৈরী করেছে এবং ঐ সকল জিনিষ তারা মেলায় ঘর তৈরী ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। তাদের কাজের আগ্রহকে কেন্দ্র করে আমি নিম্নরূপ প্রশ্নের সাহায্যে উদ্দিষ্ট পাঠের প্রতি তাদের মনকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট থাকব।	

৪নং পাঠ পরিকল্পনার সংলগ্ন (পঞ্চম ঘর)

(১) তোমরা পুতুলের মেলাতে কি কি করেছ ?
(২) তোমরা কি কোন মেলায় গিয়েছ ?
(৩) মেলাতে কি কি দেখা যায় ?
(৪) তোমাদের পুতুলের মেলাতে কি কি আছে ?
(৫) তোমরা কি সার্কাস দেখেছ ?
(৬) সার্কাসে কি দেখতে পাওয়া যায় ?
(৭) তোমাদের কি খেলা ভাল লাগে ?
(৮) তোমাদের মেলায় কি তোমরা কোন নতুন খেলা খেলতে চাও ?

এভাবে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করে (নতুন খেলার প্রতি) আমি খেলার নিয়ম-কানুন নিম্নলিখিতভাবে তাদের বুঝিয়ে দেব।

তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই চৌকো কাঠটির প্রতিটি গায়ে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ টী করে কতকগুলি গোল দাগ দেওয়া আছে। কাঠটীকে একটি টিনের কৌটায় রেখে বেশ করে নাড়বে এবং তারপর কাঠটীকে চেলে দেবে। এভাবে যেদিক উপরে থাকবে সেদিকে যতগুলি গোল থাকবে তত সংখ্যা খেলোয়াড় পাবে। এরপর নিজে খেলে তাদের দেখাব।

এইবার খেলাটি স্বরু করার আগে শিশুদের সমান সংখ্যায় ৪টি দলে ভাগ করে দেব এবং প্রত্যেক দলের শিশুদের একটি করে চার রঙের প্রতীক চিহ্ন লাগিয়ে দেব। প্রত্যেক দলের একটি করে নাম রাখব—বেল, গোলাপ, পদ্ম ও শিউলী দল। এই নামগুলি তাদের প্রতীকে লেখা থাকবে।

এবারে প্রতি দল হতে এক এক জন করে এসে খেলবে ও তারা নিজে নিজে প্রত্যেকের প্রাপ্ত সংখ্যা বোর্ডে লিখে যাবে। এরপর আমি প্রত্যেক শিশুকে তাদের নিজ নিজ দলের প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি শ্লেটে যোগ করতে বলব। শিশুরা যখন শ্লেটে অংক কষবে তখন আমি ঘুরে ঘুরে তাদের অংক দেখব এবং প্রয়োজন বোধে সাহায্য করব। পরীক্ষা করে নির্ভুল হ'লে আমি তা বোর্ডে লিখে রাখব।

এখন শিশুদের জিজ্ঞাসা করব :—

(ক) তোমাদের মধ্যে কোন্ দল সবচেয়ে বেশী পেয়েছ ? দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে কোন্ দল ?

(খ) কোন্ দল সবচেয়ে কম পেয়েছ ?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির দ্বারা তাদের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান অধিকারী দলের নাম স্থির করতে বলব এবং প্রশ্নের উত্তরদানে তা তারা স্থির করবে। প্রয়োজন বোধে আমি সাহায্য করব।

যদি সময় থাকে তবে এই খেলাটি আরও ২।৩ বার ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাব। খেলা শেষে আমি তাদের আনন্দ বর্ধনের জন্য প্রতি দলকে তাদের নিজেদের হাতে তৈরী চারটি পুরস্কার (কাগজের মেডেল) দেব।

৫নং পাঠ পরিকল্পনা

২য় শ্রেণী

"শরৎ বন্দনা" উৎসব পালনের জন্য পুষ্পচয়ন করার পরে ফুলের অংশগুলির সহিত পরিচয় লাভ

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালনা ও পরিকল্পনা	মন্তব্য
১২-২০ মিঃ হইতে ১ঘঃ	'পরিবেশ পরিচিতি' বিশেষ পাঠ— শরতের ফুল সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা ও ফুলের অংশগুলি চেনা	পরিবেশ সচেতনা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ	বোর্ড, চক্, ঝাড়ন, ফুল	শিশুরা আজ শরৎ উৎসব করবে তার জন্য বিভিন্ন ফুল এনেছে। এই শ্রেণীতে সেই সম্বন্ধে প্রসঙ্গ সৃষ্টি করে ফুল চেনা ও ফুলের অংশ চেনার আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে। আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাদের নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন করব।	

(১) আজ তোমরা কি উৎসব করবে ?

(২) ঐ উৎসবের জন্য কি কি জিনিষ এনেছ ?

(৩) তোমরা উৎসবে কোন্ কোন্ ফুল এনেছ ?

(৪) এ সময় আর কোন্ কোন্ ফুল ফুটতে দেখেছ ?

(৫) ঐগুলি যখন শরৎ কালে ফোটে তখন ঐ গুলিকে শরতের ফুল বলা হয়—তাই না ?

(৬) তা হলে শরতের ফুলগুলির নাম বল তো ? অতঃপর শিশুদের সাহায্য নিয়ে বোর্ডের একটি পাশে উপর হতে নীচে এই পর্যায়ে ফুলগুলির নাম লিখব। যথা :—

শরতের ফুলের নাম। গন্ধ আছে কি নেই। বর্ণ।

১। পদ্ম

২। শিউলী

৩। অপরাজিতা ইত্যাদি

অতঃপর শিশুদিগকে প্রশ্ন করা হবে—এদের মধ্যে কোন্গুলির গন্ধ আছে আর কোন্গুলির গন্ধ নেই। ঐ ফুলগুলির পাশে পাশে যে গুলির গন্ধ আছে সেগুলির পাশে লিখবো—'আছে' আর যেগুলির নেই সেগুলির পাশে লেখা হবে—'নেই'। অতঃপর আবার বিভিন্ন ফুলের কি বর্ণ তা ফুলের পাশে পাশে লেখা হবে। অতঃপর ফুলগুলি হতে ফল হয় কিনা, দিনে ফোটে, না রাতে ফোটে—সে বিষয়েও প্রশ্ন করে ঐ ভাবে তালিকাটি সম্পূর্ণ করা হবে।

শিশুরা তালিকাটি খাতায় লিখে নেবে। এবার শিশুদের কয়েকটি ফুল দিয়ে দেখাব যে প্রত্যেক ফুলের পাপড়ি বা দল, বৃতি বা গোড়া এবং কেশর আছে। অনেক ফুলের দু রকম কেশর আছে, অনেক ফুলের এক রকম।

বেশী সংখ্যক সাদা ফুলের গন্ধ থাকে, কম সংখ্যক রঙিন ফুলের গন্ধ থাকে—তাও বুঝতে সাহায্য করা হবে। তাছাড়া রঙিন ফুল যে দিনে ফোটে এবং সাদা ফুল যে রাতে ফোটে তাও বুঝতে সাহায্য করা হবে। রাতে রঙ দেখা যায় না তাই রঙিন ফুল রাতে না ফুটে দিনে ফোটে—তা বুঝতে সাহায্য করা হবে। ফুলের কেন গন্ধ ও রঙ ধরে তা সংক্ষেপে বলে দেওয়া হবে। ফুল গন্ধ আর রঙ দিয়ে মৌমাছি, প্রজাপতিকে নিমন্ত্রণ করে আনে—তারা ফুলকে ফল তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করে।

তারপর নিম্নলিখিত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করা হবে।

১। তিনটি গন্ধযুক্ত শরতের ফুলের নাম বল।

২। রাতে রঙিন ফুল কেন ফোটে না ?

৩। সাদা ফুলের গন্ধ থাকে এর কারণ কি ?

৪। ফুলের গন্ধ ও রঙ তার কোন্ কাজে লাগে ?

৬নং পাঠ পরিকল্পনা

তৃতীয় শ্রেণী

পাঠ পরিচয় ঃ—কিশলয়ের "নানা দেশের ছেলেমেয়ে" গল্পটির নাটকীকরণ মাধ্যমে সাহিত্য পাঠ

সময় বন্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালন পরিকল্পনা	মন্তব্য
৬-৫০—৭-৩০	সাহিত্য—মণ্টুর ইটালী দেশ ভ্রমণের বিবরণ পাঠ ও তাহার নাটকীকরণ।	চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশসাধন, ভাষা-জ্ঞান ও শব্দসম্ভার বৃদ্ধি।	প্রদীপণ, আগ্নেয়গিরির মডেল, চক্, ডাষ্টার, বোর্ড ইত্যাদি।	শিশুরা 'নানাদেশের ছেলেমেয়ে' গল্পটিকে দৃশ্যাদি সহ নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয় করিবে। সেইজন্য তাহারা প্রস্তুত হইতেছে এবং ইতি-পূর্বে মণ্টুর চীন, জাপান, গ্রীণল্যাণ্ড ভ্রমণের অংশটি নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয়ের মহড়া দিয়াছে। এই শ্রেণীতে ইটালী ভ্রমণের অংশ নাটকাকারে লিখিয়া উহার মহড়া দিতে সাহায্য করা হইবে ও ঐ কাজের মাধ্যমে শিশুর ভাষা ও	

সাহিত্য বিকাশে সাহায্য করা হইবে। আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিশুকে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্ন করিব।

৬নং পাঠ পরিকল্পনার সংলগ্ন (পঞ্চম ঘর)

১। তোমরা কোন্ কাজ হাতে লইয়াছ ?

২। মণ্টুর কোন্ কোন্ দেশ-ভ্রমণ মহড়া দেওয়া শেষ হইয়াছে ?

৩। আর কোন্ দেশের কথা বাকী আছে ?

৪। ঐ অংশের কথাবার্তা ঠিক করিয়া মহড়া দিতে হইবে—তার আগে অংশটি পড়িয়া লওয়া দরকার নয় কি ?

অতঃপর শিশুদিগকে দিয়া অংশটি সরবে পড়াইব। কয়েক জন শিশু অংশ হিসাবে পড়িবে। অপর শিশুরা যেন পড়ার সময় নীরবে অনুসরণ করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। পড়া শেষ হইলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

১। মণ্টু ইটালীতে কি কি দৃশ্য দেখিয়াছিল ? বোর্ডে উত্তরটি লিখিয়া দিব। যথা—

মণ্টু আগ্নেয়গিরি ও আঙ্গুরফল তোলার দৃশ্য দেখিয়াছিল। তৎপরে শিশুদের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিতে সাহায্য করিব যে আঙ্গুরফল তোলার দৃশ্যটি অভিনয়ে দেখানর অসুবিধা আছে। ছবিতে আঙ্গুরফল তোলার দৃশ্যটি দেখাইয়া ঐ অসুবিধা বুঝিতে সাহায্য করিব। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে সাহায্য করিব যে নাটকে মণ্টুর শুধু আগ্নেয়গিরি দর্শন অংশটি রাখা হইবে।

অতঃপর প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শিশুদের দ্বারা নাটক অংশ আদায় করিয়া বোর্ডে লিখিব ও তাহারা উহা খাতায় লিখিয়া লইবে।

প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ :—

প্রশ্ন	নাটকীকরণ
	(মণ্টু আগ্নেয়গিরি দেখিয়া কাকাতুয়াকে)
১। মণ্টু ইটালীতে কি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল ও কি বলিয়াছিল ?	মণ্টু—দেখ, দেখ ঐ পাহাড় হইতে কেমন ধোয়া বাহির হইতেছে ? কেন এমন হয় ?
২। কাকাতুয়া কি উত্তর দিয়াছিল ?	কাকাতুয়া—ওটা আগ্নেয়গিরি, সোজা কথায় বলে আগুনে পাহাড়।
৩। মণ্টু কি ঐ উত্তরে খুসী হইয়াছিল না, আরও প্রশ্ন করিয়াছিল ?	মণ্টু—সে আবার কি ? পাহাড়ে আবার উনান জ্বলে নাকি ?
৪। কাকাতুয়া কি উত্তর দিয়াছিল ?	কাকাতুয়া—হ্যাঁ, পৃথিবীর ভিতরটা গরম, পাহাড়ের মাথাটাতে ছিদ্র আছে কিনা, তাই, ঐ পাহাড়ের ভিতর হইতে আগুন, ছাই, ধোয়া, গলাপাথর ইত্যাদি বাহির হয়।
	মণ্টু—অনেক দেশতো দেখা হইল, আর কেন, বাড়ী ফেরা যাক্।

শিশুরা বোর্ড হইতে নাটকাংশটি নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। অতঃপর শিশুদিগকে ঐ নাটকাংশটি মহড়া দিতে সাহায্য করিব। তাহারা মহড়া প্রদানকালে তাহাদের খাতা হইতে লিখিত অংশ পড়িবে।

৭নং পাঠ পরিকল্পনা

তৃতীয় শ্রেণী

পাঠ পরিচিতি ঃ—খাতা বাঁধান কাজের সহিত সম্বন্ধিতভাবে সাহিত্য পাঠ

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালনা ও পরিকল্পনা	মন্তব্য
১২-৪৫ মিঃ হইতে ১-৩০ মিঃ	সাধারণ বিষয়—সাহিত্য বিশেষ বিষয়— কাগজ সুদূর অতীতে জন্ম চীন মহাদেশে, আজ তার সমাদর দেখি সব দেশে। জ্ঞানের বাহন সে যে, ভাবের বাহন, দূর হ'তে প্রেম প্রীতি দেয় প্রিয়জন। তাহার বক্ষের পরে—লিখিয়া অক্ষরে ; রাজ্য আসে রাজ্য যায় তাহার আঁচড়ে। নানাবিধ পণ্য দ্রব্যে দানে সে আধার গৃহাদির নির্মাণেও চলে ব্যবহার। কি নাম তাহার কেহ বলিতে কি পার ? তাহার এ পরিচয় তারই বুকে পড়।	ভাষা শিক্ষা, স্মৃতিশক্তি, কল্পনা শক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশ ; বিরাম, যতি, প্রশ্নবোধক প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার, সাহিত্যের রসগ্রহণে সহায়তা, ছন্দবোধ।	চক্, বোর্ড, ডাস্টার, চার্ট।	শিশুরা খাতা বাঁধাই করিয়াছে ও সেই প্রসঙ্গে কাগজের বিষয়ে আগ্রহী হইয়া কাগজ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিয়াছে। আজ তাহাদিগকে ঐ জ্ঞানের প্রসঙ্গ তুলিয়া কাগজ সম্বন্ধে একটি কবিতার ভাব উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা হইবে। আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্নের অবতারণা করা হইবে ঃ—	

(১) তোমরা কি দিয়া খাতা বাঁধিয়াছ ?

(২) কাগজ প্রথমে কোন্ দেশে আবিষ্কৃত হয় ?

(৩) কাগজ দিয়া কোন্ কোন্ কাজ হয় ?

(৪) কাগজ না থাকিলে লেখাপড়া সহজ হইত কি ?

অতঃপর শিশুদিগকে বলিব যে আজ কাগজ বিষয়ে একটি কবিতা তোমাদের শুনাইব। কবিতা লেখা পত্রগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিব। প্রথমে কবিতাটি ব্যঞ্জনা সহকারে শিশুদের পড়িয়া শুনাইব ও শিশুদের সকলে যাহাতে ইহা নীরবে অনুসরণ করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। তৎপরে শিশুদের সাহায্যে শব্দার্থগুলি আমি বোর্ডে লিখিব। যেমন—

সুদূর, সমাদর, বাহন, প্রীতি, আঁচড়ে, নির্মাণে ইত্যাদি। কবিতাটির ভাবার্থ শিশুদের নিকট হইতে আদায় করিয়া বোর্ডে লিখিব। "কাগজ প্রথমে চীন দেশে তৈয়ারী হয়। ইহা আজ সব দেশে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভাব প্রকাশে, গৃহ নির্মাণে, দ্রব্যাদি সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।"

অতঃপর শিশুদিগকে নিম্নলিখিত ধরণের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করিব।

প্রথমে কোন্ মহাদেশে কাগজ আবিষ্কৃত হয় ?

কাগজকে জ্ঞানের বাহন বলা হইয়াছে কেন ?

কিভাবে কাগজের আধারে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা পাঠায় ?

কোন্ দেশে কাগজের গৃহ নির্মিত হয় ? ইত্যাদি।

৮নং পাঠ পরিকল্পনা

তৃতীয় শ্রেণী (সামাজিক পরিবেশ পরিচিতির পাঠ পরিকল্পনা)

পাঠের পরিচয় :—শিল্পের উপকরণ ক্রয় করিতে গিয়া শিশুরা হাট সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। শিশুদের ঐ অভিজ্ঞতাকে এই পাঠে ভূগোলের আমদানি রপ্তানী—এই বিশেষ পাঠটি প্রদানের কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	শ্রেণী পরিচালনার পরিকল্পনা	মন্তব্য
২-৩০ মিনিট হইতে ৩টা পর্যন্ত	ভূগোল	হাট বাজার, আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে ধারণা লাভে সাহায্য করা ; চিন্তা, স্মৃতি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ	বোর্ড, চক, ঝাড়ন, চার্ট (বিভিন্ন যান-বাহনের চিত্র)	শিশুরা শ্রেণীতে বসিবার আসন তৈরীর উদ্দেশ্যে নারিকেল দড়ি কিনিবার জন্য স্থানীয় হাটে গিয়াছে। তাহারা গ্রামের হাটের আমদানী রপ্তানীর বাস্তব পরিচয় পাইয়াছে। এই শ্রেণীতে শিশুদিগকে আমদানী রপ্তানী বিষয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট ধারণালাভে সাহায্য করা হইবে। আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কথোপকথনের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া শিশুদিগকে নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্ন করিব :—	

(১) তোমরা সেইদিন তোমাদের হাটে কি কিনিতে গিয়াছিলে ?

(২) ঐ হাটে কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় হয় ?

(৩) হাটে যে সব তরকারী বিক্রয় হয় সেইগুলি কাহারা আনে ?

(৪) তরি তরকারীগুলি কোথায় উৎপন্ন হয় ?

(৫) এখানে যে সব মাছ বিক্রয় হয় তাহা কোথা হইতে আসে ?

(৬) এখানে ব্যবসায়ীরা যে সব তরকারী ক্রয় করে তাহা তাহারা কোথায় লইয়া যায় ?

(৭) এখানকার হাটে যে সব জিনিষ বিক্রয় করা হয় তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ কলিকাতা হইতে এখানে আসে ? ইত্যাদি।

তৎপরে শিশুদের সাহায্য লইয়া বোর্ডে লিখিব :—

এখানকার হাট হইতে যে সব দ্রব্য চালান যায়	এখানকার হাটে যে সব দ্রব্য অন্য অঞ্চল হইতে আসে
(১) তরকারী—বেগুন, মূলা, পুঁই, লাউ, পটল	(১) তরকারী—আলু, পেঁয়াজ
(২) মাছ—কই, মাগুর	(২) মাছ—বরফ দেওয়া মাছ
(৩) অন্যান্য—পাট	(৩) ফল—আম, কমলা
	(৪) অন্যান্য—বস্ত্র, বই, খাতা, সৌখীন দ্রব্য ইত্যাদি।

ইহার পর প্রথমোক্ত দ্রব্য যে রপ্তানী দ্রব্য ও দ্বিতীয়োক্ত দ্রব্য যে আমদানি দ্রব্য তাহা বলিয়া দিব।

বোর্ডে লিখিবঃ—স্থানীয় দ্রব্য অন্যত্র চালান দেওয়াকে রপ্তানী বলে। অন্য স্থান হইতে দ্রব্য আনাকে আমদানী বলে।

এখন শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করিব—কি উপায়ে এখানকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। আলোচনার মাধ্যমে বুঝাইব যে এখানকার দ্রব্য কলিকাতা অথবা বনগাঁ দিয়া রপ্তানী হয়। এইজন্য রিক্সা, বাস, গো-গাড়ী, রেলগাড়ী ইত্যাদির সাহায্য লওয়া হয়। মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন যানবাহনের ছবি শিশুদিগকে দেখাইব।

বোর্ডে লিখিবঃ—এই স্থান হইতে তরকারী ও পাট কলিকাতা ও বনগাঁ দিয়া অন্যত্র রপ্তানী হয়। ঐ কার্যে রিক্সা, বাস, গো-গাড়ী ও রেলগাড়ী সাহায্য করে।

অনুরূপভাবে, এখানকার আমদানি দ্রব্য প্রধানতঃ কলিকাতা ও বনগাঁ দিয়াই যে আসে তাহা বুঝিতে সাহায্য করিব।

বোর্ডে লিখিবঃ—বস্ত্র, সৌখীন দ্রব্য, বই-খাতা প্রভৃতি এখানকার আমদানী দ্রব্য কলিকাতা ও বনগাঁ হইতে আসে।

এখানকার রাস্তাটি পাকা হওয়ায় স্থানীয় তরকারী ও মাছ প্রভৃতির দাম কেন বাড়িয়াছে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া শিশুদিগকে বুঝিতে সাহায্য করিব—আমদানী রপ্তানী কাজে ভাল রাস্তা সহায়ক।

বোর্ডে লিখিব :—ভাল আমদানী রপ্তানীর কাজে ভাল রাস্তাঘাট সহায়ক।

শিশুরা বোর্ডের লেখাগুলি খাতায় লিখিয়া লইবে।

অতঃপর শিশুদিগকে নিম্নলিখিত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করা হইবে।

(১) এখানে হাটবারে রাস্তায় রিক্সার বেশী ভীড় দেখা যায় কেন ?

(২) রাস্তা ভাল হওয়ায় এখানে কোন্ কোন্ জিনিষের দাম বাড়িয়াছে ? কোন্ কোন্ জিনিষের দাম কমিয়াছে ? কেন ঐরূপ হইয়াছে ?

(৩) এখানকার হাটের আমদানী রপ্তানী দ্রব্যগুলির নাম বল।

(৪) ভাল আমদানী রপ্তানীর সুবিধা অসুবিধাগুলি কি ? ইত্যাদি

নবম পাঠ পরিকল্পনা

তৃতীয় শ্রেণী

পাঠ পরিচয় ঃ—উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির আগ্রহ অবলম্বনে ইতিহাসের বৌদ্ধিক শ্রেণী।

সময় বন্টন	আগ্রহ কেন্দ্র বা কাজ	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিচালিত হইবে	মন্তব্য
৩৫ মিঃ—২টা হইতে ২।৩৫ মিঃ	মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথি প্রতিপালনের প্রস্তুতি।	ইতিহাস—দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন।	দেশের অতীত সংস্কৃতির সহিত পরিচয়, জাতীয় গৌরববোধের বিকাশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধের জাগরণ।	মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কিত ৪টি ছবি, ১টি চার্ট; চক, বোর্ড, ডাষ্টার।	শিশুরা আগামী ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে সূতা কাটবার জন্য সরঞ্জামাদি তৈরী করেছে এবং সূতাকাটা অভ্যাস করছে। ঐ আগ্রহ অবলম্বনে ইতিহাসের "দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ" শীর্ষক অংশটি হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করা হবে। আজকে শ্রেণীতে 'টিপসই'	

প্রদানের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও সত্যাগ্রহীদের দৃঢ়তার নিকট অত্যাচারী শাসকের নতিস্বীকারের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গমে সাহায্য করব।

আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে প্রশ্নের নমুনা :—

গান্ধীজীকে "মহাত্মা" বলা হয় কেন ? তাঁকে আর কোন্ নামে ডাকা হত ? তিনি কি হিসাবে জাতির জনক ? কত বৎসর বয়সে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান ? সেখানে গিয়ে তিনি ট্রেনে শ্বেতাঙ্গযাত্রী ও রেলওয়ে কর্মচারীর কাছে কি রকম ব্যবহার পেয়েছিলেন ? মহাত্মাজী তাঁদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলেন ? 'সত্যাগ্রহ' বলতে কি বুঝায় ?

তারপর শিশুদের গল্পচ্ছলে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কাহিনীটি বলব। বলার সময় ছোট ছোট প্রশ্ন করে তাদের মনোযোগ রক্ষা করা হবে। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় বাক্যগুলি শিশুদের সহযোগিতায় বোর্ডে লিখব।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতবাসীদের অপমান করার জন্য তাদের পাশপোর্টে ও ফটোতে 'সই' ও 'টিপ-সই' দেবার আইন করলেন। 'সই' ও 'টিপ-সই' সাধারণতঃ চোর-ডাকাতেরাই দিয়ে থাকে। এজন্য গান্ধীজী এই আইনকে অপমানকর মনে করলেন। তাঁর সত্যাগ্রহের দল এই আইন অমান্য করবেন বলে ঘোষণা করলেন। আইন অমান্য করার জন্য তাঁদের জেলে দেওয়া হতে লাগল। তাড়াতাড়ি জেল ভরে উঠল। তখন সরকার গান্ধীজীর সাথে এরূপ আপোষ করলেন যে প্রথমবার যদি তারা 'টিপ-সই' দেয় তবে আইন উঠিয়ে দেওয়া হবে। সত্যাগ্রহীরা অন্যায়ভাবে জেদ করেন না। তাঁরা সরকারের এই অনুরোধ রক্ষা করলেন। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। সত্যাগ্রহীরা আবার আন্দোলন সুরু করলেন ও নাটালে প্রবেশ করলেন। 'নাটাল সরকার' তাঁদের

ধরলেন না। সত্যাগ্রহীরা গান্ধীজীর উপদেশে নাটালের কয়লা খনির ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে বললেন। সরকার গ্রেপ্তার স্থরু করলেন ও অত্যাচার চালাতে লাগলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ও সহিষ্ণুতার কাছে সরকারকে হার মানতে হল। এই ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যাগ্রহীদের কাছে উদ্ধত সরকারের পরাজয় ঘটল।

আলোচনার মাঝে মাঝে বোর্ডে শিশুদের সাহায্য নিয়ে আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার লেখা হবে। শিশুরা তা খাতায় লিখে নেবে।

বোর্ডের কাজ—দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার পাশপোর্টে 'টিপ-সই' দেবার নিয়ম করেন। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীর দল এই অন্যায় আইন অমান্য করে দলে দলে জেলে যান। সরকার গান্ধীজীর সঙ্গে আপোষ করেন যে একবার 'টিপ-সই' দিলে—আইন তুলে দেয়া হবে। সত্যাগ্রহীরা একবার 'টিপ-সই' দিলেন। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। সত্যাগ্রহীরা আরও ব্যাপক আন্দোলন স্থরু করলেন। শেষে সরকার ঐ আইন রহিত করতে বাধ্য হলেন।

তারপর নিম্নলিখিত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করা হবে।

(১) 'সত্যাগ্রহী' কথার অর্থ কি ? তাঁরা কি অস্ত্র ব্যবহার করতেন।
(২) সত্যাগ্রহীরা 'টিপ-সই' আইনের বিরোধিতা করেছিলেন কেন ?
(৩) তাঁরা সরকারের কোন্ প্রতিশ্রুতিতে 'টিপ-সই' দিয়েছিলেন ?
(৪) দ্বিতীয় বারের আন্দোলন আরও তীব্র হয়েছিল কেন ?
(৫) এর ফল শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল ?

দশম পাঠ পরিকল্পনা

৪র্থ শ্রেণী

পাঠ পরিচয় :—বনভোজনের অভিজ্ঞতা সহায়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ।

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিচালিত হইবে	মন্তব্য
২টা হইতে ২।৪৫ মিঃ	সাধারণ পাঠ—বিজ্ঞান, বিশেষ পাঠ—বায়ু-চলাচল।	চিন্তা পরিবেশ সচেতনা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ।	চক, বোর্ড, ঝাড়ন, প্রদীপণ, গ্লাস, মোমবাতি, দিয়াশালাই, বায়ুচলাচল পরীক্ষার হাতে তৈরী যন্ত্র।	শিশুরা 'আনন্দভোজন' করিবার উদ্দেশ্যে রান্না করার জন্য উনান তৈয়ারী করিয়াছে ও আজ ঐ উনানটিতে আগুন দিয়া উহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়াছে। উনানে ঠিকমত আঁচ হওয়ার জন্য উনানের নিম্নভাগ হইতে বায়ু চলাচলের জন্য সুব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছি। আজ তাহাদিগকে বায়ু চলাচল বিষয়ে পাঠদান করিব।	

১০নং পাঠ পরিকল্পনার সংলগ্ন (পঞ্চম ঘর)

আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করিব :—

(১) তোমরা যে উনান করিয়াছ তাহার তলায় ফাঁক রাখিয়াছ কেন ?

(২) ঐ ফাঁক না রাখিলে কি অসুবিধা হয় ?

(৩) (একটি বাতি জ্বালিয়া একটি গ্লাস চাপা দিয়া দেখাইব)—এখানে বাতি নিভিয়া গেল কেন বলিতে পার কি ?

তারপর শিশুদিগকে বলিব যে বায়ু প্রবাহ ব্যতীত আগুন জ্বলে না। তেমনি বায়ু ব্যতীত আমরাও বাঁচিতে পারি না। আমরা সর্বদাই মুক্ত বায়ু চাই। কারণ যে বায়ু একবার আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় লই তাহা আবার গ্রহণ করা যায় না। এইজন্য ঘরে বায়ু চলাচল দরকার। এইভাবে বায়ু চলাচল করিবার জন্য ঘরের দুইদিকে ফাঁক রাখা দরকার—একদিক হইতে বায়ু প্রবেশ করিয়া আর একদিক দিয়া যেন বাহির হইয়া যাইতে পারে। অতঃপর নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি শিশুদিগকে দেখাইব।

একটি বড় কাগজের বাক্সের সম্মুখে সেলেফিন কাগজ দিয়া স্বচ্ছ করা হইয়াছে ও দুইদিকে দুইটি ছোট ছিদ্র রাখা হইয়াছে। ভিতরে একটি মোমবাতি জ্বালান হইল। একদিকের ছিদ্র বন্ধ করিলেই বাতি নিভিয়া আসিবে। এ বাতি কেন নিভিল প্রশ্ন করা হইবে। তাহার উত্তর হিসাবে বায়ু চলাচলের জন্য দুইদিকে দুইটি ছিদ্র পথের প্রয়োজন বুঝান হইবে। পরে বোর্ডে লিখিয়া দিব—

"বায়ু চলাচলের জন্য বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমন পথ রাখা উচিত।"

অতঃপর নিম্নলিখিত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করিব :—

(১) শুইবার ঘরের দুইদিকে জানালা খোলা রাখা হয় কেন ?

(২) দালান ঘরের উপরে—"ভেন্টিলেটার" রাখা হয় কেন ?

(৩) ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া রাত্রে ঘুমান ঠিক কি ?

(৪) যে উনানে ভাল আঁচ উঠে না তার সংশোধনের জন্য কি করা উচিত ?

একাদশ পাঠ পরিকল্পনা

৫ম শ্রেণী

বৃক্ষ রোপণ উৎসব অবলম্বনে সাহিত্য

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কিভাবে শ্রেণী পরিচালিত হইবে	মন্তব্য
১২ টা হইতে ১২—৩০ পর্যন্ত	সাহিত্য—'বৃক্ষ বন্দনা' পাষাণী ধরণী বক্ষে ছিল না তো প্রাণের স্পন্দন বিষ বাষ্পে-পূর্ণ বায়ু মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ। সে মরণ-পুরী মাঝে সৃষ্টি হ'ল তোমার জীবন ধীরে ধীরে উচ্চ হ'ল তব শ্যাম বিজয় কেতন। সূর্য্যের প্রচণ্ড রশ্মি তব শীর্ষে বর্ষিল আশীষ অমৃত স্বরূপ হ'ল তব গুণে বাতাসের বিষ। সৃজিলে ক্ষুধার অন্ন খর রৌদ্রে ছায়া সুশীতল তোমারি দাক্ষিণ্য লাভে জীবধাত্রী হ'ল ধরাতল। প্রতি দিন জোগাইছ তাহাদের ক্ষুধার আহার প্রতিদান চাহ নাই সহিয়াছ নির্ম্মম প্রহার। মানুষ তোমারি কাছে শিখিয়াছে "শিল্প, কাব্য, জ্ঞান— তোমার আশ্রয়ে বসি করিয়াছে অনন্তের ধ্যান। তব দেহ দিয়া তারা সৃজিল যে প্রথম নগর তরণী রচনা করি পাড়ি দিল নদী ও সাগর। আজও তারা তব দান প্রতিদিন করিছে গ্রহণ অন্নরূপে বস্ত্ররূপে রোগ হ'তে বাঁচাতে জীবন। নীরবে দিয়াছ তুমি চাহ নাই কোন প্রতিদান কৃতজ্ঞতা বশে তাই গাই মোরা তব জয় গান।	প্রত্যক্ষ—বিরাম, যতি, গতি, ছন্দ ইত্যাদির অনুসরণ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া উত্তর পঠন ও মর্ম গ্রহণ শিক্ষাদান। পরোক্ষ—চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি, কল্পনা, বিচারশক্তির বিকাশ সাধন।	বোর্ড, চক, ঝাড়ন, কবিতা লিখিত চার্ট, সারমর্ম লিখিত চার্ট, কবিতা লিখিত পত্র (Lesson Sheet)	শ্রেণীমন্ত্রীর সহায়তায় আদর্শ শ্রেণী বিন্যাস করিব। অদ্যকার পাঠদানের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগে লইব। শিশুরা কয়েকদিন ধরিয়া বিদ্যালয় প্রাঙ্গণটিকে বৃক্ষলতায় সুশোভিত করিবার জন্য ও ফল এবং ছায়াশীতল বৃক্ষশোভা রচনার জন্য বৃক্ষাদি বসাই-তেছে। আজ ঐ পরিকল্পনার সমাপ্তি হিসাবে একটি উৎসব করিয়া বৃক্ষের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। ঐ	

উৎসবে "বৃক্ষ বন্দনা" নামক কবিতাটি পড়া হইবে। এই শ্রেণীতে উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পড়িবার ভারপ্রদানের আগ্রহে শিশুদিগকে উহার ভাব উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা হইবে। আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত ধরণের প্রশ্ন করা হইবে। যথা—

(১) তোমরা কয়দিন ধরিয়া কি কাজ করিয়াছ ?

(২) আজ তোমরা কি করিবে ঠিক করিয়াছ ?

(৩) কখনও বনমহোৎসব পালন করিয়াছ কি ?

(৪) উৎসব সভায় কবিতা পড়া শুনিয়াছ কি ?

(৫) তোমাদের উৎসবে পড়িবার জন্য কোনও কবিতা ঠিক করিয়াছ কি ?

আমি একটি কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। উহা তোমাদের ভাল লাগিলে সভায় ঐটি পড়া হইবে। তোমরা এখন কবিতাটি মন দিয়া শোন।

শিশুদিগকে কবিতাটির লিখিত পত্র (Lesson sheet) দিয়া অতঃপর শিশুদিগের সম্মুখে উপযুক্ত ছন্দ ও ব্যঞ্জনা সহকারে কবিতাটি পড়া হইবে। কবিতাটির মধ্যস্থ নিম্নলিখিত কঠিন শব্দগুলির শব্দার্থ ও বাক্যে ব্যবহার আলোচনা করিরা শিশুদের সহায়তায় উহা বোর্ডে লেখা হইবে। যেমন—স্পন্দন, মার্ত্তণ্ডের, প্রচণ্ড, কেতন, খর, দাক্ষিণ্য, জীবধাত্রী, নির্মম, তরণী, কৃতজ্ঞতা, শীর্ষে। তৎপর শিশুদিগের কয়েকজনকে দিয়া কবিতাটি পড়ান হইবে। ঐ সময়ে অন্য শিশুরা যাহাতে মনোযোগী থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব।

• কবিতাটি পড়া শেষ হইলে কবিতাটির ভাব উপলব্ধিতে সহায়তা করার জন্য প্রশ্নোত্তরের মধ্যমে নিম্নলিখিত ভাবে অগ্রসর হইব। যেমন—

(১) পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল?	উত্তর : পৃথিবী ছিল মরুভূমির মত। উহা জীবজন্তু বৃক্ষলতাহীন, পাষাণ ও দূষিত বায়ু পূর্ণ ছিল।
(২) প্রথমে পৃথিবীর বুকে কিরূপ জীবনের আবির্ভাব ঘটে ?	উত্তর : প্রথমে পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়।
(৩) প্রথমে জীব জগতের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই কেন ?	উত্তর : পৃথিবী অঙ্গার অম্লগ্যাসে ভর্তি ছিল। তাই প্রথমে জীবের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না।
(৪) উদ্ভিদ জীবের জীবন ধারণে কি কি সাহায্য প্রদান করে ?	উত্তর : উদ্ভিদ জীবের জন্য বায়ু শোধন করে, খাদ্য প্রদান করে, মানুষকে পরিধেয় প্রদান করে, ঔষধাদি প্রদান করে, বাসস্থান প্রদান করে।
(৫) মানুষের শিক্ষায় উদ্ভিদ কি ভাবে সাহায্য করিয়াছে?	উত্তর : মানুষ উদ্ভিদের নিকট সৌন্দর্যবোধ, সংগীত, চিত্র, কলা প্রভৃতির প্রেরণা পাইয়াছে।
(৬) মানুষ সব সময় উদ্ভিদের দানের কথা মনে রাখে কি ?	উত্তর : মানুষ উদ্ভিদের এই উপকারের কথা সব সময়ে মনে রাখে না। উদ্ভিদ ইহাদের কৃতঘ্নতা সহ্য করে কারণ সে সহনশীল।

বোর্ডে উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখিত হইবে। শিশুরা বোর্ডের লেখা নিজ নিজ খাতায় লিখিয়া লইবে। আমি তাহাদের প্রতি নজর রাখিব। তৎপরে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ধরণের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করিব। যেমন—

(১) বৃক্ষ কিভাবে পৃথিবীকে জীবধাত্রী করিতে সাহায্য করিয়াছে ?

(২) আমরা বৃক্ষের নিকট কোন্ কোন্ সাহায্য পাই ?

(৩) বাক্যে ব্যবহার কর—কিরণ, বিষ, অন্ন, তরনী।

(৪) শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

[ক] পাষাণী ধরণী —— ছিল না তো প্রাণের ——।

[খ] —— তোমারি —— শিখিয়াছে —— কাব্য ——।

[গ] —— —— তুমি —— নাই কোন ——।

দ্বাদশ পাঠ পরিকল্পনা

পঞ্চম শ্রেণী

পাঠপরিচয়—বাটিকের কাজ করা রুমাল তৈয়ারীর সহিত সম্বন্ধিতভাবে গণিতের বৌদ্ধিক পাঠ

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিচালিত হইবে	মন্তব্য
১২-৩০ হইতে ১-১০ পর্যন্ত	অঙ্ক বিশেষ পাঠ—বর্গমিটার বর্গ ডেমি. ও বর্গ সেমি. এবং ক্ষেত্রফল সম্বন্ধে জ্ঞান দান।	নূতন দশমিক পদ্ধতির মাপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান। ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োগ, শিশুর মানসিক চিন্তা ও ইচ্ছা শক্তির ব্যবহার এবং চরিত্র গঠন।	চক, ডাষ্টার, ব্লাকবোর্ড, স্কেল, রুমাল, প্রদীপণ ইত্যাদি।	প্রস্তুতি :—প্রয়োজনীয় শ্রেণী বিন্যাসের পর নিম্নলিখিত আলোচনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে নূতন পাঠদানের জন্য শ্রেণী প্রস্তুত করিয়া তুলিব। শিশুরা কাপড় রাঙানর জন্য কাপড় মাপিবার সময় নূতন মাপ (মিটার, ডেমি, সেমি) ব্যবহার করিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে তাহারা মিটার, ডেসিমিটার, ও সেন্টিমিটার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিয়াছে। আজ তাহাদিগকে তাহাদের প্রত্যেকের তৈরী রুমালের ক্ষেত্রফল (নূতন মাপে) নির্ণয় করা বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হইবে। শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন করিব :—	

প্রশ্ন :—(১) তোমরা মোট কত মাপের কাপড় বাটিকের জন্য কিনিয়াছ? কাপড়টির দৈর্ঘ ও প্রস্থ কত ছিল?

(২) ১ মিটার=কত ডেসিমিটার?

(৩) ১ ডেমি.=কত সেমি.?

(৪) ১০সেমি.=কত মিলিমি.?

(৫) ১ মিটার ২ ডেমি. ৩ সেমি.=কত সেমি.?

উপস্থাপন :—অতঃপর শিশুদিগকে তাহাদের নিজ নিজ প্রস্তুত রুমালের দৈর্ঘ প্রস্থ মাপিয়া খাতায় লিখিতে বলিব ও আমি তাহা ঠিক হইয়াছে কি না দেখিব। তারপর শিশুদিগকে বর্গমিটার, বর্গ ডেমি, বর্গসেমি. সম্বন্ধে ধারণা দিতে চেষ্টা করিব। চার্ট দেখাইয়া বর্গমিটার, বর্গডেসিমিটার ও বর্গ সেন্টিমিটার বুঝাইব।

প্রদীপণের সাহায্যে বুঝাইব যে ¼ বর্গমিটার=৫×৫ বর্গডেমি.×৪=১০০ বর্গ ডেমি.। অর্থাৎ দৈর্ঘ ১০ ডেমি. ও প্রস্থ ১০ ডেমি. হইলে ক্ষেত্রফল=১০০ বঃ ডেমি. হয়।

অনুরূপভাবে প্রদীপন দেখাইয়া বুঝাইব যে ১ বর্গ ডেসিমিটার=১০×১০ বঃ সেমি.

অর্থাৎ দৈর্ঘ=১০ সেমি. ও প্রস্থ=১০ সেমি. হইলে ক্ষেত্রফল=১০ সেমি.×১০ সেমি.=১০০ বর্গ সেমি. হয়।

অতঃপর শিশুদিগকে নিজ নিজ রুমালের বর্গফল বাহির করিতে বলিব। তৎপরে নিম্নলিখিত ধরণের ২।১টি অঙ্ক শিশুদের সাহায্য লইয়া বোর্ডে করিব।

(১) একখানা বস্ত্রের দৈর্ঘ ১ মিটার ২ ডেমি. ৫ সেমি. ও প্রস্থ ৮ ডেমি.। বস্ত্রটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি. হইবে?

(২) ঐ বস্ত্র হইতে ৫টি ২ ডেমি. ৫ সেমি. × ২ ডেমি. ৫ সেমি. আকারের রুমাল করা হইল। কত কাপড় অবশিষ্ট রহিল ?

(৩) একটি ১ মিটার × ৭ ডেমি. ৫ সেমি. বড় কাগজ হইতে ১ ডেমি. ৫ সেমি. × ১ ডেমি. আয়তনের ৮টি কার্ড তৈয়ারী করা হইয়াছে। কত কাগজ অবশিষ্ট আছে ?

প্রয়োগ :—অতঃপর শেষোক্ত ধরণের কয়েকটি অঙ্ক সম্বলিত (সহজ হইতে কঠিন) Sum card শিশুদিগকে দিয়া অঙ্কগুলি পরস্পর কষিতে বলিব ও আমি প্রয়োজন মত ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করিব।

(Sum card) :—

(১) একখানি সতরঞ্জি ১০ মিটার ৫ ডেমি. লম্বা এবং ৮ মিটার ৫ ডেমি. চওড়া ; উহার ক্ষেত্রফল কত ?

(২) একটি মাদুরের দৈর্ঘ ৩ মিটার ২ ডেমি. ১ সেমি. ও প্রস্থ ২ মিটার ১ ডেমি. ২ সেমি.। এইরূপ ৩ খানি মাদুরের ক্ষেত্রফল কত ?

(৩) একটি ৫ মিটার ৩ ডেমি. × ৪ মিটার ২ ডেমি. আয়তনের বাগানের ৩ মিটার ২ ডেমি. × ২ মিটার ১ ডেমি. পরিমিত স্থানে গাঁদাফুল গাছ বসান হইল ; আর কত অংশ বাকী রহিল ?

(৪) একটি ঘরের মেঝের দৈর্ঘ ৪ মিটার ৫ ডেমি. ও প্রস্থ ৩ মিটার ৫ ডেমি.। উহার উপর ৩ মিটার ২ ডেমি. × ২ মিটার ১ ডেমি. আয়তনের সতরঞ্জি পাতা হইল। কত বর্গ ডেমি. মেঝে খালি থাকিল ?

(৫) একখানি ৭ মিটার ২ ডেমি. ৩ সেমি. × ২ মিটার ১ ডেমি. ২ সেমি. আয়তনের বড় কাপড় হইতে ১ মিটার ৩ ডেমি. ৪ সেমি × ১ মিটার ২ ডেমি. ২ সেমি. আকারের ৩টি টুকরা কাটিয়া লওয়া হইল। আর কত কাপড় অবশিষ্ট রহিল ?

ত্রয়োদশ পাঠ পরিকল্পনা

৫ম শ্রেণী

পাঠ পরিচিতি :—বাটিকের কাজের আগ্রহ অবলম্বনে প্রকৃতি বিজ্ঞান

সময় বণ্টন	শ্রেণীর কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	কি ভাবে শ্রেণী পরিচালিত হইবে	মন্তব্য
১২টা হইতে ১২-৩৫ মিঃ পর্যন্ত	বিষয়—প্রকৃতি বিজ্ঞান, বিশেষ পাঠ—মৌমাছির জীবনযাত্রা ও মৌপালন	পরিবেশ সচেতনা	চার্ট, মৌপালনের বাক্স, চক, ডাষ্টার	শিশুরা বাটিকের কাজ করতে গিয়ে মোম ব্যবহার করেছে। মোম কি ভাবে পাই এই প্রশ্নের সাহায্যে মৌমাছি সম্বন্ধে আগ্রহী করে আমি আজ শিশুদের মৌমাছির জীবন যাত্রা ও মৌপালন সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা দিতে সাহায্য করব্ :—	

১৩নং পাঠ পরিকল্পনার সংলগ্ন (পঞ্চম ঘর)

আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রশ্নের নমুনা :—

(১) আমরা বাটিকের যে কাজ করেছি তাতে কি কি জিনিষ লেগেছে ?

(২) মোম কোথা থেকে পাই বলতে পার ?

(৩) মোম দিয়ে আর কোন্ কোন্ কাজ হয় ?

(৪) মৌমাছিদের কাছ থেকে আমরা আর কি কি পাই ?

(৫) মৌচাক দেখেছ কি ?

(৬) মৌচাকের কোন্ অংশে মধু থাকে ?

(৭) তোমরা মৌমাছি পালন করতে দেখেছ কি ?

অতঃপর শিশুদের মৌপালন বিষয়ে উপকরণাদি দেখিয়ে বিস্তারিত ধারণা দেব।

মৌ পালনের চাকটির গঠন,

চাকের ফ্রেমের কোন্‌টিতে মধু থাকে,

কি ভাবে মধু সংগ্রহ করা হয়।

তৎপর মৌমাছি পালনের জন্য মৌমাছি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ করার আবশ্যকতা শিশুদের বুঝিয়ে দেব। মৌমাছির সমাজ জীবন—রাণী, কর্মী ও পুরুষের কর্ম বণ্টন, মৌমাছিদের সমাজে রাণীর প্রাধান্য,

একাধিক রাণীর সমস্যা, মৌচাকের কুঠারীগুলির গঠন, মৌমাছির জীবনের প্রথমাবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা, মৌমাছির খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেব। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে আলোচনাকে সজীব রাখব ও প্রশ্নের উত্তর বোর্ডে লিখে দেব। যথা—

মৌমাছির কয়টি শ্রেণী— তিনটি শ্রেণী—রাণী, পুরুষ ও কর্মী।

প্রতি চাকে রাণী কয়টি থাকে—? ১টি।

প্রতি চাকে পুরুষ কয়টি থাকে—? ২০০/৩০০ শত।

প্রতি চাকে কর্মী কয়টি থাকে—? হাজার হাজার।

শিশুরা খাতায় প্রশ্ন ও উত্তর লিখে নেবে।

তৎপর শিশুদের নিম্নলিখিত প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করে পরীক্ষা করব।

(১) কোন মৌচাকে কখন গোলযোগ উপস্থিত হয় ?

(২) মৌমাছির সংসারে রাণীর কাজ কি ?

(৩) মৌমাছিদের সমাজ ব্যবস্থার প্রশংসা করা হয় কেন ?

(৪) মৌমাছির শৈশব অবস্থা বর্ণনা কর।

শিশুদের বিদ্যালয়ে মৌপালনের ব্যবস্থা করতে উৎসাহী করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্মকেন্দ্রী বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গতি স্থাপন।

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বৌদ্ধিক শিক্ষাদান কিরূপে হইবে :—

আমরা শিশু শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রী ও জীবনাশ্রয়ী করার সার্থকতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আবার ইহাও আলোচিত হইয়াছে যে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বৌদ্ধিক শিক্ষাকে কর্মাশ্রিত বা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত করা সম্ভব নহে; তাহার প্রয়োজনও নাই কারণ ছোট শিশু নিছক বৌদ্ধিক বিষয়সমূহের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন বুঝে না ও তাহার জন্য তাগিদ অনুভব করে না। বাস্তবাশ্রিত হইলে তবেই তাহারা শিক্ষার তাগিদ অনুভব করে কারণ তখন উহা শিখিবার প্রয়োজন তাহারা বুঝিতে পারে। কিন্তু যখন শিশু বৌদ্ধিক বিষয়সমূহে বেশ কিছুটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে তখন সাধারণভাবেই তাহারা বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি বৌদ্ধিক পাঠকে কর্মাশ্রিত অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতার আশ্রিত করার প্রয়োজন নাই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন বৌদ্ধিক বিষয়ের জ্ঞানার্জনের প্রতি ঝোঁক বা আবেগ সৃষ্টি হইয়া যায়—তাহারা তাহাদের প্রিয় বিষয়গুলিতে যথেষ্ট মনোনিবেশ করিতে শিখে। এই বয়সে তাই পাঠদান পদ্ধতিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার প্রয়োজনও কমিয়া আসে। তৎপরিবর্তে যুক্তির পারম্পর্যসংযুক্ত পাঠদানই সার্থক পদ্ধতিরূপে গণ্য হইতে থাকে।

অর্থাৎ এখন Psychological Method-এর স্থান গ্রহণ করে Logical Method।

উচ্চতর বিদ্যালয়ে কর্ম ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা থাকিবে কিনা?

কর্ম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্তভাবে বৌদ্ধিক শিক্ষা দিলে ছোট শিশুর নিকট বৌদ্ধিক শিক্ষা অর্থদ্যোতক ও তজ্জন্য চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার বাহন হওয়াই কর্মের একমাত্র উপযোগিতা নহে। বস্তুতঃ কর্ম নিজেই একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এমন এক যুগ ছিল যখন কর্ম সম্পাদনাকে নিকৃষ্ট মানুষের কর্তব্য মনে করা হইত এবং শ্রেষ্ঠ মানুষেরা শুধু বৌদ্ধিক চর্চা করিবে ইহাই ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু বর্তমানে সেই যুগ বিগতপ্রায়। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির দ্রুত বিস্তার শিক্ষাকে নিছক বুদ্ধি চর্চার ক্ষুদ্র বেষ্টনী হইতে দ্রুত মুক্তি দিতেছে। অপর পক্ষে, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা মানুষের মধ্যে অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর পার্থক্য লুপ্ত করিতে চলিয়াছে। তাই এই যুগে কাজকে শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার আধার হিসাবে না দেখিয়া ইহাও একটি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং মাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় কর্মের আয়োজন রাখিয়া উচ্চস্তরের শিক্ষায় উহার বিলুপ্তি ঘটান সঠিক ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় উচ্চতর শিক্ষার রূপ :—

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা পরবর্তী যুগে সমগ্র নঈ-তালিম নামক একটি বৃহত্তর শিক্ষা পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনকেই শিক্ষাকাল ধরা হইয়াছে। জন্ম হইতে ৬।৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত পূর্ব বুনিয়াদী

শিক্ষাকাল। এই সময় শিক্ষক পিতা মাতার সহিত গভীর সংযোগ রক্ষা করিয়া শিশুর সুঅভ্যাস গঠন, সুস্থ শরীর গঠন ও খেলাধূলার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় নিচয়ের বিকাশ ও জ্ঞানাগ্রহের উন্মেষ সাধন করিবেন। ৭+ হইতে ১৪+ এই ৭ বৎসর শিশুরা একটি ধারাবাহিক শিল্পকর্মের ও নানা সামাজিক কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে এবং সমাজ ও প্রকৃতির নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্নমুখী বিকাশ লাভ করিবে। ১৪+ হইতে ১৭+ উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষাকাল। এই সময় শিক্ষার্থী তাহার নির্বাচিত শিল্পকর্মে অধিকতর বুৎপত্তি লাভ করার সাথে সাথে জীবনের প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার দিকে আরও অগ্রগতি লাভ করিবে এবং কোনও একটি বিশেষ দিকে অধিকতর জ্ঞানার্জন করিবে। পরে তাহারা গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই অঞ্চলের জীবনধারাকে সমৃদ্ধ করিয়া এমন একটি বিষয়ে আরও উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবে। ইহার পরও শিক্ষার্থী নিজের স্বাধীন চেষ্টায় নিজ ইচ্ছা অনুসারে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকিবে বয়স্ক শিক্ষা সংস্থার সহায়তায়। শেষোক্ত শিক্ষা অনেকটা Informal ধরণের হইবে। পরিকল্পনা হিসাবে এই পরিকল্পনাটি একটি সম্পূর্ণতা-গুণ-যুক্ত এবং যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু ইহাতে শিক্ষাকে গ্রাম্য জীবনাশ্রয়ী করার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। গান্ধীজী ভারতবর্ষে গ্রাম-স্বরাজ স্থাপনের স্বপ্নই দেখিয়া গিয়াছেন ও তাঁহার মতবাদে দীক্ষিত শিক্ষাব্রতীগণ তাই সেই দৃষ্টিতেই শিক্ষাপরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণভাবে ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এবং গত কয়েক দশকে ভারতের অগ্রগতি লক্ষ্য করিলে ইহা প্রত্যাশা করা শক্ত যে ভারতে গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। অথচ শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা দিতে হইবে—দূর-

কল্পিত কোনও সমাজের উপযোগী শিক্ষায় তাহারা লাভবান হইবে না। শুধু তাহা নহে, শিক্ষাকে একটি খাতে প্রবাহিত করিতে দেওয়া ঠিক নহে ; ইহা শিক্ষার্থীর অভিযোজন ক্ষমতা বিকশিত করে না। তাই ভারত সরকার ওয়ার্ধা পরিকল্পনাটি পুরাপুরি গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই।

সার্জেণ্ট শিক্ষা পরিকল্পনা :—

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর সংগঠন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয় স্যার জন সার্জেণ্টএর পরিচালনাধীনে ; তাহাই সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনাটি একটি সামগ্রীক শিক্ষা পরিকল্পনা অর্থাৎ তিন বৎসরের শিশু হইতে পূর্ণবয়স্ক যুবক পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক শিক্ষাক্রম ইহাতে রহিয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত পর্যায়সমূহ অনুসৃত হইবার কথা :—

নার্শারী শিক্ষা	৩—৬ বৎসর	আবশ্যিক নহে
নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা	৬—১১ ”	আবশ্যিক
উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা অথবা নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা	১১—১৪	আবশ্যিক নহে (দুইটির যে কোনও একটি অনুসরণ করিতে পারে)
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও	১৪—১৬	আবশ্যিক নহে (উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষা লইয়াও ইহাতে যাইতে পারে)
নিম্ন-টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা	ঐ	(নিম্ন সেকেণ্ডারী শিক্ষা লইয়াও ইহাতে যাইতে পারে)
উচ্চতর কলেজী শিক্ষা অথবা বৃত্তিমূলক উচ্চতর শিক্ষা (বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন)	১৬—১৯	৩ বৎসরের ডিগ্রীকোর্স (কলা ও বিজ্ঞান)
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা		

উপরোক্ত পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষারূপে সংগঠিত করার কথা বলা হইয়াছে ও কর্ম হিসাবে ৮+ হইতে ১১+ এই বয়সে শিল্প শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পাদি কার্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ শিল্প উৎপাদনের উপর কোনও স্তরেই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। —শিল্পাদি কর্মকে বৌদ্ধিক শিক্ষার উত্তম মাধ্যম কর্মরূপেই গণ্য করা হইয়াছে। উহার সহিত শিক্ষার্থীর অন্যান্য বিকাশকে মূল্য দেওয়া হইলেও শিক্ষার্থীর উৎপাদন ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

এই পরিকল্পনায় নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরের পর উচ্চ-বুনিয়াদী ও নিম্ন-মাধ্যমিক দুইটি সমান্তরাল স্তর রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে পুরাতন ভাবধারা থাকিয়াই যাইবে এবং সঙ্গতি-সম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্রগণ নিম্ন-মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে ভর্তি হইতে আগ্রহী হইবে। যেহেতু নিম্ন-মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে কাজের ব্যবস্থা থাকিবে না তাই নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে কাজের আয়োজন করা হইবে তাহা সাধারণ অভিভাবকগণ উৎপাত বলিয়াই গণ্য করিবেন। শিক্ষাকে এইরূপ দুইটি স্বতন্ত্র মৌলিক ধারায় প্রবাহিত রাখিলে জনসাধারণ মনে করিবেন যে শিক্ষার মধ্যেই অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষা—এই দুইটি শ্রেণী বিভাগই চালু করা হইতেছে এবং ফলে শিক্ষাকে কর্মাশ্রয়ী করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মনোভাব প্রবল হইবে। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রী ও জীবনাশ্রয়ী করিলে শিক্ষার্থীর আচরণে যে সমস্ত সুঅভ্যাসগুলি গঠিত হইবে আশা করা যায় তাহা অন্ততঃ বয়ঃসন্ধিকালে অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে ঐ আচরণগুলি মানসিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে না ফলে উহা জীবনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করিবে না। এইজন্য জাকীর

হোসেন প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ নিম্ন-বুনিয়াদী স্তর অপেক্ষা উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরেই কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাকে আবশ্যিক করার কথা বলিয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইবে সার্জেন্ট কমিটি কর্তৃক গৃহীত শিক্ষাপরিকল্পনাটি কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়াছে ও বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত উচ্চতর শিক্ষার বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা :—

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে মুদালিয়ার কমিশন ও দে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ও রাধাকিষণ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে নানা সুচিন্তিত অভিমত দিয়াছেন। তাঁহারা মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকেও অধিকতর জীবনাশ্রয়ী করার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি খুব প্রসন্ন মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন নাই। সম্ভবতঃ ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে যে গ্রামকেন্দ্রী জীবন সংগঠনের উপর অত্যধিক আসক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই তাঁহাদিগকে সামগ্রীকভাবে ইহার প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছে। শিক্ষাকে এইভাবে সংকীর্ণ জীবনসীমায় আবদ্ধ করিলে বৌদ্ধিক অগ্রগতির মান ব্যাহত হইবে ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একটি সাধারণ আশঙ্কা রহিয়াছে ও কমিশনগুলি ঐ আশঙ্কামুক্ত হইতে পারেন নাই। দুঃখের বিষয় বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ঐরূপ আশঙ্কার বিশেষ কারণ না থাকিলেও অনেক নৈতিক গান্ধীবাদী বুনিয়াদী শিক্ষাকে যে দৃষ্টিতে দেখেন ও যেভাবে রূপায়ণে ব্রতী হইতে চাহেন তাহাতে ঐরূপ আশঙ্কা পোষন স্বাভাবিক।

বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা :—

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংস্কার কার্য দেখা দিয়াছে তাহাকে সার্জেন্ট কমিটি, মুদালিয়ার ও দে কমিশন প্রভৃতির সম্মিলিত ফল বলা যায়। ইহাতে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন ছাত্রের ক্ষমতা ও প্রবণতা বিচার করিয়া তাহাদের শিক্ষাকে বিভিন্ন খাতে পরিচালিত করার ব্যবস্থা রাখা হইতেছে। বিদ্যালয়-গুলিকে তাই বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose School) বলা হইতেছে।

অষ্টম শ্রেণীর পর নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও প্রবণতা বিচার করিয়া তাহাকে উপযোগী ধারা নির্বাচনে সাহায্য দিবার জন্য Vocational guidanceএর ব্যবস্থা রহিয়াছে ও শিক্ষকগণকে উহার যোগ্যতা দিবার জন্য শিক্ষণ দেওয়া হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরের এই পর্যায়ে টেকনিকাল শাখা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার শাখা-সমূহ রহিয়াছে। টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক শাখায় প্রয়োগবিদ্যা (Practical) শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এইসব বিবেচনা করিলে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে এই পর্যায়ের শিক্ষাকে বর্তমানে কর্মকেন্দ্রী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিপোষকরূপেই সংগঠিত করা হইতেছে। কিন্তু নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে কোনরূপ কাজ কর্মের-ব্যবস্থা না থাকায় নিম্ন-বুনিয়াদী স্তর হইতে নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশকারী শিশুর পক্ষে জীবনাশ্রয়ী শিক্ষার পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাশ্রয়ী শিক্ষার পরিবেশে আগমন তাহাদের অনিশ্চয়তায় ফেলিতেছে এবং জাকীর হোসেন মহোদয় সার্জেন্ট কমিটীর সমালোচনায় যে আশাঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা সত্য হইতে চলিয়াছে। নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা মামুলী পুস্তকাশ্রয়ী থাকিয়া যাওয়ায় উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের বিদ্যালয়গুলিতেও কাজের

পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে না—উহা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। ইহার প্রভাব নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরেও পড়িতেছে। সেখানে এখনও বুনিয়াদী বিদ্যালয় অপেক্ষা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী। তদুপরি, উচ্চ-বুনিয়াদী ও নিম্ন-মাধ্যমিক স্তরে কর্মকেন্দ্রী জীবনাশ্রয়ী শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না। এইজন্য নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতেও কর্ম ও জীবনকেন্দ্রী শিক্ষার প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুর্বল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যদিও বর্তমান উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সহিত কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার যথেষ্ট সঙ্গতি বর্তমান তথাপি পৃথক নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর রাখার জন্যই কর্মকেন্দ্রী ও জীবনাশ্রয়ী বুনিয়াদী শিক্ষা বাস্তবায়িত হইতেছে না।

সাংগঠনিক বাধাসমূহ

তাহা ছাড়াও, বর্তমান শিক্ষা সংগঠনগুলি শিক্ষার সংস্কার সাধনের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইতেছে না। স্কুলবোর্ড ও রাজ্য শিক্ষা অধিকার—এই উভয়ের পরিচালনায় রহিয়াছে প্রাথমিক শিক্ষা। স্কুলবোর্ডের বর্তমান সংগঠন দৃঢ়-ভিত্তিক গণতন্ত্রের (Broad based democracy) পরিচায়কও নহে আবার, শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত ব্যক্তির এই সংগঠনে আগমনের সুযোগ ও সম্ভাবনা কম। বর্তমানে এইগুলি যে সমস্ত সভ্য দ্বারা গঠিত তাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিবার যথেষ্ট সুযোগ পান না। বিদ্যালয় নির্বাচন, নিয়োগ, বদলী, প্রধান শিক্ষক নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে স্কুল বোর্ডের ক্ষমতা থাকায় শিক্ষকগণ নিজ চাকুরীর উন্নতি বিধানের জন্য বোর্ডের সভ্যগণের আজ্ঞাবহ হইয়া উঠেন—শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষকতা তাঁহাদের

নিকটও গৌণ হইয়া পড়ে। বিভিন্ন স্কুল বোর্ডের আর্থিক সামর্থ্যও বিভিন্ন। এইজন্য শিক্ষা বিভাগ নির্দেশিত শিক্ষা সংস্কার কার্য-গুলিও ইহাদের সকলের সামর্থ্যে কুলায় না। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকবর্গ যে সব উপদেশাদি প্রদান করেন তাহা প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং এইরূপ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির সত্যকার রূপায়ণ প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজ্য শিক্ষা-অধিকার ও বুনিয়াদী শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিদ্যালয়গুলির উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রাখেন না। বর্তমানে তাই নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই স্কুল বোর্ডের সাক্ষাৎ পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া শিক্ষা বিভাগ হইতে সাহায্য পাইয়া বিভিন্ন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও অনেকগুলি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিও ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। যে সব প্রতিষ্ঠানের আগ্রহে সরকারী অর্থ সাহায্য দ্বারা পরিচালিত উক্ত নিম্ন ও উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি চলিতেছে তাঁহারা যে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিপদ্ধতি দ্বারা মুগ্ধ হইয়াই ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন—ইহা মনে করিবার কারণ দেখি না। তাই ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশের পরিচালন ও কার্য-কলাপ স্কুলবোর্ড পরিচালিত নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা কোনও অংশে ভাল মনে করিবার কারণ নাই। ক্ষেত্র বিশেষে উহা অবশ্য ভালরূপেই চালাইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান রূপটিতে যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্টতা রহিয়াছে, কারণ গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ,

ডিউই-এর শিক্ষাদর্শ এবং আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত ধনিক শ্রেণীর শিশুদের জন্য পরিচালিত ব্যয়বহুল শিশু শিক্ষার ব্যবস্থাদির আদর্শ সবগুলিই বর্তমান বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচার প্রেরণাও তাহার সহিত মিশিতেছে। ঐ সব আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই একটি সুগঠিত আদর্শে মিলিত না হইয়া কতকগুলি ঝোঁক ও বিশ্বাসের মিশ্রণরূপে কাজ করিতেছে। ইহাতে পরিচালক ও শিক্ষকগণ সুগঠিত ধারণা ও অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারিতেছেন না। ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয় বলিতে মাত্র কয়েকটি বাহিরের পরিবর্তনই বুঝাইতেছে ; শিক্ষাদান পদ্ধতির ও শিক্ষা নীতির কোনও গভীর পরিবর্তন সূচনা করিতেছে না। রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের বিশেষ কাজ বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমকে অধিকতর প্রয়োগ-সিদ্ধ ও বাস্তবাশ্রয়ী করা। দ্বিতীয় কাজটি সুষ্ঠুরূপে করার উপযোগী ব্যবস্থার অভাব রহিয়াছে। সাধারণতঃ বিদ্যালয়গুলির দৈনন্দিন কাজ ও অভিজ্ঞতার সহিত শিক্ষা বিভাগের বিশেষতঃ গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগের সংযোগ বিশেষ নাই। এইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি, পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমাদির উপযুক্ত বিকাশ ঘটিতেছে না। ফলে শিক্ষক শিক্ষণের সহিত শিক্ষকদের বাস্তব কর্ম পরিবেশ সঙ্গতিহীন হইয়া পড়িতেছে।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ

সুখের বিষয় উপরোক্ত অসুবিধাসমূহ বর্তমানে শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সমাজ উন্নয়ন বিভাগ বর্তমানে উপলব্ধি করিতেছেন যে শিক্ষার সহিত সমাজ উন্নয়নমূলক

কর্মধারার যোগ মৌলিক ধরণের এবং বিদ্যালয় ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এই উভয়ের কাজের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আবশ্যক। এইজন্য সমাজ উন্নয়ন কাজে শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা স্থাপনের নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অপরদিক হইতে গণাভিমুখী করার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির সহিত সমাজ উন্নয়ন বিভাগের নূতন সমন্বয় প্রচেষ্টায় ইহার প্রতিফলন দেখা যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্যগণ, গ্রাম সেবক, সমাজ শিক্ষার কর্মী ও অফিসার, কৃষি বিভাগীয় অফিসার, শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক ইঁহারা মিলিতভাবে সামগ্রীক সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশীদার হইবেন ও আঞ্চলিক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা গঠন করিবেন। এইভাবে নিম্নস্তর হইতে জেলাস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারী ও জন সাধারণের নির্বাচিত সভ্যবৃন্দ সম্মিলিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা-সমূহ গঠন করিবেন এইরূপ পরিকল্পনা গৃহীত হইতে চলিয়াছে। ইহার ফলে স্কুলবোর্ডের প্রয়োজন লোপ পাইবে। আশা করা যায় যে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইলে অন্যান্য সমাজ উন্নয়ন-মূলক কর্ম পন্থার সাথে শিক্ষাতেও নূতন প্রেরণা সঞ্চার হইবে ও বুনিয়াদী শিক্ষায় যে নূতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ও শিক্ষায় সামগ্রীক দৃষ্টির কথা চিন্তা করা হইয়াছে তাহা ক্রমে জন-সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষা বিষয়ে কোনও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বয়স্কগণের সহিত সংযোগ ও জন শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। উল্লিখিত পরিবর্তন দ্বারা সেই দিকে যথেষ্ট অগ্রসর হইবার আশা রাখা যায়।

প্রশ্নাবলী

১। "বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা"—আলোচনা করুন (J. B. F. Nov' 59—Principles)

[ইঙ্গিত :—শিক্ষা কি ? এই অধ্যায় ও তৎপরে সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ পাঠ করুন। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশই যে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিয়া শিশুর ব্যক্তিত্ব স্ফুরণে ও সমাজের প্রতি শিশুর আনুগত্য রচনায় শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিকতার প্রয়োজন আলোচনা করুন। তৎপরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় কি ভাবে বৌদ্ধিক শিক্ষা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আলোচনা করুন এবং গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মের সাহায্যে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার আদর্শ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (পৃঃ-৬৪ গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ)]

২। যে সমাজ আদর্শ বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? বুনিয়াদী বিত্থালয়ের কোন্ কোন্ কাজ এই সামাজিক আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য অপরিহার্য ?

(J. B. F. July '60—Principles)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ-৬৪ হইতে ৬৮ পাঠ করুন ও ১১৪ পৃঃ-হইতে ১১৬ পৃঃ পাঠ করুন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তক গান্ধীজী, আদর্শ শোষণহীন সমাজে বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন ও সেইজন্য তিনি বিশেষ ভাবে হস্তশিল্প সাহায্যে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে উপদেশ দিয়াছেন।]

৩। কে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করিতে চাহিয়াছিলেন ? তাঁহার মতবাদের মূল তত্বগুলি কি ? কি ভাবে তাঁহার মতবাদ ইউরোপের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল ? (J. B. F. July 1960—Principces)

[ইঙ্গিত :—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠ করুন। প্রথম কমোনিয়াস, রুশো প্রভৃতির মধ্য দিয়া কি ভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা ক্রমশঃ যুক্তিবাদের ও

বাস্তবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল সংক্ষেপে দেখাইয়া (২৪ পৃঃ— হইতে ২৮ পৃঃ) পরে পেষ্টালৎসীর বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন (৩১ পৃঃ—৩৪ পৃঃ)]

৪। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়? বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর মূল ধারণা হইতে এই ধারণা কি কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন? বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুইটি ধারণার সমালোচনা করুন (J. B. F. July 1960)

[ইঙ্গিত :—ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে গান্ধীজীর বিশেষ সমাজ চিন্তার আওতা হইতে অপেক্ষাকৃত যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম নির্বাচনে ও ঐ কর্মে শিক্ষার্থী শিশুর অগ্রগতির মান নির্ধারণে বিকেন্দ্রিত সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণকে মাপকাঠি ধরিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ও সমাজের প্রতি তাহার আনুগত্যের সক্রিয় বিকাশ ঘটাইতে চাহিয়াছেন, বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হইয়াছে তাহা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচয় বহন করে। গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

৫। কি অর্থে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে "নীরব সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত" বলিয়াছেন; ব্যাখ্যা করুন (J. B. F. Nov '60 Principles)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ৬৫ হইতে ৬৮, পৃঃ ৮০-৮১ ও পৃঃ ১১২—১১৬ পাঠ করুন।]

৬। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প কাজের স্থান নির্ণয় করুন (J. B. F. July 1959, Method I)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ৬৬-৬৮, পৃঃ ১২০-১২২ পড়ুন।

প্রথমে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করিয়া শিক্ষা-কাজ-রূপ বিশেষ ধরণের কর্ম শিশুর বৌদ্ধিক শিক্ষার সহিত হিসাববোধ, সতর্কতা, নিয়মনিষ্ঠা, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ ও পরিশেষে আর্থিক স্বাবলম্বনের শিক্ষা প্রদানের যে যুক্তিগুলি প্রদান করে তাহা আলোচনা করুন। তৎপরে গান্ধীজীর

সমাজ দর্শনের বিচারে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্পকাজ নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।]

৭। সুশাসন বলিতে কি বহিঃশৃঙ্খলাকেই বুঝায়? ভিতর হইতে সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাবোধ না জাগিলে যে সকল বাহ্যিক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় তাহা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করুন। (J. B. F. Nov. 1952—Principles)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ৯৪ হইতে ১০০ দেখুন।]

"শিক্ষা জীবনযাত্রার প্রণালী বিশেষ"—গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ সংগা, তাহা অন্যান্য সংগার সহিত আলোচনা করিয়া আপনার মত প্রতিপন্ন করুন। (J. B. F '52 Principles)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১-৪ ও পৃঃ ১০২ হইতে ১১৬ পাঠ করুন।

(১) আজ গতকল্য অপেক্ষা উন্নত জীবন যাপন করিব এবং ইহার জন্য গতকল্য যাহা জানিতাম না আজ তাহা জানিব ; গতকল্য যে ভুল করিয়াছি আজ তাহা হইতে বিরত হইতে প্রয়াসী হইব—ইহাই হইবে শিক্ষা সম্পৃক্ত জীবনযাত্রার প্রণালী।

(২) জীবনযাত্রা কখনও একা একা সম্ভব নহে। সুতরাং আমাকে আর দশজনের সহিত মিলিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং উপরোক্ত সংগাটিতে ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্নমুখী বিকাশ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা উভয়ই রহিয়াছে।]

৮। পূর্ব বুনিয়াদী স্তরে শিশুদের সু-অভ্যাস গঠন করাইবার জন্য শিক্ষিকা কি পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন বিশদভাবে আলোচনা করুন।

(J. B. F. '55 Method I)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১০০—১০১ দেখুন। নার্শারী বিদ্যালয়ে শিশুদের যে সমস্ত খেলনা দেওয়া হয় সেইগুলি নিয়মমত ব্যবহার করিতে ও যথাস্থানে রাখিতে শেখান হয়, তাহাদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস শেখান হয়, পর্যায় মানিয়া চলিতে শেখান হয় ও পরস্পর সহযোগিতা করিতে শেখান হয়। তাহারা কথাবার্তা বলা প্রভৃতির ব্যাপারেও বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে শেখে। পরস্পরের সহিত ব্যবহার শোভন ও সুন্দর করিতে শেখে।]

৯। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির দোষগুণ আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরীক্ষা থাকিবে কি না অথবা কি প্রকার পরীক্ষা থাকিবে সে সম্বন্ধে আপনার মতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

(J. B. F. '57 Principles)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১৩৯—১৪৪ দেখুন।]

১০। শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতা বলিতে কি বুঝেন? বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিকতা প্রবর্তন করিবার জন্য আপনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন?

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ৭৪—৭৯ ও পৃঃ ৮৫—৯১ দেখুন ।]

১১। নিম্নলিখিত যে কোনও দুইজন শিক্ষাবিদ প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(১) মন্টেসরী (২) ফ্রয়েবল (৩) ডিউই (৪) রবীন্দ্রনাথ।

[ইঙ্গিত :—

মন্টেসরী —(৪৮—৫৩ পৃঃ দেখুন ।)
ফ্রয়েবল —(৪২—৪৮ পৃঃ দেখুন ।)
ডিউই —(৫৪—৬০ পৃঃ দেখুন ।)
রবীন্দ্রনাথ—(৬৮—৭৩ পৃঃ দেখুন ।)]

N. B. এই প্রশ্ন ১৯৫৪, ১৯৫৩তে আংশিকভাবে আসিয়াছে।

১২। শিশু-শিক্ষায়—মন্টেসরী, ফ্রয়েবল, পেষ্টালৎসি, রুশো, জন ডিউই এর অবদান আলোচনা করুন। (J. B. F. Nov. 1952—Principles)

[ইঙ্গিত :—উপরের প্রশ্ন দেখুন। রুশো—২০—২৭ পৃঃ, পোষ্টালৎসি—২৮—৩৩ পৃঃ দেখুন ।]

১৩। অবিভক্ত পাঠ্যক্রম বলিতে কি বুঝেন? বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিরূপে অবিভক্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিবেন তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দিন।

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১৮০—১৮৪ পাঠ করুন।

বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত সম্বন্ধিত পদ্ধতি পাঠ দিতে গেলে পাঠ্যক্রমকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা সম্ভব হয় না—তাহা উদাহরণ হইতে দেখান ও ঐরূপ ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রসর হইবেন, যে কোনও একটি কাজ বা project লইয়া আলোচনা করিয়া দেখান।]

১৪। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকার সহিত পারিপার্শ্বিক সমাজের কিরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত এবং ঐ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্য আপনি কি কি করিবেন?

[ইঙ্গিত :—(১) বুনিয়াদী শিক্ষক নিজেদের আদর্শ সমাজ রচনা করিবেন ও তাহাদের আদর্শে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবেন পৃঃ ৮৫—৮৮ ও ১১৪—১১৭ দ্রষ্টব্য।

(২) তিনি সৎ নাগরিকরূপে গ্রামের কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত থাকিবেন।

(৩) বিদ্যালয়গতভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা হইবে—১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) শিশুদের উৎসবানুষ্ঠানাদিতে অভিভাবকগণ আমন্ত্রিত হইবেন।

(৫) অভিভাবক সম্মেলনে বিদ্যালয়ের বিষয়ে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজকেন্দ্রী—সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ-কর্মের সহিত বৃহত্তর সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকিবে। শিশুরা নানা সমাজকল্যাণ-মূলক কাজ শিক্ষকের নেতৃত্বে করিবে ও ঐ সব কাজে গ্রামবাসীদের বুদ্ধি ও শ্রম পাইবার জন্য প্রচেষ্টা চালান হইবে। শিক্ষক অভিজ্ঞ অভিভাবকদিগকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে আহ্বান করিয়া তাহাদের যুক্তি গ্রহণ করিবেন ও সকল অভিভাবকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন।]

১৫। "সমবায় পদ্ধতি" বলিতে বুনিয়াদী শিক্ষায় যাহা বুঝেন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। গতানুগতিক পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতি দ্বারা কি কি সুবিধার প্রত্যাশা করা যায় লিখুন।

(J. B. F. Nov. '58 Method I)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১১৯ হইতে পৃঃ ১২৩ ও পাঠটীকাগুলি দেখুন।]

১৬। শিক্ষোপকরণ ব্যবহারের মূল নীতিগুলি কি লিখুন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ব বিষয়ের জন্য কি কি শিক্ষোপকরণ উপযোগী, তাহার একটি তালিকা দিন। (উপরের Paper)।

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১৯০—১৯৪ পড়ুন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক চিত্র, গল্পের চিত্র, গণিতের প্রাথমিক জ্ঞানের উপযোগী উপকরণাদি, মডেল, নানা জীবজন্তুর চিত্র, মডেল ও নমুনা, নানা সংগ্রহ দ্রব্য, নানা শস্য, ফল, ফুল, পাতা, চিত্র সম্বলিত চার্ট ইত্যাদি উপযোগী। চিত্রগুলি জটিলতা বর্জিত হইবে ; অক্ষর বড় ও সরল হইবে।]

১৭। "পাঠটীকা" লিখিবার প্রয়োজনীয়তা কি? দৈনন্দিন পাঠদানে বিশদরূপে পাঠটীকা লেখা সম্ভব না হইলে সংক্ষেপে কিভাবে পাঠ-টীকা লিখিবেন তাহার একটি নমুনা দিন।

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ১২৪—১২৫। ১৩৫ পৃষ্ঠার পাঠটীকাটির উদ্দেশ্য, উপকরণ অংশ বাদ দিন ও প্রস্তুতির প্রশ্নের নমুনা কমান।]

১৮। প্রজেক্ট কাহাকে বলিবেন? একটি "প্রজেক্ট"-এর পূর্ণ বিবরণ দিন এবং এই প্রজেক্ট অনুশীলন দ্বারা শিশু কি প্রকারের শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার বর্ণনা দিন।

[ইঙ্গিত :—তৃতীয় খণ্ড ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

১৯। একটি গ্রাম্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী একঘণ্টা স্থায়ী কোনও ঐচ্ছিক কর্মের জন্য একটি পাঠটীকা রচনা করুন (ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫)।

[ইঙ্গিত :—তৃতীয় খণ্ডে প্রদত্ত পাঠ-টীকায় চতুর্থ শ্রেণীর একটি পাঠ-টীকা বাছিয়া লউন।]

২০। তৃতীয় শ্রেণীতে বিজ্ঞানের পাঠ দিবেন, উদ্যান রচনার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কিরূপে বিজ্ঞানের কোনও একটি বিষয়ে পাঠদান করা যাইতে পারে তাহার একটি পরিকল্পনা রচনা করুন।

[ইঙ্গিত :—১৩৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পাঠ-টীকা দেখুন। উপরে বাগানের যে গাছটি মরিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ হইতে বিজ্ঞানের পাঠ স্থরু করা যায়। মূলের দ্বারাই গাছ রস শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, মূল নষ্ট হওয়ায় গাছটি মরিয়াছে, ইহা বুঝিতে সাহায্য করা হইবে। তৎপরে "মূলের কাজ ও বিভিন্ন ধরণের মূল" বিষয়ে পাঠ দিবার পরিকল্পনা করুন।]

২১। নিম্নলিখিত যে কোনও দুইটি সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

(ক) ডাল্টন প্লান (খ) প্রোজেক্ট মেথড (গ) ওয়ার্কশপ মেথড।

[ইঙ্গিত :—ডাল্টন প্লান—১৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন। প্রোজেক্ট পদ্ধতি—তৃতীয় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ ও ৬১ পৃঃ পাঠ করুন। ওয়ার্কশপ পদ্ধতি—১৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন।]

২২। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন। (Principles. J. B. S. Final, July—1958)

[ইঙ্গিত :—পৃঃ ৬৪ হইতে ৭৩ পাঠ করুন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে মননশীলতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং বিশ্বের সহিত ব্যক্তির একীকরণের উপায় হিসাবে দেখিয়াছেন। শিক্ষার্থীর অধ্যাত্ম চেতনার উদ্বোধন তাই তাঁহার শিক্ষায় গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের এই দিকটি উপেক্ষা করেন নাই কিন্তু তিনি বাস্তব জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধি ও আদর্শ সমাজ রচনার উপায় হিসাবে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটিকে বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন—গান্ধীজী দিয়াছেন উৎপাদনাত্মক শিল্প কাজকে। গান্ধীজী বিদ্যালয়কে সমাজের মধ্যেই নূতন সমাজ চেতনার ভ্রূণরূপে সংগঠিত করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আদর্শ সমাজ পরিবেশরূপে সংগঠিত করিতে প্রয়াসী ছিলেন।]

২৩। সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কার্যের মধ্যে পার্থক্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আপনি কোন্ প্রকার কার্য প্রবর্তনের পক্ষপাতী এবং কেন তাহা আলোচনা করুন।

[ইঙ্গিত :—১২৬ পৃঃ হইতে ১৩০ পৃঃ ও ১৭৩ পৃঃ হইতে ১৭৮ পৃঃ পাঠ করুন।

যে কাজগুলি নিজের আভ্যন্তরীণ তাগিদে নিছক নিজের সৃজনী প্রেরণায় করা হয় তাহা সৃজনাত্মক কাজ। এইরূপ কাজের মধ্য দিয়া শিশুর সংগঠন

প্রবৃত্তি আত্ম-সাম্মুখ্য-বৃত্তি (instinct of self assertion) প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয় এবং পরে কতকগুলি আবেগ অনুভূতি তৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ ধরণের কাজের মূল্য প্রধানতঃ কাজটি সম্পাদনের আনন্দের মধ্যেই নিহিত— সামাজিক মূল্য এক্ষেত্রে গৌণ। কবিতা লেখা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি এই ধরণের কর্ম। সমাজ হইতে মূল্য অথবা সমাজ সমর্থন পাওয়া যায় এইরূপ কাজগুলি উৎপাদনাত্মক কর্ম। এইরূপ কাজের উৎকর্ষতা বিচারে সমাজের চাহিদা ও মূল্যবোধই প্রধান। তাই এই কার্য সম্পাদনের সার্থকতা বিচারে প্রচলিত সামাজিক মূল্য ও চাহিদা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষি শিল্প, প্রভৃতি এইরূপ কাজের উদাহরণ।

কিন্তু সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের এই পার্থক্য খানিকটা কৃত্রিম। উৎকৃষ্ট সৃজনাত্মক কর্ম সাথে সাথে উৎপাদন ধর্মীও হইবে। ভাল ছবি ভাল মূল্যে বিক্রয় হয়, উৎকৃষ্ট গায়ক যথেষ্ট অর্থ পান। অপর পক্ষে শিল্পী কারিগর যখন নিজের শিল্পকে ভালবাসেন তখন ঐ কার্যে শুধু মূল্যই পান না আনন্দও পান এবং শিল্প কাজের মধ্যেই সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা পান। বস্তুতঃ আমরা শিশুদিগকে উৎপাদন কাজগুলি সৃজনাত্মক ভাবে করিতে শিখাইব যেন তাহারা কাজগুলি করিতে করিতে খেলার মত আনন্দ ও সাবলীলতা লাভ করে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প কাজ রাখা প্রয়োজন কারণ ইহাতে তাহাদের হিসাববোধ, সমাজবোধ, দায়িত্ববোধ, সংঘবোধ প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। কিন্তু তাহার সুকুমার মানসিক বৃত্তির বিকাশের জন্য সৃজনাত্মক কাজ রাখা হইবে।]

২৪। বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে আপনি কি বুঝেন ? বুনিয়াদী শিক্ষা সর্বজন স্বীকৃত আধুনিক শিক্ষানীতিগুলি গ্রহণ করিয়াছে কিনা এবং তাহার নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট অবদান আছে কিনা তাহা আলোচনা করুন।

[ইঙ্গিত :—গান্ধীজীর ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ পাঠ করুন। বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মকেন্দ্রী শিশু শিক্ষা কিন্তু ইহাতে যে কোনও কর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। সমাজবোধ হইতে শিশুরা সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলি আনন্দের সঙ্গে করিতে শিখিবে ও উহার মাধ্যমেই প্রধানতঃ বৌদ্ধিক শিক্ষা লাভ করিবে ইহাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা হওয়া উচিত। এই শিশু শিক্ষার মূলনীতি ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়া শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন পদ্ধতিও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তৎব্যতিতও ইহাতে শিশুর সমাজ সচেতনা ও বর্তমান সমাজের অন্যায় অবিচারসমূহের প্রতিকার সাধনার্থ কর্ম সম্পাদনা ও তদনুযায়ী নিজের জীবন গঠনকে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হইয়াছে।]

২৫। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প কাজের স্থান নির্ণয় করুন।

(J. B. S. July 959.1—Method I)

[ইঙ্গিত:—গান্ধীজীর শিক্ষা চিন্তা ও ওয়ার্ধা পদ্ধতি পাঠ করুন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিশুকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দান করিতে চাহে। সে ব্যক্তি হিসাবে বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, মমত্ববোধ, নিয়ম নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইবে এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য-সচেতন হইবে ইহাই বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ। শিল্প কাজের মধ্য দিয়া তাহার সমাজের প্রতি মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ জন্মে। ইহা তাহার হিসাববোধ, পরিকল্পনা করিয়া কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা, অপরের সহিত সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষমতা, কর্মে সতর্কতা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। শিল্প কাজের ভিতর দিয়াই সে সমাজ ও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য রচনার মধ্য দিয়া যে আত্মবিশ্বাস লাভ করে ও স্বাবলম্বনের মত মনোবলের অধিকারী হইয়া উঠে। তাহা ব্যতিত শিল্প কাজকে অবলম্বন করিয়া গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বৌদ্ধিক বিষয় শিক্ষা দান সহজ হয়। ঐ শিক্ষার প্রয়োজন তাহারা বুঝিতে পারে ও শিক্ষনীয় বিষয় কর্মে প্রয়োগ করিতে পারে। এই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কাতাই, কাঠের কাজ প্রভৃতি শিল্প শিক্ষার মাধ্যম শিল্প হিসাবে অধিক সম্ভাবনাযুক্ত কারণ ইহারা ব্যাপকতর শিল্প ও ইহাতে বহু প্রক্রিয়া সংযুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীর একঘেয়েমী আসার সম্ভাবনা কম।]

২৬। What do you understand by individualistic and Socialistic aim in Education ? Which would you advocate and why ?

C. U. B. A. Edu. paper I '59.

[ইঙ্গিত :—১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ পাঠ করুন।

ফ্রয়েবল ও তৎপূর্ববর্তী শিক্ষাবিদগণ প্রতি শিশুর বৈশিষ্ট্যকে শিক্ষার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রদান করাকেই শিক্ষার আদর্শ মনে, করিতেন। কমিনিয়াস অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। রুশো ব্যক্তিত্ব-বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিই বিরূপ ছিলেন। ডিউই ও গান্ধীজী সমাজতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থায় শিক্ষায় সমাজবোধকে গুরুত্ব দিয়াছেন।]

২৭। Education is not a new process, but requiring new interpretation, Discuss this aspect of education from the point of view of the individual and the Society.

(C. U. B. A. Edu? 1960)

[ইঙ্গিত :—১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় অধ্যায় পাঠ করুন।]

২৮। What do you understand by child centred education (C. U. B. A. Edu.—1960.)

[ইঙ্গিত :—১০৯ পৃঃ—১১৪ পৃঃ দেখুন]

২৯। কোনও শ্রেণীর পাঠ্যক্রম (Syllabus) রচনা করিতে হইলে কি কি নীতি অনুসরণ করা উচিত? এই প্রসঙ্গে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত প্রথম হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যে বুনিয়াদী (প্রাথমিক) পাঠ্য-তালিকা প্রচলিত আছে তাহার সমালোচনা করুন।

—(Principles : S.B.F. 1958)

[ইঙ্গিত :—পাঠ্যক্রম (Syllabus) শিশুকে কোন্ বিষয় কতটুকু শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহারই নির্ধারক। ইহাতে শিক্ষানীতির প্রশ্ন রহিয়াছে কারণ, কি শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বিচার করিতে হইলে কি শিক্ষা শিক্ষার্থীর বিকাশ সহায়ক হয়, সমাজের সহিত তাহার সঙ্গতি স্থাপন সহায়ক হয় ও সমাজকে অগ্রগতি প্রদান সহায়ক হয় সেই প্রশ্ন ইহাতে রহিয়াছে। অপর-পক্ষে ইহাতে শিশু-মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন রহিয়াছে কারণ কোন্ বয়সের শিশু কিরূপ বিষয়ে আগ্রহী হয়, কতখানি মনঃসংযোগ করিতে পারে ও কতটুকু গ্রহণ করিতে পারে তাহা জানিয়া তবেই পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হওয়া উচিত। সাথে সাথে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রশ্নও রহিয়াছে কারণ কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করা হইবে তদনুসারে বিষয়গুলি সজ্জিত করা হইবে ও এমনকি কতখানি শেখান সম্ভব হইবে তাহাও পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাঠ্যক্রম রচনা কালে সমাজের চাহিদা, শিশুর চাহিদা, শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পাঠদান পদ্ধতির সহিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গতি বিবেচনা করা হইবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সামাজিক, প্রাকৃতিক ও কর্ম-পরিবেশ ও তাহার গ্রহণ ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। শিশুদের পাঠ্যক্রম রচনায় শিক্ষালাভের ভিত্তি রচনার প্রতি, শিক্ষার প্রতিও তাহাদের আগ্রহ-সৃষ্টির প্রতি বেশী অবহিতী প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী (প্রাথমিক) পাঠ্যতালিকায় শিশুর চাহিদা ও জ্ঞানের ভিত্তি রচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শিশুর ব্যক্তিত্বের ও সমাজ চেতনার বিকাশ—অর্থাৎ শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ইহাতে উপেক্ষিত হয় নাই। তাহা ছাড়া অন্ততঃ প্রথম তিনটি শ্রেণীতে শিক্ষাদানকে বাস্তবাশ্রয়ী ও কর্মকেন্দ্রী করার বিষয়েও চিন্তা করা হইয়াছে। অপর দুই শ্রেণীতে উহার অনুসরণের সহিত পৃথক বৌদ্ধিক শ্রেণী ও পুস্তক পাঠের সাহায্য লওয়া হইবে এমন বিষয় সমূহ রাখা হইয়াছে। বিষয়গুলি বিশেষ বিশেষ আগ্রহ-কেন্দ্র

অবলম্বন করিয়া পরিকেন্দ্রী প্রণালীতে (Concentric plan) সাজান যায় এমন ভাবে বিষয়াবলী নির্বাচিত হইয়াছে।]

৩০। "বুনিয়াদী শিক্ষায় সমবায় পদ্ধতি শ্রেণী শিক্ষক ছাড়া কার্যকরী করা সম্ভব নহে।"—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(J.B.F. '59 (Nov.) Method I)

[ইঙ্গিত :—একই শ্রেণীতে সকল বিষয় শিক্ষা দিলে তাঁহাকে শ্রেণী শিক্ষক এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে একই বিষয় শিক্ষা দিলে তাঁহাকে বিষয় শিক্ষক বলা হয়।

সমবায় পদ্ধতির বর্ণনা দেখুন। ইহাতে একটি কাজ বা ঘটনাকে আগ্রহ কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়া সম্বন্ধিত ভাবে বিষয় সমূহের অবতারণা করা হয়। উদাহরণ প্রদান করুন।

যেহেতু সমবায় পদ্ধতিতে (সম্বন্ধিত পদ্ধতিতে) বিষয় সমূহ ভাগ ভাগ করিয়া আসেনা—অবিভক্ত পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয় তাই বিষয় শিক্ষক এই পদ্ধতির অনুপযোগী। তাহা ছাড়া শ্রেণী শিক্ষক শিশুর সমগ্র জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার বিভিন্নমুখী বিকাশের সহায়তা করিতে পারেন। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষায় শ্রেণী শিক্ষক ব্যবস্থাই উত্তম।]
